অপরাধ বিজ্ঞান

প্রথম খণ্ড

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

অপরাধ-বিজ্ঞান

প্রথম খণ্ড

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল এম, এস-সি

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩.১.১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা-৬

চারি টাকা

তৃতীয় সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীকমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক "কালী-গঙ্গা" প্রেস হইতে মুদ্রিত

অপরাধ-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ সরকার I. P. J. P.

মহোদয়কে—

শ্রদ্ধার সহিত

পঞ্চানন

অপরাধ-বিজ্ঞান

প্রকৃত অপরাধ

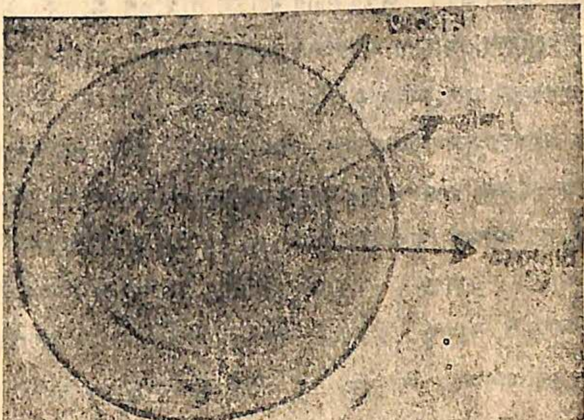
অপরাধ ও অপরাধীদের সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে প্রথমেই জানা দরকার সঠিক অপরাধ কাকে বলে। পৃথিবীতে যা কিছু পাপ বা অন্যায় তা অপরাধ নয়। মানুষের কোনও কাজ বা ব্যবহার যদি প্রত্যক্ষভাবে সমাজের পক্ষে বিশেষরূপে ক্ষতিকর হয়, তবেই তাকে আমরা অপরাধ বলি। এই "বিশেষরূপ" কথাটী প্রণিধানযোগ্য। এমন অনেক ছোটখাট অপরাধ আছে যা একদেশে অপরাধ বলে বিবেচিত হলেও, অন্যদেশে তা অপরাধ বলে স্বীকৃত হয় না। আত্মহত্যা বিলাতে একটা অপরাধ, কিন্তু জাপানে তা অপরাধ নয়। এদেশে আত্মহত্যা অপরাধ নয়, কিন্তু আত্মহত্যার চেষ্টা অপরাধ। বিলাতে আত্মহন্তারকের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। আত্মহত্যা সকল দেশে অপরাধ বলে বিবেচিত হয় না। কারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গোটা সমাজের পক্ষে কতিপয় ব্যক্তির এইরূপ আত্মহত্যা সবিশেষ ক্ষতিকর নয়। আমার মতে যে সকল আদর্শহীন, স্বার্থপ্রণোদিত গুরুতর অকাজ বা কুকাজ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বসাধারণের দ্বারা অপরাধ বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে, সেই :সকল কাজ বা অকাজকেই বিজ্ঞানসম্মত অপরাধ বলা উচিত। রাজনৈতিক অপরাধগুলি বিজ্ঞানসম্মত অপরাধের আওতায় আসে না। কারণ তাদের কার্য্যাদি কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থদ্বারা প্রণোদিত হয় না এবং তাদের

কাজের পিছনে থাকে একটা বিশেষ আদর্শ। তাই আজ যে বিদ্রোহী, কাল সে স্বদেশপ্রেমিক হয়। রাজা শিবাজীর কাহিনী এর একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সকল অপরাধীরা অপরাধ করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে নয়। এই কারণে রাজনৈতিক অপরাধীদের সাধারণ অপরাধীর পর্য্যায়ে না ফেলে, প্রত্যেক রাষ্ট্রই তাদের ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে থাকে। জনসাধারণ তাদের বিপথগামী ও দায়িত্বজ্ঞানহীন মনে করে দুঃখিত হয়। রাষ্ট্রের হিতের জন্য তারা তাদের দমন করে, কিন্তু সাধারণ অপরাধীদের পর্য্যায়ে তাদের ফেলতে সব সময়ই দ্বিধা বোধ করে।

সঠিক অপরাধ কি তা ঠিক ভাবে বুঝতে গেলে, উপরের "গুরুতর" বা "সবিশেষ" কথাটীর বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। অন্যায়, পাপ ও অপরাধ এই তিনটি নিন্দনীয় কার্য্য একই পর্য্যায়ে পড়ে। এক কথায় তাদের প্রকৃতি বা স্বরূপ থাকে একই, তফাৎ হয় শুধু কম বেশী গুরুত্বের। ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে কেউ বাধ্য নয়, কিন্তু কেউ যদি কিরূপ অবস্থায় পড়ে সে ভিক্ষা চাইছে তা না জেনে বা জানবার চেষ্টা না করে—কেবলমাত্র ভিক্ষা চাইবার জন্যই, কোনও ভিখারীকে রূঢ়ভাবে তিরস্কার করে, তা হ'লে তার সেই কার্য্যকে আমরা অন্যায় কার্য্য বলি। অপরদিকে বৃদ্ধ পিতা-মাতার ভরণপোষণের জন্য কেউ আইনতঃ বাধ্য নয়, কিন্তু পিতামাতার প্রতি তার এই অবহেলাকে আমরা পাপকার্য্য বলি। ইহা পুত্রের পক্ষে অন্যায় তো বটেই, পাপও বটে। আমরা পুত্রকে তার এই নীতিবিগর্হিত কার্য্যের জন্য নিন্দা করলেও তাকে কোনরূপ শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন মনে করি না। এই তো গেল অন্যায় ও পাপকার্য্যের কথা, অপরদিকে জাল-উইল তৈরী করে ভাইকে ফাঁকি দেওয়ার কাজকে আমরা অন্যায়, পাপ এবং সেই সঙ্গে আইনতঃ ও লোকতঃ অপরাধ বলি। একটী কার্য্যকরী উদাহরণ দ্বারা বিষয়টীর বিশদ ব্যাখ্যা

করা যাক্। একদল আদিম অধিবাসীর বাসস্থান একপাল নেকড়ের দ্বারা আক্রান্ত হল। গোষ্ঠীর সকলেই এই আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন যে কোনও কারণেই হোক্ এই সাধারণ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য, অপর সকলকে সাহায্য না করে লুকিয়ে বসে রইল। তার এই নিন্দার্হ কার্য্য এক্ষেত্রে অন্যায় বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু এই লোকটি যদি এইরূপ ক্ষেত্রে সর্ব্বসাধারণের আত্মরক্ষার জন্য তৈরী অস্ত্রশস্ত্রগুলোও নিয়ে সরে পড়ে— তা হ'লে তার এই দুষ্কার্য্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

অন্যায়, পাপ ও অপরাধ এই কার্য্য তিনটীকে তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, তাদের মধ্যে যা কিছু প্রভেদ, তা



অন্যায়, পাপ ও অপরাধ

গুরুত্বের, বিষয়বস্তুর নয়। অর্থাৎ কি'না বিষয়বস্তু একই, তফাৎ শুধু গুরুত্বের। এক কথায় গুরুতর অন্যায়কে আমরা পাপ এবং গুরুতর পাপকে আমরা অপরাধ বলি। যা কিছু অপরাধ তা পাপও

বটে অন্যায়ও। কিন্তু যা কিছু অন্যায় বা পাপ তা অপরাধ নয়। অপরাধ অন্যায় ও পাপের শেষ স্তর। অর্থাৎ পাপের মাত্রা পূর্ণ হলে, তা হয় অপরাধ।

(অন্যায় = অন্যায়+পাপ+অপরাধ। পাপ = পাপ+অপরাধ। অপরাধ = অপরাধ।)

(চিত্রটি ভালরূপে লক্ষ করলে দেখা যাবে, পার্শ্ব হতে কেন্দ্রের দিকে চিত্রের রঙ পর্য্যায়ক্রমে ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে উঠেছে। এই পার্থক্যের পর্য্যায়গুলি হচ্ছে গুরুত্বের। বহির্বৃত্তটী হচ্ছে কমবেশী অন্যায়ের বা ডিফারেন্ট ডিগ্রী অফ্ সিন্-এর। মধ্যবৃত্তটী হচ্ছে কমবেশী পাপের বা ডিফারেণ্ট ডিগ্রি অফ্ ভাইস্-এর। এবং অন্তর্বৃত্তটী হচ্ছে কমবেশী অপরাধ বা ক্রাইম-এর। অন্তর্বৃত্তটীর মধ্যস্থল পার্শ্বদেশ অপেক্ষা অধিকতর গাঢ়। সবিশেষ বা গুরুতর অপরাধ বুঝবার জন্য, বৃত্তের মধ্যস্থল পার্শ্বদেশ অপেক্ষা অধিকতর গাঢ় দেখা যায়।)

সঠিক অপরাধ সর্ব্বসাধারণ দ্বারা অপরাধ রূপে স্বীকৃত হওয়া চাই। মনুষ্যসমাজে এই অন্যায় ও পাপের প্রাবল্য এত বেশী যে শতকরা আশীজন লোকই তাদের জীবনে বহুবারই কোনও না কোনও কারণে এই পাপ বা অন্যায়ের আমলে এসেছে। সমাজবিশেষের বহুসংখ্যক লোক যা করে, বাকি লোককে তা সহ্য করতে হয়। ফলে, এই সব কারণে গুরুতর শাস্তি কাউকে দেওয়া যায় না। তাছাড়া এই পাপ বা অন্যায় কার্য্যদ্বারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সমগ্র বা গোটা সমাজের কোনও গুরুতর ক্ষতি সাধিত হয় না। অন্যায়কারী থেকে পাপী ও পাপী থেকে অপরাধী হওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব নয় বটে, কিন্তু যতক্ষণ না ইহা সংঘটিত হয়, ততক্ষণ সমাজের পক্ষে চুপ করে থাকাই শ্রেয়ঃ। কারণ সকলেই যে সব সময় পাপ বা অন্যায় করে তা নয়, বরং তাদের এই অন্যায় ও পাপকার্য্যের জন্য তারা প্রায়ই

অনুতপ্ত হয় ও নিজেদের শুধরে নেবার চেষ্টা করে। ধর্ম্মশিক্ষা বা সৎ উপদেশ দ্বারা অন্যায়কারী ও পাপীদের যথাক্রমে পাপ ও অন্যায় কার্য্য থেকে বিরত করা সহজ। কিন্তু অপরাধীরা উপদেশ বা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষ ধার ধারে না। কোনও কোনও অপরাধীর কাছে অপরাধ করাই একটা ধর্ম্ম। সাময়িক ক্রোধ, লোভ, মোহ বা বুদ্ধিনাশের জন্য মানুষ পাপ বা অন্যায় করে এবং প্রায়ই দেখা যায় তারা তাদের ভুল বুঝে এবং তা বুঝতে পারা মাত্র নিজেদের শুধরে নেয় বা নেবার চেষ্টা করে। মানুষ পাপ বা অন্যায় করে জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ, কিন্তু অপরাধ করে সর্ব্বদাই জ্ঞানতঃ। এই "জ্ঞানতঃ" কথাটা থেকেই অপরাধের গুরুত্বের বিষয় বুঝা যায়। বিরাট জনসংখ্যার তুলনায় মাত্র স্বল্প কয়জনই, তাদের পাপ বা অন্যায়ের মাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করে—অন্যায়কারী থেকে পাপী ও পাপী থেকে অপরাধিতে পরিণত হয়েছে। এইজন্য সর্ব্বযুগের ও সর্ব্বসমাজের সভ্য মানুষ অন্যায়কারী ও পাপীদের জন্য কোনও পার্থিব শাস্তির ব্যবস্থা করে নি। তবে ক্রমবর্দ্ধমান পাপ বা অন্যায় কার্য্য যে অপরাধী হবার পথ প্রশস্ত করে এ কথা খাঁটী সত্য। আমি একজন উৎকট বালক-অপরাধীকে জানি। প্রথমাবস্থায় সে একজন অত্যাচারী ও পাপী ছিল। কিন্তু সে পরে একজন অপরাধীতে পরিণত হয়। উক্ত বালক-অপরাধীর অভিভাবকের তৎকালীন বিবৃতি থেকে কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল।

"ছেলেটির বাপ মা হঠাৎ মারা যাওয়ায় পড়শীরা তাকে আমার কাছে গছিয়ে দেয়। ছেলেটী তখন নিতান্ত শিশু। সম্পর্কিত আত্মীয় বিধায় আমি তাকে ফেলতে পারি নে। আমার স্ত্রী কিন্তু তাকে একেবারেই পছন্দ করল না। সে তাকে প্রায়ই মারধর করত। দেখাদেখি আমার পুত্রেরাও তাকে মারত। প্রতিরোধ বা প্রতিশোধের প্রয়াস পেলে

আমার স্ত্রী, এমন কি বাড়ীর চাকরও তাকে মারধর এবং তিরস্কার করত। ফলে সে প্রায়ই বাইরে বাইরে ঘুরতো। পাড়ার বখা ছেলেরাই হ'ত তার সঙ্গী। সে বাচ্চা কুকুর, ছাগলছানা, যাকে পেত তাকেই মারত। ভিখারী দেখলে সে তাদের গায়ে কাদা ছুঁড়ত। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল শিশুদের সে মারধর করত। দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করা যে একটা সনাতন নীতি, এরূপ একটা ধারণা শৈশব অবস্থাতেই তার মনে শেকড় গাড়ে। হাঁ, আমি স্বীকার করি, এইরূপ অবস্থার জন্য আমাদের অবহেলা ও অশ্রদ্ধাই দায়ী। একদিন ভাঁড়ারের জানালা গলে আচার চুরি করার সময় সে ধরা পড়ে। প্রহৃত হওয়ার পর সে বলে উঠে, 'সকলকেই ডেকে আচার খাওয়ান হয়, আর আমার বেলাই খালি 'বেরো বেরো'। আচার খেতে আমার ইচ্ছে হয় না বুঝি?' ছেলেটী তখনও শিশু। শিশু মনের এই সকাতর নালিশ আমাকে অভিভূত করে। কিন্তু আমি আমার স্ত্রীর ভয়ে তার প্রতি কোনও রূপ সুবিচার করতে সেদিনও যেমন অক্ষম ছিলাম, আজও তেমনি অক্ষম। জানি না, আসল অপরাধী কে? সে না আমি, না, আমার স্ত্রী?"

সঠিক অপরাধ বলতে, আমরা চুরি, জুয়োচুরি, ডাকাতি, শঠতা, বলাৎকার, জালিয়াতি, খুন (হত্যা নয়), জখম প্রভৃতি অপরাধ বুঝি। কারণ এইসব অপরাধ প্রত্যক্ষ ভাবে সমাজের ক্ষতি করে ও সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেয়। এই সকল অপরাধ একসঙ্গে আদর্শহীন, গুরুতর ও স্বার্থ-প্রণোদিত এবং এই সকল অপরাধ সকল দেশে, সকল যুগে, সর্ব্বসাধারণ দ্বারা অপরাধ বলে স্বীকৃত হয়েছে। প্রকার ভেদে বিশ্বাসঘাতকতা ও ব্যভিচার অপরাধ বৈজ্ঞানিক অপরাধ নয়। রাষ্ট্রবিদ্‌দের মতে এই অপরাধ-গুলি ফৌজদারী দণ্ডবিধির মধ্যে পড়লেও, আমার মতে প্রকার ভেদে এগুলি দেওয়ানি অপরাধ। বিশ্বাসঘাতকতা বা ব্যভিচার মাত্রই কোনও ব্যাপক

অপরাধ নয়। বরং প্রকার ভেদে এই অপরাধ দুটীকে ব্যক্তিগত অপরাধ বলা চলে। এই অপরাধ দুটী সকলক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সমাজের কোনও ক্ষতি করে না। বহুক্ষেত্রে যে বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে তা করে এবং এরূপ অপরাধ সে জীবনে হয়ত একবার ও একজনের উপরই করে। এই অপরাধ দুটী প্রায়ই অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্যে সংঘটিত হয়, কারণ গচ্ছিত দ্রব্যাদির আত্মসাতের ইচ্ছা প্রারম্ভেই (ঐরূপ দ্রব্য গচ্ছিত বা গ্রহণকালীন) কারও মনে থাকে না। পরবর্ত্তীকালের কোনও এক সময় এই আত্মসাৎরূপ প্রবৃত্তি ব্যক্তিবিশেষের মনে বাসা বাঁধে। এরূপ অবস্থায় এই অপরাধগুলিকে ফৌজদারী অপরাধরূপে বিবেচনা করা বিজ্ঞানসম্মত নয়। বিশ্বাসঘাতকতাকে অপরাধরূপে একান্তই যদি স্বীকার করতে হয়—তা হলে এই সব অপরাধকে আকস্মিক অপরাধের মধ্যে ফেলা উচিত। পরদ্রব্য তছ্‌রুপ বা ক্রিমিন্যাল মিসএপ্রোপ্রিয়েসন সম্বন্ধেও এরূপ বলা চলে। সঠিক অপরাধ সর্ব্বদাই পূর্ব্বকল্পিত হয়। বিজ্ঞানসম্মত অপরাধের মূল কথাই হচ্ছে এই। এই ব্যভিচার বা বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি অপরাধ প্রায় পূর্ব্বকল্পিত হয় না। অর্থাৎ যখন কেউ কোনও পরস্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে তখন তা তারা ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে করে না। পরবর্ত্তীকালে কোনও এক শুভ বা অশুভ মুহূর্ত্তে অতি ঘনিষ্ঠতার কারণে তার মনে এই ব্যভিচারের ইচ্ছা আসে। বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। সুতরাং এই অপরাধগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত অপরাধও বলা চলে না। এক কথায় সঠিক বা বিজ্ঞানসম্মত অপরাধের প্রকৃত সংজ্ঞা হবে এইরূপ—যে সকল অকাজ বা কুকাজ একাধারে আদর্শহীন, স্বার্থপ্রণোদিত, পূর্ব্বকল্পিত ও গুরুতর, যে সকল অপরাধ প্রত্যক্ষভাবে গোটা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, সে সকল অপরাধ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে

সর্ব্বসাধারণের দ্বারা সভ্য সমাজে অপরাধরূপে স্বীকৃত হয়ে এসেছে—সেই সকল অপরাধই বিজ্ঞানসম্মত বা সঠিক অপরাধ। উপরি উক্ত সংজ্ঞার মধ্যে যে সকল অকাজ বা কুকাজ পড়ে না, তা বিজ্ঞানসম্মত অপরাধ নয়। তবে যে ক্ষেত্রে ব্যভিচার, বিশ্বাসঘাতকতা আদি অপরাধ পূর্ব্বকল্পিত, সে ক্ষেত্রে তা অপরাধরূপেই বিবেচিত হবে। এমন অনেক অপরাধী আছে, যারা পরদ্রব্য আত্মসাৎ করবার উদ্দেশ্যে নানা অছিলায়, ফরিয়াদীর বিশ্বাস উৎপাদন করে ও পরে তার গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করে। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁরা সঠিক অপরাধী ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে যারা একটীর পর একটী নারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তারাও এই সঠিক অপরাধীর মধ্যে পড়ে, অবশ্য যদি এরূপ কার্য্যের দ্বারা অপর কোনও ব্যক্তির স্বার্থের বা অধিকারের সবিশেষ হানি ঘটে তবেই।

লোকচক্ষে খুন একটী সাধারণ অপরাধ, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার খুনই বিজ্ঞানসম্মত অপরাধ নয়। স্ত্রীর বা কন্যার উপর অত্যাচারের জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে যদি মানুষ অত্যাচারীকে খুন করে ত সেই খুনকে হত্যা বলেই অভিহিত করা উচিত। এরূপ খুন ব্যাপকভাবে সমাজের কোনও ক্ষতি করা দূরে থাক, অনেক সময় উপকারই করে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষ অপরাধ করে রাষ্ট্র-বিধির বিরুদ্ধে, সমাজ বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত শাস্তি দেওয়ার ভার নিজের হস্তে নেওয়ার জন্যই সে অপরাধী। এমন অনেক রাষ্ট্রের কথা শুনা যায়, যেখানে এরূপ ক্ষেত্রে, দুটীমাত্র সাক্ষী রেখে অপরাধীকে হত্যা করা অপরাধরূপে বিবেচিত হয় নি। তবে দেশভেদে এরূপ খুনকে অপরাধ বলেই ধরা হয়, কারণ ফরিয়াদীর উপর শাস্তি দেওয়ার ভার ছেড়ে দেওয়া কোনও অবস্থাতেই নিরাপদ নয়।

যুদ্ধে বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্যদের হত্যা করা অপরাধ নয় এবং যে কারণে এরূপ হত্যাকে অপরাধ বলে ধরা হয় না, সেই কারণেই এরূপ হত্যাকে বিজ্ঞানসম্মত অপরাধও বলা যায় না। * ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মানুষ যে সকল অপরাধ করে সেই সকল অপরাধ কখনই বিজ্ঞানসম্মত অপরাধ নয়। রাষ্ট্রবিধিতে এইসব অপরাধের জন্য যেমন শাস্তির ব্যবস্থা আছে, তেমনি এইসব অপরাধীদের তৎকালীন মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করে কম শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। আইনের উদ্দেশ্য এখানে মানুষের স্বাভাবিক ক্রোধকে শাস্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা সংযত করা। এরূপ শাস্তির মধ্যে থাকে সহানুভূতি, প্রতিশোধের স্পৃহা থাকে না। অপর দিকে যে সকল খুন জখম প্রভৃতি পূর্ব্বকল্পিত ও স্বার্থপ্রণোদিত, সেই সকল খুনের প্রায়ই একমাত্র শাস্তি হয় ফাঁসী। এক কথায় যে সকল খুন জখম প্রভৃতি অপরাধ সম্পত্তি বা বিত্তলাভের জন্য সংঘটিত হয়, সেই সকল খুন জখম প্রভৃতিই বিজ্ঞানসম্মত অপরাধ। এই একই কারণে পেশাদারী খুনেদের আমরা সঠিক অপরাধী বলি।

---

* যে সকল সৈনিক নেতাদের আদেশে কতকটা আদর্শ-প্রণোদিত হয়ে কতকটা স্বদেশ-প্রেমিকতার জন্যে, কতকটা বা নিয়মানুবর্ত্তিতার খাতিরে পর দেশ আক্রমণ করে বিপক্ষপক্ষীয়দের নিহত করে, তাদের প্রকৃত অপরাধী বলা যায় না। কিন্তু যে সকল পররাজ্যলিপ্সু নেতারা দেশবাসীদের ভুল বুঝিয়ে অকারণে তাদের পররাজ্য আক্রমণে নিযুক্ত করে তাদের আন্তর্জাতিক অপরাধীর পর্য্যায়ে ফেললে অন্যায় হবে না বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে তাদের প্রকৃত অপরাধীদের পর্য্যায়েই ফেলা যেতে পারে।

অপরাধ-রোগী

অপস্পৃহার আগমনের কারণেই মানুষ অপরাধ করে। যে সকল মানুষের মধ্যে এই অপস্পৃহা অবস্থান করে তাদের আমরা অপরাধী বলি। এই অপস্পৃহা কোনও কোনও মানুষ অভ্যাস দ্বারা লাভ করে, কেউ কেউ আবার উহা তাদের জন্মের সঙ্গে লাভ করে থাকে। এই সকল অপরাধীদের আমরা নীরোগ-অপরাধী বলে থাকি। উৎকট নিরোগ-অপরাধীরা তাদের অপরাধের জন্য কখনও অনুতপ্ত হওয়া প্রয়োজন মনে করে না, বরং উহার জন্য প্রায়ই গর্ব্ব অনুভব করে থাকে। কিন্তু এই নীরোগ-অপরাধী ছাড়া আরও এক প্রকার অপরাধী আছে, যারা কি'না প্রকৃতপক্ষে অপরাধী নয়। নীরোগ-অপরাধীদের ন্যায়, তাদের অপরাধ সমূহ ইচ্ছাকৃত হয় না। তারা বিভিন্ন প্রকার স্নায়বিক রোগের কারণে অপরাধ করতে বাধ্য হয়ে থাকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এই সকল অপরাধীকে এই জন্য আমরা অপরাধ-রোগী বলে থাকি। অপরাধ-রোগীরা তাদের অপরাধ সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া মাত্র অত্যন্তরূপ লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হয়ে উঠে। স্নায়বিক এবং মানসিক রোগ ব্যতীত ক্রোধ প্রভৃতি রিপুও মানুষকে অপরাধ-রোগীতে পরিণত করে দিতে পারে। * ক্রোধোন্মত্ত মানুষ সহজ মানুষের ন্যায় সকল সময় সকলের ক্ষতি করতে পারে না। তাদের সবল প্রতিদ্বন্দ্বিদের সম্বন্ধে এটা বিশেষরূপে প্রযোজ্য, কারণ তারা তখন অসহায় রোগীতে পরিণত হয়ে পড়ে।

---

* যার উপর রাগ করা যায়, তার যতটা ক্ষতি হয় তার চেয়েও ঢের বেশী ক্ষতি যে রাগ করে। মানুষ ক্রোধোন্মত্ত হওয়া মাত্র তার দেহের রক্ত সমাবেশের সমূল (আমূল) পরিবর্ত্তন ঘটে—ফলে সে মৃত্যু পথে আরও কিছুটা অকারণে এগিয়ে আসে। এই জন্য পণ্ডিতগণ বলেছেন যে রাগের ভাণ করো, কিন্তু রাগ করো না।

ক্রোধ মানুষকে উন্মাদ করে এবং অপরাধের সহায়ক হয়। বিতৃষ্ণা ও ক্রোধ একত্র হলে উন্মাদনার সৃষ্টি করে, এরূপ মানসিক অবস্থায় মানুষ সহজেই অপরাধমূলক কার্য্য করে। মুচিখোলা অঞ্চলের চাঞ্চল্যকর মাতৃহত্যা এরূপ মনোবিকারের একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ, সতের বৎসর বয়স্ক পুত্রের দ্বারা এই হত্যাকাণ্ড সমাহিত হয়। হত্যাকারী ছিল নিহত নারীর (৪৫) একমাত্র পুত্র। ধরা পড়ার পর আসামী পুলিশ ও হাকিমের কাছে নিম্নোক্তরূপ বিবৃতি দেয়।

"মাত্র সাতদিন পূর্ব্বে আমি থাকতাম জোড়াসাঁকো অঞ্চলে মাসীর বাড়ীতে। মা ছিল আমার ভারি ঝগড়াটে ও বদরাগী। কারুর সঙ্গে তাঁর বনিবনা হত না। ঝগড়াঝাটি হওয়ায় মাত্র সাতদিন পূর্ব্বে মা'কে ও ছোট বোনটিকে (৫) নিয়ে আমি মুচিখোলায় আসি। বাড়ীটাতে অপরাপর ভাড়াটিয়ারাও থাকত। সেদিন কর্ম্মক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত দেহে বাড়ী ফিরি। সন্ধ্যা তখন সাতটা, হঠাৎ অকারণে মা আমাকে গাল দেন। আমার মন আগে থেকেই বিষিয়ে ছিল, প্রতিদিনই মা'র উপর আসতো আমার রাগ ও বিতৃষ্ণা, দিনের পর দিন এই বিতৃষ্ণা ও ক্রোধ আমার মনে পুঞ্জীভূত হয়েছে বারুদের স্তূপের মত, একদিনের ক্রোধ হয়ত আমি দমন করতাম, বহুদিনের সঞ্চিত ক্রোধ দমনে আমি অক্ষম হই। আমার মনে গত কয় মাসের ক্রোধ ও বিতৃষ্ণা একসঙ্গে উপগত হয়, আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি, মাথার মধ্যে আগুন ঠিকরাতে থাকে। মনে হয়, এই আমার মা, যার জন্যে এত কষ্ট এত লাঞ্ছনা। ঘর ছেড়ে রাস্তায় বের হই মুক্ত বায়ুর সন্ধানে, কিছুক্ষণ পরে ঘরে ফিরে দেখি মা ঘুমাচ্ছেন, মা'র সেদিন জ্বর হয়েছিল, শরীর ছিল দুর্ব্বল, আমার কিন্তু সে কথা মনেই এল না, মা'কে দেখে শরীরের সমস্ত রক্ত আমার মাথায় উঠল, জানলার উপর ছিল একটা দা, সেটা তুলে নিয়ে বসিয়ে দিলাম মা'র

গলায়, রাত তখন ন'টা, ফিনকি দিয়ে বেরুল রক্ত, মা'র মুখটা ভীষণাকৃতি ধারণ করল, তারপর ধীরে ধীরে তার চোখ দুটি এল বুজে। মা'র মূর্ত্তি হ'ল শান্ত, মুখে তার অভয়ের বাণী, ততক্ষণে আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে, ক্ষোভে, ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় আমি অতিষ্ঠ হলাম, তাড়াতাড়ি ঘরের সব কয়টা জানলা ও দরজা বন্ধ করলাম, আলোটা দিলাম স্তিমিত করে, ভয়ে আমি কাঁপছিলাম, হঠাৎ শুনলাম মা বলছেন—'ভয় কি বাবা! যা হবার তা ত হয়ে গেছে, আমি ত আর ফিরব না, ভাবিসনে আর, ওঠ, বাঁচবার চেষ্টা কর, লাসটা সরিয়ে দে, তুই আমার একমাত্র পোলা, তোকে যে বাঁচতেই হবে।'

মুখে চোখে মা'র অসীম স্নেহ, আমার জন্য উৎকণ্ঠা। হঠাৎ জানলার আওয়াজ হল—টক্ টক্। শুনতে পেলাম প্রতিবেশিনীর গলা। প্রতি-বেশিনী জিজ্ঞেস করছিলেন, 'কিরে খোকা, তোর মা আছে কেমন?' প্রতিবেশিনীর কণ্ঠস্বর কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি পুনরায় বাস্তবতার মধ্যে ফিরে এলাম। আবার শুরু হল আমার কাঁপুনি। অতি কষ্টে উত্তর দিলাম, 'ভাল নয়, জ্বর বেড়েছে, কাল যা হয় করব।' আবার শুনতে পেলাম, মার অভয় বাণী—'ভয় পাসনি, আমি কাছেই আছি। কিছু হবে না তোর।' সমস্ত রাত ধরে বসে রইলাম অন্ধকার ঘরে, ভোর বেলায় ঘুমন্ত বোনটাকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। বাইরে থেকে দরজায় দিলাম তালা। সকলের অজ্ঞাতে বোনকে রেখে এলাম মামার বাড়ী, ফিরে আসতেই প্রতিবেশিনী জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর মা কোথায় রে?' উত্তরে জানালাম, 'ভোরের দিকে ভয়ানক জ্বর বাড়ে। আপনাদের আর বিরক্ত করিনি; ট্যাক্সি ডেকে হাসপাতালে দিয়েছি, অবস্থা খুব খারাপ।' ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম, শুকনা কাপড় ও চাদর দিয়ে মেঝের রক্তটুকু মুছে ফেলে, সেগুলা আলমারিতে পুরলাম,

তারপর মৃতদেহটা বিছানার মধ্যে জড়িয়ে দিয়ে আমি বায়স্কোপ দেখে এলাম। ফেরার পথে কিনলাম দুটী থলে। থলে নিয়ে যখন বাড়ী ফিরলাম, সন্ধ্যা তখন সাতটা। দরজা বন্ধ করে মৃত দেহটার কোমরে কাটারি বসিয়ে দেহটাকে দু-আধখানা করলাম। তারপর দেহের দুটী অংশ পুরে দিলাম দুটী বোরায়। এবং তারপর উপরের অংশটী মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম অন্ধকারের আবছায়ায়। বোরা-সুদ্ধ দেহটা দিলাম ফেলে গঙ্গার জলে। নিম্নের অংশটী নিয়ে যাবার সময় প্রতিবেশিনী তা দেখে ফেললেন। পথ আগলে মহিলাটী জিজ্ঞেস করলেন, 'কি নিয়ে যাচ্ছিস রে, বেয়াড়া গন্ধ বেরুচ্ছে যে।' উত্তরে আমি বললাম, 'ও কিছু নয়, পচা ময়দা।' পরদিন মাসীর বাড়ীতে এসে জানালাম, 'গাড়ীচাপা পড়ে মা মারা গেছেন। দাহকার্য্য শেষ করে এলাম।' শ্রাদ্ধকার্য্যাদির পরে ইচ্ছা ছিল কাশী গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করব, কিন্তু তার আর সুযোগ পাইনি, তার আগেই আমি গ্রেপ্তার হই, ফাঁসীই আমার একমাত্র শাস্তি, আমি দোষ কবুল করব। শীঘ্রই এর বন্দোবস্ত করুন। আমি মা'র কাছে যাব, বাঁচতে আমার সাধ নেই, মা আমায় ডাকছেন।"

এই হত্যাকারীকে প্রকৃত অপরাধী বলা যায় না। সাময়িক উন্মাদনাই এই হত্যার জন্য দায়ী। সহজ অবস্থায় এরূপ হত্যা সে কখনই করত না। প্রকৃত অপরাধীরা অপরাধের পর কখনও অনুতপ্ত হয় না। তারা তাদের অপকার্য্যের জন্য প্রায় গর্ব্বই অনুভব করে। অনুসন্ধানে জানা যায়, হত্যাকারী তার মা'কে যত্ন-আত্তিই করত! তদন্তে আরও প্রকাশ পায়, হত্যাকারীর পিতা ছিল উন্মাদ। পিতার উন্মাদ অবস্থাতেই সে জন্মগ্রহণ করে। এই কারণেই সাময়িক উন্মাদনা ছেলেটীর মধ্যে স্থান পেয়েছে। এই সম্বন্ধে তদন্তকারী অফিসারের বিবৃতিটুকু প্রণিধানযোগ্য।

"রাত্রি দেড় ঘটিকায় খেয়াল মত হত্যাকারীকে, আফিসে এনে জিজ্ঞাসাবার্ত্তা করছিলাম, কথায় কথায় তাকে জিজ্ঞাসা করি—রাতভর মৃতদেহটাকে নিয়ে তুই বসে রইলি। তোর ভয় করছিল না। আমার প্রশ্নে ছেলেটীর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। ঠক ঠক করে পা দুটা তার কাঁপছিল। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল—'বাবু বাবু! ও'কি! কি দেখছি আমি!' ছেলেটীর অবস্থা দেখে আমিও ভয় পেয়েছিলাম। তাকে হাজতে পুরে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেলাম, কিন্তু ঘুমতে পারলাম না।"

পেশাদার বা প্রকৃত হত্যাকারীদের ভয়-ডরের বালাই নেই, ছেলেটীকে কোনও ক্রমেই প্রকৃত অপরাধীর পর্য্যায় ফেলা যায় না। কিন্তু তবুও তাকে বিচারের জন্য চালান দিতে হয়, আমি তখন মনকে এই বলে প্রবোধ দিই—"আইনের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া নয়, শাস্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা জনসাধারণকে অনুরূপ অপকার্য্য হতে বিরত করাও হচ্ছে আইনের অপর উদ্দেশ্য। বৃহত্তর অবিচার রোধ করার জন্য ক্ষুদ্রতর অবিচারে দোষ নাই; বহুর মঙ্গলের জন্যে একের ক্ষতি, ক্ষতিই নয়।"

মানুষের মন স্বভাবতঃই অপরাধ-প্রবণ। সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি দ্বারা মানুষ তার এই অপরাধ-স্পৃহা প্রতিরোধ করে। কিন্তু স্নায়বিক রোগ অনেক সময় এই প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। পৈতৃক উন্মাদনার ন্যায় আরও বহুবিধ অবস্থা মানুষের এই স্বাভাবিক "প্রতিরোধ-শক্তির" বিনাশ ঘটায়। এই প্রতিরোধ শক্তি বা পাওয়ার অব্ রেজিস্‌টেন্স সম্বন্ধে পরে আমরা আলোচনা করব। উন্মাদনার ন্যায় কর্ম্মালসতা ও অতিরিক্ত মদ্যপানাদির দ্বারাও এই রোগ জন্মে। অতিরিক্ত মদ্যপান মস্তিষ্কের নীতি-স্থানে বিকার আনে। মাদকতা পুরুষানুক্রমে হ'লে এইরূপ বিকার সহজেই ঘটে থাকে। প্রতিরোধশক্তির অভাবে মানুষ

অপরাধ-মুখী হয়। কর্ম্মালসতা এই রোগের অপর কারণ। "আন্‌ওয়ার্ক ব্রেন ইজ ডেভিলস্ ওয়ার্কসপ্", কথাটা খুবই সত্য। কর্ম্মালস ধনীদের মধ্যে যেমন এই রোগের প্রাদুর্ভাব আছে, তেমনি কর্ম্মালস গরীবদেরও মধ্যে এই রোগ বহুল ভাবে বর্ত্তায়, কর্ম্মালসতা ও মাদকতা মানুষের মধ্যে নৈতিক অসাড়তা আনে। শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে অপরাধ-প্রতিরোধ ক্ষমতারও অভাব ঘটায়। জেলে কয়েদীদের কাজ করতে বাধ্য করা হয়, হয়ত সেই কারণে কয়েদখানায় চুরি-চামারি হয় কম। জন্ম-নির্ব্বোধ ব্যক্তিদের মধ্যে এই কর্ম্মালসতা বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয়। স্নায়বিক অসুস্থতার জন্যই এরূপ ঘটে থাকে। ফলে তাদের প্রতিরোধ শক্তিরও হ্রাস ঘটে। জন্ম-নির্ব্বোধরা এই কারণে জন্ম থেকেই অপরাধ-মুখী হয়। এজন্য একমাত্র দায়ী তাদের ভাগ্য। প্রতিভাবান, উন্মাদ ও অপরাধী—এই তিন জনেই, মনোজগতের অসাধারণ অবস্থার সন্ততি। ভাগ্যক্রমে কেউ হয়েছে প্রতিভাবান কেউ বা হয়েছে উন্মাদ বা অপরাধী। এই কারণে কাউকেই ঘৃণা করা উচিত না, অপরাধীদের সঙ্গে বন্দীকৃত হিংস্রজন্তুর মত ব্যবহার না করে অপরাধের প্রকৃত কারণ, অপরাধীদের মানসিক অবস্থা ও তার পরিবারবর্গ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা উচিত।

উন্মাদরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত কোনও অপরাধ যে অপরাধ নয়, তা শিশুরাও বুঝে। কিন্তু এমন অনেক উন্মাদ আছে যাদের বাহ্যতঃ উন্মাদরূপে বুঝা যায় না। বরং তাদের অত্যধিক স্বাভাবিক মানুষ বলেই মনে হয়, কিন্তু আসলে থাকে তারা উন্মাদ। এই ধরণের উন্মাদদের দ্বারা কৃত কোনও অপরাধকেও অপরাধ বলা উচিত নয়। আমি একজন বিশেষ ভদ্রমহিলাকে জানি, যিনি স্বভাবতঃ একজন স্বাভাবিক মানুষ বলেই বিবেচিত হন, যদি না তাঁর স্বামী উপস্থিত থাকেন। কিন্তু স্বামীকে

দেখামাত্রই তিনি একান্তভাবে অস্বাভাবিক হয়ে পড়েন। কারণে ও অকারণে, তখন তিনি শুধু স্বামীর উপর নয়, পাড়াপড়শীদের উপরেও অহেতুক অপরাধমূলক অত্যাচার স্নুরু করেন। পুলিশ থেকে তাঁকে পাগলা হাসপাতালে পাঠান হয়। কিন্তু পাগলা হাসপাতালে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বাভাবিক হয়ে উঠেন এবং ছাড়া পান। বাড়ী ফেরার পরও তাঁকে স্বাভাবিক দেখা যায়। কিন্তু আফিস থেকে তাঁর স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ কানে যাওয়ামাত্র তিনি পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ এগুলি একপ্রকার মানসিক রোগ। কিন্তু পুরাপুরি উন্মাদ না হ'লে, মানসিক রোগকে আমরা রোগ বলে স্বীকার করি না, এইজন্য আমরা অবিচারও করি অনেক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা যাক। বহুদিন পূর্ব্বে বড়বাজার অঞ্চলে জনৈক মাড়োয়ারী তার শিশুপুত্রকে দ্বিতলের জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। তদন্তের সময় সে নিম্নোক্তরূপ একটী স্বীকারোক্তি করে। স্বীকারোক্তিটী প্রণিধানযোগ্য।

"কোনও একটা ঘটনার পর আমার একটা উৎকট-মানসিক রোগ জন্মে। অদ্ভুত অদ্ভুত দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা আমাকে পেয়ে বসে। আমি কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না। এই অভাবনীয় রোগের কথা আমি কাউকে বলি না। বললে হয়ত কেউ বিশ্বাস করত না। তাছাড়া বলতেও আমার লজ্জা হ'ত। একদিন আমার ইচ্ছা হ'ল, আমি দ্বিতল থেকে লাফিয়ে পড়ি। কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে না পেরে, শেষে ভিতর থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা বাইরে ফেলে দি, সঙ্গে সঙ্গে আমার এই দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছারও উপশম ঘটে। পরের দিন আমার ইচ্ছে হয়, আমার পুত্রটীকে উপর হতে ফেলে দি। প্রাণপণে মনকে বাধ্য করবার চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না। নাচার হয়ে চাকরকে ডাকি, কিন্তু

কেউ আসে না। অবশেষে আমি ছেলেটীকে উপর থেকে ফেলে দি। ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আমার চেতনা আসে। আমি তখুনি ছুটে গিয়ে ছেলেটীকে আমার বুকে তুলে নি।"

মধ্য-কলিকাতার চাঞ্চল্যকর শিশুহত্যা এই জাতীয় অপরাধের একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আদালতে মামলাটির বিচার হয়, ঘটনাটির বিবরণ ছিল এইরূপ। ১৯৩৯ সালের এক শীতের রাত্রে একজন গুজরাটী যুবক থানায় এসে এজাহার দেয়, সে তার মনিবের শিশুপুত্রকে খুন করেছে। সে এইরূপ স্বীকারোক্তি করে বটে, কিন্তু তার পরিধেয় বস্ত্রাদিতে কোনও রূপ রক্তের দাগ দেখা যায় না। আসামী ছিল বহুবাজারের কোনও ভাটিয়া ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার। ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়। ডাক্তার আসামীকে সনাক্ত করেন এবং বলেন, আসামী তাঁর শিশুপুত্রকে ঠাকুর দেখাবার অছিলায় বেলা তিনটায় বাইরে নিয়ে যায়। ডাক্তার তাদের জন্য অনেক খোঁজাখুঁজি করেন ; আসামী যে তাঁর শিশুপুত্রকে খুন করেছে, একথা ডাক্তার কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে শিশুটী আসামীর খুব প্রিয় ছিল এবং আসামী নিজে ছিল বাড়ীর সকলের খুব প্রিয়পাত্র।

আসামী পুলিশ অফিসারদের বারাকপুরের এক মাঠে নিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ মাটীর উপর কিছু রক্ত দেখে। কিছুদূরে কথিত শিশুটির রক্তমাখা পরিধেয় বস্ত্রাদিও আবিষ্কার করে। কিন্তু শিশুটির দেহটীর কোনও সন্ধান তারা পায় না। শিশুর জামাটার বোতামগুলা লাগান ছিল। ফ্রকটীর অবস্থাও ছিল অনুরূপ। বহুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আসামী বলে, ফরিয়াদির (ডাক্তার) সহিত তার অবৈধ সম্বন্ধ ছিল ; তার এই দুরবস্থার জন্য ফরিয়াদি দায়ী, অথচ পূর্ব্বের ন্যায় তার প্রতি সে আর আগ্রহশীল নয়। এইজন্য তার এক ভগ্নীর সঙ্গে পরামর্শ করে সে

ডাক্তারের উপর এইরূপ প্রতিশোধ নিয়েছে। পরে কিন্তু আসামী বলে, তার এই পূর্ব্ব বিবরণ মিথ্যা; সে নিম্নলিখিতরূপ এক নূতন বিবৃতিও দেয়।

"আমার বাপ মায়ের আমি অবৈধ সন্তান। পিতা ছিলেন একজন সরকারী অফিসার। মা ছিলেন একজন হিন্দুনারী, মৃত্যুর সময় তিনি আমাকে তাঁর এক মুসলমান বান্ধবীর কাছে গচ্ছিত রাখেন। পালিতা মাতাকেই আমি মা বলে জানতাম। বড় হওয়ার পর বাড়ীর সকলে তাদের এক মুসলমান আত্মীয়ের সঙ্গে আমার সাদি দিতে চান। কিন্তু মা আমার এই বিবাহে মত দেন না। তিনি তখন আমার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন এবং আমাকে জানান, আমি একজন হিন্দু। তিনি বলেন, তাঁর প্রিয় বান্ধবী আমাকে তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন, তাঁর স্বর্গীয়া বান্ধবীর অবমাননা তিনি কিছুতেই সহ্য করবেন না। আমাকে তখন আমার সত্যকার পিতার নিকট পাঠান হয়। পিতা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে গ্রহণ করেন, কিন্তু বাড়ীতে স্থান দেন না। তিনি আমাকে একটী বোর্ডিংয়ে রাখেন, সেখান থেকে আমি পড়া শুনা করি। খরচ-খরচার অধিকাংশই কিন্তু আমার পালিতা মাকেই বহন করতে হয়। নিহত শিশুটীর মা ছিল তখন অবিবাহিতা বালিকা। বোর্ডিংয়ের পরের বাড়ীটাতেই সে থাকত। আমাদের মধ্যে এক অকৃত্রিম বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। কিছুদিন পরে লছমীর বিয়ে হয়। লছমী (শিশুটীর মাতা) শ্বশুর বাড়ী চলে যায়। তারপর অনেকদিন তাকে দেখিনি। ছু'মাস আগে ট্রেণে তার সঙ্গে দেখা হয়। তারই ইচ্ছায় ও উপদেশে তার স্বামীর কাছে চাকরী নিই। প্রথম প্রথম লছমী আমাকে খুবই যত্ন করত। কিন্তু সম্প্রতি সে আমাকে বিশেষ অশ্রদ্ধা করতে থাকে। এজন্য আমি বিশেষ ব্যথিত হই। আমার মনে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগে, ছেলেটীকে নিয়ে

প্রথমে যাই আমি কাঁচড়াপাড়ায়। সেখানকার একটা দোকান থেকে আমি ছুরি কিনি। তারপর শ্যামনগরে এনে ছেলেটাকে দুধ খাওয়াই। ছেলেটা ক্ষিদেয় কাঁদছিল, সন্ধ্যার কিছু পর ছেলেটাকে ব্যারাকপুরের একটা মাঠে আনি। ছেলেটাকে আমি খুব ভালবাসতাম। পিছন ফিরে ছুরিটা ছেলেটার গলদেশে শ্বাস-নালীর মধ্যে সজোরে বসিয়ে দিই! তারপর সেদিকে না তাকিয়ে তার দেহটাকে সেইখানে রেখেই আমি চলে আসি। দেহটা কোথায় গেল তা আমি জানি না।"

ফরিয়াদি এবং বাটীর অপরাপর সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, ফরিয়াদির স্ত্রী আসামীকে পূর্ব্বে কখনও দেখেনি। দুই মাস আগে লছমী তার বাপের দেশ থেকে কোলকাতায় ফেরে। তার দু'দিন পরেই আসামী ডাক্তারের কাছে আসে ও চাকুরি নেয়। ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার ছিল তখন একজন বাঙ্গালী। স্বদেশপ্রীতিবশতঃ ঘরিয়া ভাই রূপে ডাক্তার তাকে কার্য্যে বাহাল করেন। দু'দিন পূর্ব্বে লছমির নাম অঙ্কিত (মিসেস অমুক) কয়েকটী জার্ম্মান সিলভারের বাসন লছমীর বাক্সে আসামী চুপে চুপে রেখে যায়। লছমী তার এই কাজ দূর থেকে দেখে ও স্বামীকে জানায়। আসামীর এই বিসদৃশ ব্যবহারে বাটীর সকলে আশ্চর্য্য হয় ও আসামীকে অনুযোগ করেন। কিন্তু এজন্য তাকে কেউ ভর্ৎসনা বা অপমান করে নি।

আসামী পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে কাঁচরাপাড়ার যে দোকান থেকে ছুরি কিনেছিল সেই দোকান এবং শ্যামনগরের যে দোকানে শিশুটীকে দুধ খাইয়েছিল সেই দোকানটী দেখিয়ে দেয়। যে ট্যাক্সি এবং রিক্সাতে চড়ে আসামী কিছুটা দূর গিয়েছিল, সেই রিক্সাওয়ালা ও ট্যাক্সিচালককেও পুলিশ খুঁজে বার করে। এমন কি একজন কুলিকেও পাওয়া যায় যে আসামীকে ব্যারাকপুরের টিকিট কিনতে সাহায্য করেছিল। সব কয়টী

সাক্ষীই শিশুর ফটো থেকে শিশুটীকে সনাক্ত করে, তারা আসামীর বিবরণও সমর্থন করে। কিন্তু বহু চেষ্টার পরও পুলিশ শিশুটীর মৃতদেহের কোনও সন্ধান পায় না। আশে পাশে পুকুরগুলিতে পুলিশ জাল ফেলে, গঙ্গার ধারেও অনেক খোঁজাখুঁজি করে, কিন্তু লাসের কোনও সন্ধান পায় না। বহু চেষ্টার পর কিছু দূরে একটা ছোট কাঁচা মাথা পায় বটে, কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষায় সেটা একটা ১০ বছরের ছেলের মাথা বলে প্রমাণিত হয়। শিশুটীর বয়স ছিল মাত্র দু' বৎসর। তার মা'র বয়স ছিল তখন মাত্র আঠার। ওদিকে রক্ত পরীক্ষকের রিপোর্টে জানা যায় শিশুটীর পরিধেয় বস্ত্রাদিতে মনুষ্য রক্তের সঙ্গে কিছু ছাগ রক্তও আছে। এ সম্বন্ধে আসামীকে অনেক পীড়াপীড়ি করা হয়। কৈফিয়ৎ স্বরূপ আসামী বলে, ছেলেটীকে সে মান্দ্রাজে তার বোনের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে এবং দশ বৎসর পরে সে তাকে ফিরিয়ে দেবে। অনেক উপরোধ অনুরোধের পর আসামী গুজরাটী ভাষায় নিম্নলিখিত রূপ একটা চিঠি লিখে পুলিশের হাতে দেয়।

"প্রিয় বহিন, ছেলেটীর পিতামাতার কাতর ও পুলিশের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করতে আমি অক্ষম। এদিকে আমার জীবনও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ক'রাত্রি আমার ঘুম নেই, চিন্তা ও অবসাদে আমি কাতর। আমাদের প্রতিশোধ স্পৃহা আপাতত মুলতুবি থাক। আশাকরি খোকা তোমার কাছে ভালই আছে। অফুরন্ত জীবন আমাদের পড়ে রয়েছে। সময় ও সুবিধার অভাব হবে না। আমার মুখ চেয়ে পুলিশের হাতে ছেলেটীকে তুলে দিও। ভয় নেই, তোমার বা আমার ওতে কোনও ক্ষতি হবে না। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। ডিম্বের বর্ণ থেকে যেমন পক্ষীকে চেনা যায়, আশাকরি তেমনি আমার চিঠির ভাষা থেকে চিঠির প্রকৃত স্বরূপ তুমি বুঝতে পারবে। হাঁ, আমি ভালই আছি। ইতি—"

অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর পুলিশ গুজরাটের কোনও এক পল্লীতে আসামীর নিজ বাড়ী খুঁজে বার করে। ছোট একটা খোড়ো বাড়ী। আসামীর এক অন্ধপ্রায় বৃদ্ধা মাতা মাত্র সেখানে বাস করে। পড়শীদের দয়ার উপর নির্ভর করে তিনি বেঁচে আছেন। ক্বচিৎ কখনও মাত্র আসামী তাঁকে সামান্যরূপ সাহায্য পাঠায়। আসামীর এক সম্পর্কীয় ভগ্নী আছে বটে, কিন্তু সে থাকে তার স্বামীর সঙ্গে সিংহলে। তদন্তে প্রকাশ পায় আসামীর যাবতীয় কাহিনী কল্পিত। বৃদ্ধার চিঠিপত্র তল্লাস করে পুলিশ আসামীর লেখা খানকতক চিঠি উদ্ধার করে। দু'খানি চিঠির বাংলা তর্জ্জমা নিম্নে দেওয়া গেল।

"মা, ভাল আছ ত? শুনলে সুখী হবে, আমি বিয়ে করেছি। খুব ভাল বউ হয়েছে মা। খুব সুন্দরী, সত্যি বলছি। সে প্রায়ই তোমার কথা বলে, তোমাকে দেখতে চায়। কাল দু'জনে বায়স্কোপে গিয়েছিলাম। এর দাদারা খুব ধনী লোক। বিয়েতে আমরা পেয়েছি একটা মোটর গাড়ী, আর চমৎকার একটা বাড়ী। আমি একটা এখানে ব্যবসা ফেঁদেছি। অনেক টাকা লাভ হয়। শোন মা, তোমার বউ লেখাপড়াও জানে, তোমার ছেলের চাইতেও, বুঝলে। আমরা দু'জনে শীঘ্রই তোমাকে প্রণাম করে আসব।"

এর পরের চিঠিখানা প্রায় এক বছর পরের লেখা। অন্ততঃ চিঠির তারিখ থেকে তাই মনে হয়। দু'খানি চিঠিই কোলকাতা থেকে লেখা হয়েছে, কিন্তু ঠিকানা কোনটাতেই দেওয়া নেই। দ্বিতীয় চিঠিখানির কিয়দংশও নিম্নে দেওয়া হ'ল।

চিঠি দু'খানির বিবরণ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা সহজেই অনুমেয়।

"মা, আমি মাত্র কয়দিন পূর্ব্বে জাপান থেকে সস্ত্রীক ফিরেছি। চোখের চিকিৎসার জন্যে আমি সেখানে যাই। কিন্তু মা, আমি ভাল

হতে পারি নি। আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছি। তোমার বউই এখন আমার একমাত্র চক্ষু। সে আমাকে খুব যত্ন করে। আমার কথা তুমি ভেবো না। হাঁ, আমাদের একটা খোকা হয়েছে। ভারি চমৎকার খোকা। ভারি নরম তার দেহ। তুমি ভাল আছ ত মা? ভগবান আমার চক্ষু নিয়েছেন কিন্তু একটা খোকা দিয়েছেন, আর দিয়েছেন একজন সেবা-পরায়ণা বউ। না মা, আমার কোন দুঃখই নেই। আমি খুব ভাল আছি।"

অপহৃত শিশুটার মাতা আসামীর পায় ধরে কান্নাকাটি করে। আসামীকে একটু বিচলিত হতেও দেখা যায়। অবশেষে আসামী, লছমী দেবীর সঙ্গে একাকী বদ্ধ দুয়ারের মধ্যে কয়েক মিনিটের জন্য কথা কইতে চায়। এই প্রস্তাবে রাজী হলে সে শিশুটীকে ফিরিয়ে দেবে এরূপ প্রতিশ্রুতি দেয়। সে আরও বলে লছমী দেবীকে সে বরাবরই বহিনের মত দেখেছে এবং ওদিনেও তাকে বহিনের মতই সম্মান দেবে। এরূপ প্রস্তাবে লছমী দেবী রাজী হন, কিন্তু তাঁর স্বামী রাজী হন না। লছমী দেবী বলেন, তিনি একজন ভারতীয় নারী। তাঁর নারীত্বের সম্মান পুত্র বা পতির জীবনাপেক্ষাও মূল্যবান। তাছাড়া আত্মরক্ষা করতে তিনি অপারগ নন। কিন্তু এরূপ একটা দুঃসাহসিক ব্যাপারে কেউ মত দেন না। আসামীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়।

এরপর পুলিশ আসামীর চরিত্র সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করে। তদন্তে প্রকাশ পায়, অসামী মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে রূপোপজীবিনীদের গৃহে গিয়েছে। রূপোপজীবিনীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, আসামী উচ্ছৃঙ্খল ধরণের যুবকদের নিয়ে তাদের গৃহে গিয়েছে বটে, কিন্তু সে নিজে তাদের বহিন বলেই সম্বোধন করেছে। লছমী দেবীর প্রতিও যে সে কখনও কোনওরূপ বিসদৃশ ব্যবহার করেছে, এমন কোনও প্রমাণও

পুলিশ পায় না। ভাই সম্বোধনটী আসামী বিশেষ পছন্দ করত এবং প্রায়ই তাকে অন্যমনস্ক ও বিষণ্ণ দেখা যেত। সবিশেষ অনুসন্ধানের পরও আসামী সম্বন্ধে আর কোনও তথ্য জানা যায় না।

লছমী দেবীকে বালিকা বল্‌লেই চলে। তার উপর ছেলেটী ছিল তার প্রথম সন্তান। লছমী দেবীর কাতর ক্রন্দন ধ্বনি পুলিশকে বিশেষ অভিভূত করে। কিন্তু প্রাণপণ করেও তারা প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে অসমর্থ হন। আসামীকে শেষ পর্য্যন্ত এক সুবিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি সবিশেষ পরীক্ষা ও প্রশ্নোত্তরের পর নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আসামী একটী বিশেষ রকমের মানসিক রোগে ভুগছে। সে অনেক কিছু কল্পনা করে এবং তার সে কল্পনা সাহিত্যিকদের ন্যায় সাহিত্য রচনায় আবদ্ধ না রেখে সে তার সেই কল্পনাকে (সত্যকার) রূপ দিতে যায় বাস্তবতার মধ্যে (বা বাস্তব জগতে)। ডাক্তার সাহেব আরও বলেন, আসামী নিজেকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করে এবং সে মা হতে চায় এবং এইজন্যই সে লছমী দেবীর নাম-অঙ্কিত বাসনগুলি লছমী দেবীর বাক্সের মধ্যে রেখে দেয়, বাক্সটী যেন তারই, আপাতত সে ফরিয়াদীর স্ত্রীরূপে নিজেকে কল্পনা করছে। এরূপ অবস্থায় লছমী দেবীকে সতীনরূপে দেখে, তার উপর হিংসুক হয়ে উঠা আসামীর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। এরূপ ক্ষেত্রে হয় ত আসামী লছমী দেবীকেই হত্যা করত। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে সে শুধু মা হতে চায়। কিন্তু সে পুরুষ, মা হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সে নিজেকে অন্তঃসত্ত্বারূপে কল্পনা করে ছেলেটীকে সরিয়ে দিয়েছে। দশদিন দশমাস পরে হয় ত সে ছেলেটীকে বার করবে অর্থাৎ ছেলেটীকে তখন সে প্রসব করবে। আসামীকে পীড়াপীড়ি করা বৃথা। পীড়াপীড়ির ফলে সে মিথ্যার পর মিথ্যা বলবে মাত্র। আসামী যে স্ত্রীরূপে নিজেকে

কল্পনা করত, স্ত্রী মাত্রকেই এইরূপ ভগ্নী সম্বোধন, তার এক বিশিষ্ট প্রমাণ। এইজন্যই পুরুষরূপে সে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে নি।

মানসিক রোগ বহু প্রকারের হয়ে থাকে। একপ্রকার রাজনৈতিক অপরাধী আছে যারা আসলে রাজনৈতিক অপরাধী নয়। একটী বিশেষ চিত্ত-বিক্ষোভের জন্যই তারা রাজনৈতিক অপরাধী হয়॥ পিতার প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণা এবং মাতার প্রতি প্রভূত সহানুভূতি নানা কারণে তাদের অবচেতন মনে স্থান পায়। এই সুপ্ত অনুভূতির পরে বিকৃতি ঘটে। তারা হয়ে উঠে রাজনৈতিক অপরাধী। দেশ বা ভূমিকে তারা মাতৃজ্ঞান করে এবং পিতৃরূপী রাজা বা জমীদারদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টায় তারা পায় আনন্দ। তাদের অবচেতন মন মাতা-বসুন্ধরাকে ভোগ করতে চায় পিতৃরূপী রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। মনের সুপ্ত ইচ্ছার বিকৃতি ঘটার জন্যেই এই ধরণের রোগ জন্মে। এ ছাড়া বিকৃত যৌনবোধও মানুষকে অপরাধী করে। আমি একজন যুবককে জানি, যে মেয়েদের শাড়ী, চুলের কাঁটা ও জুতা চুরি করে আনন্দ পেত। যুবকটী এই চুরি লাভের জন্য করত না, সে চুরি করত তার যৌনবোধের তৃপ্তির জন্য; পুরুষদের দ্রব্যাদিতে সে কখনও হাত দেয় নি। এরূপ আরও বহুবিধ রোগ আছে। আমি একটী অপরাধীকে জানি, যে অপরাধ করত, শুধু প্রহৃত হওয়ার জন্য। প্রহৃত হওয়ার মধ্যে সে পেত প্রচুর আনন্দ। অপর একটী অপরাধী ভালবাসত অত্যাচারমূলক অপরাধ করতে, এরা উভয়েই অপরাধ-রোগী। একটা দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা তাদের মনে রোগরূপে আত্মপ্রকাশ করে। স্নায়বিক কারণে মনের অন্তর্নিহিত প্রতিরোধ ক্ষমতার হ্রাস ঘটলে, এইসব ইচ্ছা দমন করা কঠিন হয়। অনেকের মতে বিকৃত যৌনবোধই এই সব রোগের কারণ। দুর্দ্দান্ত পাগলকে যে কারণে আমরা সহ্য করি, ঠিক সেই কারণে

এদেরও সহ্য করা উচিত, আর উচিত উন্মাদের মত এদেরও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

এইরূপ আরও বহু প্রকার অপরাধী আছে যারা প্রকারান্তরে উন্মাদই, কিন্তু তাদের উন্মাদ অবস্থা বাস্তব জগতে ধরা পড়ে না এবং তাদের অপরাধ সকল অপরাধরূপেই চালু হয়। এই উন্মাদ অবস্থার ন্যায় উত্তেজনা দ্বারা অভিভূত হয়েও অনেক মানুষ অপরাধ করে যা স্বাভাবিক অবস্থায় তারা করে না। এরূপ একটা অপরাধের দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হ'ল। দৃষ্টান্তটী রবার্ট হণ্ট সাহেবের অপরাধ-বিজ্ঞান পুস্তকের ৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

বটিমের সহরের কোনও এক আদালতে একটী ভদ্রঘরের মহিলাকে বিচারার্থে আনা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল চুরির। দোকান থেকে সিল্কের টুকরা চুরি করার অপরাধে তিনি ধৃত হন। দোকান থেকে বেমালুম সিল্কের কাটা টুকরা তিনি তুলে নিয়েছিলেন। দোকানদার তাঁকে বামালসুদ্ধ ধরে ফেলে। থানায় পুলিশ মহিলাটীর দেহতল্লাস করে। মহিলাটী কিন্তু তার নাম বা ঠিকানা জানাতে চান না। পুলিশ নাচার হয়ে তাঁকে বিচারার্থে চালান দেয়। ঐ সময় মহিলাটীকে বিশেষ উত্তেজিত ও লজ্জিত দেখা যায়। মহিলাটী তিন দিন চোর-স্ত্রীলোক ও গণিকাদের সঙ্গে কারাবাস করেন। তাঁর বড় ছেলে অতিকষ্টে তাঁর সন্ধান পান এবং তাঁকে জামীনে খালাস করে আনেন। এক অভিনব অবস্থা ও বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়ে মহিলাটী লজ্জায় ও ঘৃণায় অস্থির হয়ে উঠেন এবং কিছুদিন পরে চিন্তায় চিন্তায় তাঁর মস্তিষ্কের বিকার ঘটে। কিছু সুস্থ হবার পর তিনি নিম্নলিখিত রূপ এক বিবৃতি দেন।

"আমার দু'টি মাত্র পুত্র। ছোট ছেলেটী ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে। আমি সদাসর্ব্বদাই তার জন্য চিন্তিত থাকি। একদিন খবর এল

আমার পুত্রের রণক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটেছে। আমি শোকে উন্মাদের মত হই। বীর পুত্রের সম্মান রক্ষার জন্য আমার মন উতলা হয়ে উঠে। আমার ইচ্ছে হয় একটা সিল্কের জাতীয় পতাকা কিনে আনি। আমি ছুটে চলে যাই বাজারের দিকে। অনাহার ও অনিদ্রায় আমার মন অস্থির কিন্তু তবু আমি ছুটে চলি। পথের ভিড়ে ধাক্কা খেয়ে দু দুবার হোঁচট্ খাই। শেষে রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়ী চাপা পড়ি। ধরাধরি করে কয়জন লোক আমাকে রাস্তার উপর উঠিয়ে দেয়। আমি পূর্ব্ব হ'তেই উত্তেজিত ছিলাম। এর পর আমার উত্তেজনা শেষ সীমায় এসে পৌছায়। আমার টাকা সমেত ব্যাগটা রাস্তায়ই পড়ে থাকে। কিন্তু সেদিকে আমার দৃষ্টি থাকে না। আমি আবার ছুটে চলি। এর পর কি হয়েছিল তা আমার মনে নেই। তবে ক্ষীণভাবে আমার মনে পড়ে, কারা যেন আমায় ধরে কোথায় নিয়ে এল। দারুণ উত্তেজনায় আমি আমার নাম পর্য্যন্ত ভুলে যাই। যখন আমি আমাতে ফিরে আসি, অর্থাৎ স্মৃতিশক্তি ফিরে পাই, তখন আমি জানতে পারি আমি একজন চোর। চৌর্য্য অপরাধে আমার বিচার হবে। আমি এখন মৃত্যুই শ্রেয়ঃ মনে করি। আমাকে এরা মেরে ফেলুক ফাঁসি দিক, জেলে না দেয়।"

মানুষ সাধারণতঃ মস্তিষ্কের দ্বারা চালিত হয়। কিন্তু মস্তিষ্ক ছাড়া মেরুদণ্ডস্থিত (মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ স্নায়ুদণ্ডের উপর অবস্থিত) স্নায়ুকেন্দ্রগুলিও মানুষের কার্য্যবিশেষের জন্য দায়ী থাকে। নিদ্রা যাওয়ার সময় কেউ যদি ব্যক্তিবিশেষের পায়ে চিমটি কাটে, তা হ'লে ঐ ব্যক্তি অজ্ঞাতসারেই পা-টা সরিয়ে নেয়। এই স্নায়ুকেন্দ্রগুলিই মানুষের এরূপ ব্যবহারের জন্য দায়ী। এরূপ অবস্থায় মস্তিষ্ক থাকে সুপ্ত এবং এই জন্য জাগ্রত হওয়ার পর মানুষের এই চিমটী-কাটাজনিত ব্যথা এবং চিমটি কাটার বা পা সরানর কথা মনে থাকে না। ইংরাজীতে একে বলে

রিফ্লেক্স্ এ্যাক্‌সন্। সবিশেষ উত্তেজনার মধ্যে পড়লে, মানুষের মস্তিষ্ক তার স্নায়ুকেন্দ্রগুলি থেকে পৃথক্ হয়ে পড়ে এবং মস্তিষ্কের আদেশ ব্যতিরেকে বা মস্তিষ্ককে না জানিয়ে, এই স্নায়ুকেন্দ্রগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করে। ফলে মানুষের অবস্থা তখন হাল-বিহীন নৌকা বা চালক বিহীন ছুটন্ত শকটের মত; ঠিক এরূপ অবস্থাতেই উপরি-উক্ত অপরাধটী সংঘটিত হয়েছিল। এজন্য চুরির ব্যাপারটী তার মনে ছিল না। রাত্রে অনেকে উত্তেজিত বা ভীত হয়ে ভূত দেখেন এবং ভয় পেয়ে দৌড় দেন। মাঠ ঘাট পথ খানা বেড়া ডিঙিয়ে তাঁরা ছুটে আসেন। কিন্তু তাঁদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কোন পথ দিয়ে এবং কেমন করে তাঁরা পালিয়ে এলেন—তাঁরা সে সম্বন্ধে কিছু জানাতে পারেন না। ভূত দেখা এবং এই ভূত দেখার পূর্ব্বেকার ঘটনাগুলি ছাড়া তাঁদের আর কিছুই মনে থাকে না। উপরোক্ত কারণেই তাঁদের এরূপ স্মৃতিবিস্মৃতি ঘটে। নিম্নের স্বীকারোক্তিটি প্রণিধান যোগ্য।

"হঠাৎ দীঘিটার ওপারে দেখলাম একটা হলদে রঙের জন্তু। বাঘ বলেই মনে হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুট দিলাম। বাড়ী ফিরে দেখলাম আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত। আমার জামা কাপড় ভিজে। সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত। মাথায় একটা আঘাত। কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে। কোন্ পথ দিয়ে আমি ফিরে এসেছি তা আমার মনে নেই। কোথাও পড়ে গিয়েছিলাম কিনা তাও মনে নেই। ছোট খালটি ডিঙ্গিয়ে এসেছি কিনা, তাও জানি না। বাগানের মধ্য দিয়ে এসেছি, না পথ বেয়ে এসেছি তাও জানি না।"

উক্তরূপ আরও কয়েক প্রকার বেঠিক অপরাধ আছে, যে সকল অপরাধকে অপরাধরূপে আদপেই ধরা উচিত নয়। এমন অনেক চুরি আছে যা এক প্রকার রোগ। এই সব লোকেরা চুরি করে লাভালাভের

জন্য নয় ; চুরি করবার এক অত্যদ্ভুত ইচ্ছা তাদের পেয়ে বসে। এরূপ ইচ্ছা দুর্দ্দমনীয় হয় না বটে, কিন্তু এই ইচ্ছার নিবৃত্তি না ঘটা পর্য্যন্ত তারা এক দারুণ অস্বস্তি অনুভব করে। তারা চুরি করে তাদের এই ইচ্ছার নিবৃত্তির বা অস্বস্তির উপশমের জন্যে। একদিন তারা চুরি করে, পরের দিন তারা চুরির জিনিস ফিরিয়ে দেয়। য়ুরোপে এমন অনেক ম্যানিয়া-গ্রস্ত ধনকুবের আছে, যারা দোকান থেকে বেমালুম জিনিস সরিয়ে পকেটে পুরেন। দোকানদাররা তা দেখে, কিন্তু কিছু বলে না। পরের দিন বড় রকমের একটা বিল পাঠিয়ে তারা মুল্যাদি আদায় করে নেয়। এই সব রোগীরা চুরি করার জন্য দ্রব্যাদি খুঁজে বেড়ায় না। তালা ভেঙ্গে বা পাঁচিল টপকেও তারা চুরি করে না। কোনও দ্রব্য একেবারে সামনে না পড়লে তাদের এরূপ ইচ্ছার উদয় হয় না। এই ইচ্ছার স্বরূপ ও গতি থাকে মৃদু এবং সদাসর্ব্বদাই এই ইচ্ছার উদ্রেক হয় না। এটা সাময়িক-ভাবেই আসে। বিশেষ জানাশুনা বাড়ী বা দোকান না হলে, রোগীরা এই সব কাজে হাত দেয় না। অনেক সময় এইরূপ ইচ্ছা তারা দমনও করে। এসম্বন্ধে কয়েকটা এ দেশী উদাহরণ দেওয়া যাক।

আমার এক সম্পাদক-বন্ধু একদা আমার বাড়ীতে তাঁর এক সাহিত্যিক বন্ধুকে নিয়ে আসেন। তার এই "অমুকবাবু" বন্ধুটীর এই রোগ ছিল। ঘরে বসে গল্প করতে করতে কখন যে তিনি আমার দামী মাফলারটা সরিয়ে ফেলেন তা আমি জানতে পারি না। উঠবার সময় আমার মাফলারটা আমার হাতেই তুলে দিয়ে সেটা আমাকেই তাঁর গলায় বেঁধে দিতে বলেন। আমি মাফলারটী নিঃসন্দেহে তাঁরই মনে করে সযত্নে তাঁর গলায় বেঁধে দি। বন্ধুটি সবই দেখেন এবং শোনেন, কিন্তু মুখে কিছুই বলেন না। ক'দিন পরে বন্ধুটি সব কথা আমায় খুলে বলেন এবং আমাকে তাঁর সেই বন্ধুটীর বাড়ী নিয়ে যান। অমুকবাবুর

ঘরের একটা আনলায় আমার মাফলারটা ঝুলান দেখি। সম্পাদক-বন্ধু নির্ব্বিকার চিত্তে মাফলারটা তুলে নিয়ে জানান, তিনি দুদিন আগে ওটা ওখানে ফেলে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ অধোবদন থেকে ভদ্রলোক উত্তর দেন—কেন লজ্জা দিচ্ছেন, ওটা আমি কালই সকালে দিয়ে আসতাম। বুঝলাম অমুকবাবুর এরূপ ইচ্ছার নিবৃত্তি বন্ধুবরের উপর দিয়েই সাধারণতঃ চলে থাকে।

কিছুদিন আগে এক মহিলা কবির গৃহেও এইরূপ একটী চুরি হয়। এক ভদ্রমহিলা তাঁর বাড়ীতে বেড়াতে আসেন এবং একটী মূল্যবান সোনার হার নিয়ে সরে পড়েন। মহিলা কবি সবই দেখেন, কিন্তু মহিলাটীকে কিছু বলতে কুণ্ঠিত হন। পরের দিন মহিলাটী তাঁর বাড়ীতে পুনরায় বেড়াতে আসেন, কিছুক্ষণ পরে হারটাও পূর্ব্বস্থানে ন্যস্ত দেখা যায়। ঐদিনই আবার মহিলা কবির একটা ছোটখাট কম মুল্যের জিনিষ খোয়া যায়। কিন্তু পরের দিন তিনি কাশ্মীর রওনা হন, সুতরাং জিনিসটীও তিনি আর ফিরে পান না।

এই সব অপরাধী ছাড়া শিশু ও অপরিণত বালক দ্বারা কৃত কোনও অপরাধ অপরাধরূপে স্বীকৃত হয় না। মাতাল অবস্থায় লোকে যদি কোনও অপরাধ করে ত তার সেই অপরাধকেও অপরাধ রূপে ধরা হয় না, যদি না সেই ব্যক্তি অপরাধ করার উদ্দেশ্যেই মদ্য পান করে থাকে। এই সকল অপরাধী বা অপরাধ-রোগীরা ভুলক্রমে যাতে আসল অপরাধী-রূপে শাস্তি না পায়, সে সম্বন্ধে রাষ্ট্র মাত্রেরই লক্ষ্য রাখা উচিত। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পূর্ব্বাপর মানসিক অবস্থা, হাবভাব, ব্যবহার, সামাজিক, আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থা লক্ষ্য করে সহজেই বুঝে নেওয়া যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন সঠিক অপরাধী বা অপরাধ-রোগী। অভিযুক্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের

উদ্রেক হওয়া মাত্র, তাকে তদন্ত সাপেক্ষে হাজতে রেখে বা জামীনে খালাস দিয়ে, অপরাধীর মানসিক, পারিপার্শ্বিক ও অপরাপর বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া উচিত। তাদের বংশ পরিচয় (অর্থাৎ তাদের পিতামাতা এবং পিতৃ ও মাতৃকুলের অপরাপর ব্যক্তিদের জীবন বৃত্তান্ত) থেকে অপরাধীর প্রকৃতি সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞাত হয়ে তাদের এই রোগ এবং রোগের কারণ সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানা যায়। বৃটিশ আইনের মূল নীতি হচ্ছে, পঞ্চাশটা অপরাধী খালাস পাক ক্ষতি নেই, কিন্তু ভুলক্রমে একজন নিরপরাধীরও যেন শাস্তি না হয়। সৌভাগ্যক্রমে ভারতীয় পুলিশ ও ভারতীয় আদালত সমূহ এ বিষয়ে সবিশেষ সচেতন। ভারতীয় দণ্ডবিধি মাত্র জ্ঞানতঃ দোষী ব্যক্তিদেরই শাস্তি চাহে। উপরি উক্ত ক্রিপটাম্যানিয়ার কথাই ধরা যাক। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারার চৌর্য্য অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইরূপ : কেহ যদি অপরের দখলিভূত কোনও অস্থির বা অস্থাবর দ্রব্য দখলীভূত ব্যক্তির বিনা অনুমতিতে আত্মসাতের বা ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে অপসরণ করে ত তার এই কার্য্যকে চৌর্য্য কার্য্য বলা হয়। এক্ষেত্রে অপরাধীরা উক্ত রূপে দ্রব্যাদি অপসরণ করে বটে, কিন্তু তা তারা করে আত্মসাতের বা ক্ষতি করার উদ্দেশে নয়। এরূপ কার্য্য সে করে তার অপরাধ-স্পৃহার (আত্ম-নিবৃত্তির) নিবৃত্তির জন্য। তার এই কাজের জন্য সে প্রায়ই অনুতপ্ত হয় এবং হৃত দ্রব্য ফেরত দেবার জন্য সর্ব্বদাই সুযোগ ও সুবিধা খোঁজে। অনেক সময় লজ্জার খাতিরে সে হৃত দ্রব্য বিনষ্ট করে, কিন্তু পারতপক্ষে তা ব্যবহার বা আত্মসাত করে না।

এই বিশেষ রোগ সকল ছাড়া আরও একপ্রকার রোগ আছে যার জন্য মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে অর্দ্ধসুপ্ত অবস্থায় অপরের আদেশে অপরাধ করে থাকে। এই বিশেষ রোগগ্রস্ত মানুষের মন কতকটা

স্নায়ুদুর্ব্বল হিষ্ট্রিয়া ব্যক্তির ন্যায়ই হয়ে থাকে। বিশেষ বিশেষ কারণে এই সব রোগীরা অপর এক ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে মোহাবিষ্ট অবস্থায় সেই বিশেষ ব্যক্তির কথা বা আদেশ মত কাজ করে থাকে। জ্ঞান হওয়ার পর সুস্থ অবস্থায় উপনীত হয়ে কিন্তু তারা তাদের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম বা অপকর্ম্মের কথা প্রায়ই ভুলে যায়। বিজ্ঞ দুর্ব্বৃত্তরা প্রথমে উক্ত-প্রকার স্নায়ুদুর্ব্বল হিষ্ট্রিয়া রোগীদের খুঁজে বার ক'রে নিজেদের আয়ত্তে আনে এবং পরে কৃত্রিম উপায়ে তাদের এই বিশেষ স্নায়বিক রোগকে জাগ্রত ক'রে তাদের কিছুক্ষণের জন্য রোগগ্রস্ত মোহগ্রস্ত করে। বহুক্ষেত্রে এই সব রোগীরা আপনা আপনিই ভাবগ্রস্ত বা রোগগ্রস্ত হয়েছে। এই সুযোগে দুর্ব্বৃত্তরা রোগীর অবচেতন মনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং বাক-প্রয়োগে বা সাজেস্সনদ্বারা তাদের নানারূপ আদেশ জানায়। এই বিশেষ অবস্থায় রোগীর প্রতিরোধ শক্তি সাময়িক ভাবে বিনষ্ট হয়। তাদের চেতন মন তখন সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং অবচেতন মন কার্য্যকরী হয়ে উঠে। রোগী তখন জাগ্রত ও সুপ্ত অবস্থার মাঝামাঝি একটী বিশেষ অবস্থায় উপনীত হয়। এরূপ অবস্থায় সে মাত্র আদেশকারীর পরিচিত স্বরই শুনতে পায় বা শুনে বলে অনেকের ধারণা। এইরূপ অবস্থায় আদেশকারী দুর্ব্বৃত্ত রোগীকে অপকর্ম্মে নিযুক্ত করে। রোগী তখন সুপ্ত ও মোহাবিষ্ট অবস্থায় দাঁড়িয়ে উঠে এবং খুন প্রভৃতি বহুবিধ অপকর্ম্ম আদেশকারীর আদেশমত করে যায়। সুস্থ এবং জাগ্রত অবস্থায় কিন্তু রোগীর স্বকৃত কর্ম্ম ও অপকর্ম্মের কোনও কথা মনে থাকে না। নিদ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি মোহাবিষ্ট ও রোগগ্রস্ত অবস্থায় তাদের দ্বারা এই সব কাজ করান হয়। তবে এই সব পরীক্ষার জন্য এই বিশেষ মনোবিকারগ্রস্ত রোগীদেরই বেছে নেওয়া হয়। অবশ্য এ সম্বন্ধে এখনও অনেক মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, এই সব

রোগীরা মোহাবিষ্ট অবস্থায় আদেশকারীর যুক্তিসঙ্গত কথাগুলি মেনে নিলেও, অন্যায় ও অমনোনীত কথাগুলি কখনও মানে না। এরূপ অবস্থায় হঠাৎ তারা অবাধ্য হয় এবং তাদের চেতনা ফিরে আসে। এইসব ব্যাপারে আদেশকারীর কিছুমাত্র বাহাদুরী নাই। রোগীর রোগই তাদের এরূপ দুরবস্থার জন্য দায়ী। দুর্বৃত্তরা এইসব রোগীর রোগের সুযোগ নেয় মাত্র। সুস্থমনা নিরোগ ব্যক্তিদের যে এই ভাবে মোহাবিষ্ট করা যায় না এ কথা খাঁটি সত্য। এরূপ সম্ভব হলে সমাজে বাস করা অসম্ভব হ'ত। তা ছাড়া এই ধরণের রোগীর সংখ্যাও সমাজে কম থাকে এবং যে কটী থাকে তারা কদাচিৎ দুর্বৃত্তদের হাতে পড়তে পায়, পড়লেও সব সময়েই তাদের আয়ত্তে আনা যায় না, কারণ সকল সময়ই তাদের মন দুর্ব্বল বা রোগগ্রস্ত হয় না বা কদাচিৎ হয়। এই কারণে মোহাবিষ্ট অবস্থায় অপরের আদেশে অনিচ্ছাকৃত অপরাধ করার যে সব চাঞ্চল্যকর কথা বা কাহিনী সচরাচর আমরা শুনতে পাই তা প্রায়শঃই অলীক ও মিথ্যা। অনেকের মতে মানুষ এরূপ অবস্থায় কখনও উপনীত হয় না। এবং এ সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী শুনা যায় তার সবকটীই জাল জুয়াচুরি মাত্র। অপরাধীরা আইনকে ফাঁকি দেবার জন্যই এই সব কাহিনীর অবতরণ করে।

সাধারণ ভাবে ঘুমন্ত অবস্থায়ও নিজের অজ্ঞাতে কেউ কেউ অনেক উৎকট অপরাধ করেছে বলে শোনা গেছে। মানুষের চেতন মনেই প্রতিরোধ শক্তি থাকে বেশী, ঘুমন্ত অবস্থায় অবচেতন মনই অধিক কার্য্যকরী হয়। জাগ্রত অবস্থায় মানুষের মনে বহুবিধ কদর্য্য ইচ্ছা আসে, কিন্তু চেতন মনের প্রতিরোধ শক্তি এই সব অন্যায় ইচ্ছা দমন করে। ঘুমন্ত অবস্থায় এই সব কুইচ্ছা দানা বাঁধে, কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় স্নায়ুর শক্তি ক্ষীণ থাকায় এই সব ইচ্ছা কার্য্যকরী হয় না। কিন্তু এমন

অনেক রোগ আছে যার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় মোহাবিষ্টের ন্যায় চলাফেরা করে, কথা বলে ও অপকার্য্যও করে। মনের সুপ্ত ইচ্ছা অদমনীয় হয়ে কার্য্যকরী হয়ে উঠে এবং সুপ্ত ও মোহাবিষ্ট অবস্থায় মানুষ অনেক সময় খুনও করে ফেলে।

এইরূপ রোগীদের দ্বারা কৃত কোনও অপরাধকে অপরাধ বলে স্বীকার করা উচিত নয়। বরং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত।

এ বিষয়ে পুলিশের সঙ্গে মনস্তত্ত্ব পণ্ডিতদের সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইউরোপ ও আমেরিকার এমন অনেক রাষ্ট্র আছে যেখানে য়ুনিভারসিটীর প্রফেসাররা পুলিশকে প্রায়ই পরামর্শ দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতে এমন একটীও বিশ্ববিদ্যালয় নেই, যেখানে অপরাধ-বিজ্ঞান চর্চ্চার কোনও ব্যবস্থা আছে।

অপরাধ স্পৃহা

সাধারণতঃ তিনপ্রকারের অপরাধী দেখা যায়, তাদের যথাক্রমে (১) স্বভাব-অপরাধী (২) অভ্যাস-অপরাধী (৩) দৈব-অপরাধী বলা হয়, এই তিন প্রকারের অপরাধী তিনপ্রকার অপরাধ স্পৃহার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে সংশ্লিষ্ট। তাই প্রথমেই অপরাধ স্পৃহা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এই অপরাধপ্রবণতা বা অপরাধ স্পৃহা জীবমাত্রেরই আদিমতম অভ্যাস। উদ্ভিদ জগতেও এমন অনেক হিংস্র উদ্ভিদ আছে, যারা পোকামাকড় বা জীবজন্তু হনন করে আহারের যোগাড় করে। প্রাণীজগৎ সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। প্রাণীজগতে এরূপ অপরাধ অপরাধই নয়। বরং সেটা তাদের কাছে ধর্ম্মবিশেষ। আক্রমণাত্মক

স্বভাব বা পরদ্রব্য হরণের অভ্যাসই প্রাণী-বিশেষের জীবন ধারণের একমাত্র উপায়। আদিম যুগের মানুষও ঠিক এই উদ্ভিদ বা প্রাণীবিশেষের মত অপরাধপ্রবণ ছিল। পরদ্রব্য বা পরস্ত্রী-হরণ ছিল তখন তাহাদের কাছে একটা বাহাদুরীর বিষয়। তাদের এই সকল দুষ্কার্য্য সেকালে অপরাধ ব'লে ত স্বীকৃত হ'তই না, অধিকন্তু তাদের সেই অকাজ ও কুকাজ সকল বীরত্বের আখ্যায় ভূষিত হ'ত, এই সকল অকাজ ছিল তৎকালীন সমাজের অতি সাধারণ ও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কালক্রমে মানুষ তার সেই পুরাতন অভ্যাস ও স্বভাব ত্যাগ করেছে। সুসভ্য মানুষের মনে বাহ্যতঃ অপরাধ স্পৃহার স্থান নেই, আদিম যুগের অপরাধমূলক অভ্যাস ও স্বভাব আজকার সভ্যসমাজে বিরল।

আদিম যুগের মানব বলতে আদিম কালের একাচারী মানব বুঝায়, দলবল বা গোষ্ঠীর মানব বুঝায় না, দলবদ্ধ মানব অপেক্ষা একাচারী আদিম মানব অধিক পরিমাণে অপরাধপ্রবণ হ'ত।

(কুইবী সাহেব আজকালকার আদিম জাতিগুলির সঙ্গে কিছুদিন বাস করেন। তাঁর মতে তারা ভিন্ন গোষ্ঠীর মানবদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে বটে, কিন্তু নিজ গোষ্ঠীর মানবের উপর কোনও রূপ অপরাধমূলক কার্য্য করে না। এই কারণে তিনি গোত্রানুক্রমে মতের তীব্র সমালোচনা করেন। আলোচনার মধ্যে দলবদ্ধ মানবের আরও পূর্ব্বেকার একাচারী মানবদের তিনি স্থান দেন নি। পৃথিবীর সমুদয় আদিম গোষ্ঠী ও তাঁদের বিভিন্ন স্তরের সভ্যতার সঙ্গেও তিনি পরিচিত নন। প্রাথমিক যুগে মানুষ একাচারী ছিল এবং পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কার্য্য করত। পরে তারা দলবদ্ধ ভাবে বাস করতে থাকে। এই সময় তারা ব্যক্তিগত ভাবে স্বদলীয় লোকেদের বিরুদ্ধে অপরাধ করতে থাকে এবং সংঘবদ্ধ ভাবে অপরাধ করে অপর দলীয় বা গোষ্ঠীর

লোকদের বিরুদ্ধে। পরে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা দল থেকে সৃষ্ট হয় জাতি। অনুরূপ ভাবে মানুষ তখন ব্যক্তিগত ভাবে স্বজাতীয় লোকদের বিরুদ্ধে অপরাধ করে এবং সংঘবদ্ধ ভাবে অপরাধ করে পর-জাতীয়দের বিরুদ্ধে। পরজাতীয়দের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য স্বজাতীয়দের মধ্যে সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন হয়। অন্তর্দ্বন্দ্ব সকল দমন করার জন্য দলপতি বা রাজা তখন নানারূপ শাসনের প্রবর্ত্তন করেন। এই ভাবে অধিকাংশ মানুষের স্বাভাবিক অপরাধপ্রবণতা সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, স্বগোষ্ঠীয়দের বেলায়। এ ছাড়া এদের মধ্যে বুদ্ধিগত শিক্ষার অভাব থাকলেও নৈতিক শিক্ষার দিক থেকে এদের কোনও কোনও গোষ্ঠী অধুনাকালে বহু অংশে উন্নত। কুইবী সাহেব মানব সভ্যতার এই বিশেষ দিকটার কথা ভেবে দেখেন নি, এই জন্য তাঁর মতটিও গ্রহণযোগ্য নয়।)

আদিম যুগের এই প্রকৃতি-বিশেষ বাহ্যতঃ পরিত্যক্ত হ'লেও মানব মনের অন্তঃপ্রদেশ হ'তে আজও তা বিদূরিত হয় নি। মানুষের এই সহজাত আদিম অপরাধ স্পৃহার এক তৃতীয়াংশ সকল মানুষের মধ্যেই অল্পবিস্তর বর্ত্তমান। সেটা আমাদের স্নায়ু ও মজ্জার মধ্যে নিহত। অনুকূল অবস্থায় এই সহজাত স্পৃহা বহির্মুখী হয়ে আমাদের অল্পবিস্তর অপরাধপ্রবণ করে। এই আদিম অপরাধ স্পৃহার ⅔ অংশ নিবদ্ধ থাকে মানুষের বীজকোষে এবং ⅓ অংশ থাকে দেহকোষে। এই সম্বন্ধে অধিক কিছু বুঝতে গেলে, প্রথমেই বুঝা দরকার বীজকোষ এবং দেহকোষ কাকে বলে। একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। মানুষের দেহে দুই প্রকারের কোষ বা সেল দেখা যায়, সমেটিক সেল বা দেহকোষ এবং জার্ম্ম সেল বা বীজকোষ। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, স্নায়ু ও মজ্জা, আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি সমস্তই দেহকোষ দ্বারা নির্ম্মিত, কিন্তু এই দেহকোষ ছাড়া মানব-দেহে আর একপ্রকার কোষ রক্ষিত আছে, তাকে আমরা বীজকোষ বলি।

এই সকল বীজকোষই পরবর্ত্তী বংশধরদের জন্ম দেয়। তারা বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ দেহ কোষের সৃষ্টি করে ও সেই সঙ্গে কিছু বীজকোষ সেই সকল দেহকোষ দ্বারা নির্ম্মিত দেহের মধ্যে, পরবর্ত্তী বংশধরের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে অবশিষ্ট রেখে, বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে। মানুষের আদিম অপরাধ স্পৃহার প্রায় $\frac{২}{৩}$ অংশ নিহত থাকে এই বীজকোষের মধ্যে এবং $\frac{১}{৩}$ অংশ মাত্র দেহকোষের মধ্য দিয়ে স্নায়ু ও মজ্জার মধ্যে তথা মানব মনের অন্তর্দ্দেশে স্থান পায়। সাধারণতঃ মানুষের এই আদিম অপরাধ স্পৃহার $\frac{২}{৩}$ অংশ বংশপরম্পরায় বীজকোষেই নিবদ্ধ থাকে। দেহকোষে সংক্রামিত হয় না। কিন্তু কদাচিৎ এর ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে। বহু পুরুষ বাদে বংশের কোনও কোনও সন্তানের দেহকোষে তা দৈবক্রমে সংক্রামিত হয়। তখন বীজকোষস্থিত অপরাধ স্পৃহার $\frac{২}{৩}$ অংশ, দেহকোষের স্বভাবসুলভ $\frac{১}{৩}$ অংশ অপরাধ স্পৃহার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বংশের সেই সন্তানটীকে করে তুলে একজন উৎকট অপরাধী। এইরূপ অপরাধীকে বলা হয় স্বভাব অপরাধী। তবে বীজকোষস্থিত অপরাধ স্পৃহার কতখানি দেহকোষে সংক্রামিত হবে তা নির্ভর করে অপরাধী বিশেষের ভাগ্যের উপর। অপরদিকে কেবলমাত্র দেহকোষ নিহিত $\frac{১}{৩}$ অংশ অপরাধ স্পৃহার বহিঃপ্রকাশ দ্বারা যে সকল ব্যক্তি অপরাধমুখী হয়ে উঠে, তাদের বলা হয় অভ্যাস-অপরাধী। অভ্যাস-অপরাধীরা স্বভাব অপরাধীদের ন্যায় উৎকট অপরাধী হয় না, কারণ তারা মানবজাতির আদিম স্পৃহার মাত্র $\frac{১}{৩}$ অংশের উত্তরাধিকারী।

এই অপরাধ স্পৃহার সঙ্গে যৌন স্পৃহাও মানুষের দেহ ও বীজকোষে নিহিত আছে। স্বভাব-অপরাধী, অভ্যাস-অপরাধী ও দৈব-অপরাধীর ন্যায়, মানবের মধ্যে স্বভাব-লম্পট, অভ্যাস-লম্পট ও দৈব-লম্পট এবং মানবীর মধ্যে স্বভাব-বেশ্যা, অভ্যাস-বেশ্যা ও দৈব-বেশ্যা দেখা যায়।

মানবের লাম্পট্য অবস্থাভেদে অপরাধের সামিল, কিন্তু মানবীর পক্ষে বেশ্যা-বৃত্তি সাধারণ অপরাধ নয়। বেশ্যা-বৃত্তির সঙ্গে চৌর্য্য-বৃত্তি প্রভৃতির একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সেইজন্য এই বিষয়ে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। চৌর্য্য-বৃত্তির ন্যায় এই বেশ্যা-বৃত্তিও পৃথিবীর আদিম ব্যবসা। আদিম কালে চৌর্য্য-বৃত্তির ন্যায় বেশ্যা-বৃত্তিও দোষণীয় ছিল না। এজন্য বেশ্যা-বৃত্তির স্পৃহাও বংশানুক্রমে মানবী লাভ করে। বেশ্যা-বৃত্তি স্পৃহার ⅓ অংশ থাকে তাদের দেহকোষে ও ⅔ অংশ থাকে তাদের বীজকোষে। এই বিশেষ স্পৃহা সুপ্ত অবস্থায় সকল মানবীর মধ্যেই কিছু না কিছু বর্ত্তমান আছে। সাধারণতঃ মেয়েরা চোর হয় না। চোরের সঙ্গে বাস করলেও না। যৌবনটা মেয়েদের সন্তানাদি পালনেই অতিবাহিত হয়। অপরাধী হওয়ার সুযোগও তাদের কম। নারীদের মধ্যে অভ্যাস এবং দৈব-অপরাধীর সংখ্যাই বেশী। মেয়েরা কখনও স্বভাব-অপরাধী হয় না। কদাচিৎ দুই একটী স্ত্রী-অপরাধীকে স্বভাব বা অভ্যাস-অপরাধীদের ন্যায় দেখা যায় বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে নারী-সুলভ কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় না। তাদের হাবভাব ও গঠনাদি প্রায়ই পুরুষোচিত হয় এবং নারীত্ব সম্বন্ধে তারা প্রায়ই অচেতন থাকে। এই ধরণের মেয়েদের পুরুষরূপেই ধরা উচিত। মনের দিক থেকে এরা পুরুষ ছাড়া আর কিছু নয়। মেয়েদের "কর্টেক্স গ্লাণ্ডের" বৃদ্ধি ও "মেডুলার" হ্রাস ঘটিয়ে যে কোনও মেয়ের মধ্যে পুরুষের ন্যায় ভাব আনা যায়। ১৪ বৎসরের নিম্নবয়স্কা ও ৪৫ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্কা নারীদের মধ্যে পুরুষের ন্যায় ভাব বর্ত্তমান থাকে। এই কারণে তাদের মধ্যেই কিছু পরিমাণে অপরাধ-স্পৃহা স্থান পায়। প্রকৃত নারীরা সাধারণতঃ স্বভাব-অপরাধী বা অভ্যাস-অপরাধী হয় না। সেই স্থলে তারা হয় স্বভাব-বেশ্যা বা অভ্যাস-বেশ্যা। হয় তাদের মধ্যে অপরাধ স্পৃহা সমধিক পরিমাণে বর্ত্তায় না, না হয় তাদের দেহ মধ্যে বিশেষ বিশেষ রস-

পিণ্ডের অবস্থান হেতু স্নায়বিক কারণে সেটা সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রায়ই দেখা যায়, ভাই স্বভাব-চোর হ'লে বোন হয় স্বভাব-বেশ্যা। অভ্যাস-চোর বা অভ্যাস-বেশ্যা অবস্থা গতিকে হয়। তাই ভাই অভ্যাস-চোর হলেও বোন সব সময় অভ্যাস-বেশ্যা হয় না। মেয়েরা অপরাধীদের অপরাধ করতে প্ররোচিত করে বটে, কিন্তু নিজেরা অপরাধ করে খুব কম। মেয়ে-চোরদের মধ্যে অপরাধ-রোগীর সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। অনেক সময় তারা উত্তেজনাবশতঃ অপরাধ করে এবং তাদের সেই সকল অপরাধ বৈজ্ঞানিক মতে সঠিক বা প্রকৃত অপরাধের মধ্যে পড়ে না।

গর্ভ, রজঃস্বলা ও রুগ্ন অবস্থায় নারীরা এই উত্তেজনা রোগে ভোগে। ফরাসী পণ্ডিত লেগব্যাণ্ড ডু ১৫৫টী স্ত্রী অপরাধীকে কোনও এক ফরাসী কারাগারে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষান্তে তিনি নিম্নোক্তরূপ ফল পান।

উন্মাদ	...	৪৯
অপরাধ-রোগী	...	৫৬
রজঃস্বলা	...	৩৫
গর্ভবতী	...	৫
রোগী	...	১০
		১৫৫

বিষ প্রয়োগাদি কার্য্যে কখনও কখনও মেয়েদের অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায় বটে কিন্তু তারা এরূপ অপরাধ করে প্রায়ই প্রতিহিংসা চরিতার্থ বা আত্মরক্ষার জন্য। যৌন কারণেও তারা এই সব কাজে হাত দেয় বটে, কিন্তু বিত্ত লাভের জন্য অপরাধ করে তারা কদাচিৎ। এবিষয়ে পুরুষের উপরই তারা নির্ভরশীল থাকে। দৈবচোর ছেলে ও মেয়ে উভয়ই হ'তে পারে এবং হয়ও। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিকের মতে মেয়েরা স্বভাব-চোর না হলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের অভ্যাস-

চোর হ'তে দেখা যায়। বোধ হয় তাঁরা কারাগার সমূহে কিছু কিছু মেয়ে চোরের সংখ্যা দেখে এরূপ ধারণায় উপনীত হয়েছেন। তাঁদের মতে প্রয়োজন ও সুযোগের অভাবের জন্যই মেয়েরা চৌর্য্য অভ্যাসে অপারক হয়। পর্দ্দাপ্রথা গৃহস্থালী কার্য্য এবং সন্তান পালন ও ধারণ প্রভৃতির জন্য তাদের চোর হওয়া সম্ভব হয় না। আমি কিন্তু এ কথা স্বীকার করি না। কারণ, এই সব পণ্ডিতেরা মেয়ে চোরদের মধ্যে পুরুষালি ভাব কতটা আছে এবং তাদের মধ্যে প্রকৃত মেয়েলী ভাব ও নারীত্বই বা কতটুকু আছে এবং তারা অপরাধ-রোগী বা দৈব-অপরাধী কিনা সে সম্বন্ধে কোনও রূপ অনুসন্ধান না ক'রেই এইরকম সিদ্ধান্তে এসেছেন। পৃথিবীতে কোটী কোটী বেশ্যা নারী আছে যারা না মানে পর্দ্দাপ্রথা, না করে সন্তান পালন বা ধারণ কিন্তু তাদের শতকরা ৯৯ ভাগই, কখনও কোনও চৌর্য্য কার্য্যে হাত দেয় না বা দেয় নি। তবে এ সম্বন্ধে যে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন তা আমি স্বীকার করি। আমার মতে মেয়েরা দৈব-অপরাধী হয় বটে কিন্তু দৈব-অপরাধী থেকে অভ্যাস-অপরাধীতে পরিণত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অপরাধ স্পৃহা তাদের মধ্যে সকল সময় থাকে না। অবস্থাক্রমে তারা হঠাৎ কোনও অপরাধ করলেও অবস্থাভেদে তারা সে অপরাধ আর করে না। কোনও কোনও স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতীয় মেয়েদের মধ্যে বহু চোর মেয়ে দেখা যায় বটে কিন্তু সেই সব মেয়েদের মধ্যে পুরুষালী ভাবই দেখা যায় বেশী।

এইবার মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত অপরাধ স্পৃহা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে এবং এই অপরাধ স্পৃহা যে আধুনিক সুসভ্য মানুষ তাদের পূর্ব্বপুরুষ আদিম মানুষের কাছ থেকে পেয়েছে—তার প্রমাণ সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা যাক। আমার মতে আধুনিক যুগের মানব শিশুদের

মধ্যে সুস্পষ্ট অপরাধ স্পৃহার অবস্থিতি এর সব চেয়ে বড় প্রমাণ। শিশু ও বালকদের আমরা প্রায়ই নিষ্ঠুর, মিথ্যাবাদী ও অপরাধী হ'তে দেখি। এর ওর জিনিস কেড়ে নেওয়া বা লুকিয়ে রাখা বা সরিয়ে ফেলা বালকদের কাছে একটা খেলা মাত্র। অযথা লোককে মারধোর করা, বিড়াল প্রভৃতি দুর্ব্বল জীবের উপর অত্যাচার করা তাদের কাছে একটা দৈনন্দিন ব্যাপার। নানাভাবে ও নানারূপে প্রতিদিন তারা বহু অত্যাচার ও অপরাধমূলক কার্য্য করে, কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে এবং শিক্ষা ও পরিবেশের মধ্যে পড়ে তারা নিজেদের শুধরে নেয় এবং সাধু হয়ে উঠে। কিন্তু মূল অপরাধ স্পৃহা তাদের অন্তঃস্থল কখনও পরিত্যাগ করে না, সেটা তাদের মধ্যে সুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয় মাত্র। যে সকল বালক অসৎ আয়ার কোলে মানুষ হয় বা সংস্কৃতিগত আওতার বাইরে সহজভাবে বাড়ে তাদের মধ্যে এই অপরাধ-মুখী ভাব প্রকটতর ভাবেই দেখা যায়। নিম্ন সমাজের বালকগণের মধ্যে এই অপরাধ স্পৃহা আমরা অধিকতর ও সুস্পষ্ট রূপে দেখে থাকি। অপরদিকে পরিবার বিশেষ যত কালচার্ড বা শিক্ষিত হয় তাদের বালকেরাও তত কম অপরাধ-মুখী থাকে। এই থেকে বেশ বোঝা যায় যে, মানুষ সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে তাদের এই আদিম অপরাধ স্পৃহা পরিত্যাগ করেছিল। তা ছাড়া আধুনিক অপরাধীদের প্রকৃতি ও স্বভাব বিচার করলে তাদের "বড় বালক" (বৃহদাকার বালক) বা "বিগ বয়" বলেই মনে হয়। তাদের অন্তঃস্বভাব প্রায় বালকোচিতই হয়ে থাকে। বালকদেরই ন্যায় তারা অব্যবস্থচিত্ত, বোকা অথচ ধূর্ত্ত, মিথ্যাপ্রিয়, কখনও কখনও বা কর্ম্মবিমুখ, অলস এবং সরলপ্রকৃতিরও হয়ে থাকে। বালকদেরই ন্যায় তাদের যা কিছু কর্ম্মতৎপরতা ও ধূর্ত্ততা তা অসৎ এবং অপকার্য্যেই ব্যয়িত হয়। এ কথা আসল বা প্রকৃত অপরাধীদের (দৈব-অপরাধী বাদে) সম্বন্ধে বিশেষ-

রূপে বলা চলে। বিবর্ত্তনবাদবিদ্ পণ্ডিত মাত্রেই জানেন লক্ষ বৎসরের ক্রমিক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে কোনও এক নীরস্থিক জীব থেকে অস্থিক মৎস্য জীবের সৃষ্টি হয়। এর বহু পরে নানারূপ নৈসর্গিক ও বায়বিক কারণে লক্ষ লক্ষ বৎসরের ক্রমিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে মৎস্য হ'তে ভেকাদি উভচর জীব ও এই উভচর জীব হ'তে সরীসৃপ জীব ও সরীসৃপ জীব হ'তে স্তন্যপায়ী জীবের সৃষ্টি হয়। এরও বহু যুগ পরে অনুরূপ কারণে কোনও এক স্তন্যপায়ী জীব হ'তে বানরাকৃতি জীবের এবং সেই জীব বিশেষ হ'তে আদিম মানুষের সৃষ্টি হয়। এই বিশেষ মতবাদের প্রমাণ স্বরূপ পণ্ডিতেরা অন্যায় বহুবিধ বিষয়ের সহিত ভ্রূণ-শাস্ত্রের উল্লেখ করেন। মৎস্যাকৃতি জীব হ'তে যে ভেকাদি জীবের উৎপত্তি হয়েছে তার প্রমাণ স্বরূপ তাঁরা বেঙাচির নজির দেখান। বেঙাচি প্রথমে ঠিক মাছের মতই জলে বেড়িয়ে বেড়ায়, পরে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাঙ্গায় উঠে লেজ খসিয়ে বেঙ হয়ে বসে। যে পরিবর্ত্তনটী সমাধিত হ'তে লক্ষ লক্ষ বৎসর লেগেছিল তা এখন মাত্র দু-চার দিনে সম্পাদিত হয়। অনুরূপ ভাবে মানব-শিশুও মাতৃগর্ভে প্রথমে মাছের আকারে জন্মে। কয়েক মাস পরে সেটাকে অনেকটা সরীসৃপ জাতীয় এবং আরও কিছু পরে গরু-বাছুর ও বাঁদরের মাঝামাঝি একটা জানোয়ারের মত দেখায়। তার তখন একটা ছোট লেজও থাকে। পরে কতকটা মানুষের আকৃতি পেয়ে তা একেবারে মানুষ হয়ে বার হয়। এইভাবে সহস্র কোটী বৎসরের পরিবর্ত্তন মাত্র দশ মাসে শেষ হয়। শৈশবে মনুষ্য-শিশুর পায়ের চেটোও হাতের ন্যায় ফ্লেক্সিবল দেখা যায়। হাতের ন্যায় পা দিয়েও তখন সে দ্রব্যাদি ধরতে সক্ষম হয়। বানরাকৃতি কোনও এক জীব থেকে যে মনুষ্যের উদ্ভব হয়েছে মনুষ্যশিশুর উক্তরূপ ব্যবহার তার একটী বিশেষ প্রমাণ।

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মানুষ-শিশুর পা আর ফ্লেক্সিবল থাকে না। ঠিক অনুরূপ কারণেই আধুনিক সভ্য মানুষের শিশুদের, শৈশব অবস্থায় আমরা অপরাধ-মুখী হ'তে দেখি। কারণ আধুনিক সভ্য মানুষ আদিম অসভ্য মানুষের সন্ততি মাত্র। ক্রমিক সভ্যতার মধ্য দিয়ে তারা তাদের আদিম অভ্যাস ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করেছিল, সেইজন্য তাদের শৈশব অবস্থায় তাদের পূর্ব্বপুরুষদের সেই অপরাধ স্পৃহা কিছু কিছু বর্ত্তিয়ে থাকে। পরে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঠিক বেঙাচির লেজ খসানর মতই তারা তাদের সেই আদিম প্রকৃতি ত্যাগ করে।

[তবে দেহের সঙ্গে মনের বা মনোজগতের কিছু প্রভেদ আছে, দেহ পরিবর্ত্তিত হ'লে তা আর সহজে পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরে না, কিন্তু মনকে তার পূর্ব্ব অবস্থায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ফিরান সম্ভব। অতি বৃদ্ধদের দেহ বালকের মত হয় না, কিন্তু সময় বিশেষে মন তাদের বালকের মত হয় বা হ'তে পারে এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। তবে জেনে রাখা উচিত মন সব সময়ই জলবৎ তরলম্। তা যেমন আগাতে পারে, তেমনি পিছাতেও পারে।]

অপরাধ স্পৃহা সম্বন্ধে বলা হ'ল, এবার অপরাধ বিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্। অপরাধীদের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ, কেবলমাত্র প্রকৃত অপরাধীদের উপরই প্রযোজ্য। যে সকল নীরোগ অপরাধী অপরাধকে তাদের একমাত্র জীবিকা বা পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং যে সকল অপরাধীদের অপরাধ একাধারে আদর্শহীন ও পূর্ব্বকল্পিত এবং যে সকল অপরাধীরা তাদের অপরাধের জন্য কোনও অবস্থাতেই অনুতপ্ত হয় না, সঠিক ভাবে তাদেরই আমরা প্রকৃত অপরাধী বলে থাকি। আমরা সাধারণতঃ তিন প্রকার অপরাধী দেখতে পাই, যথা—অভ্যাস, মধ্যম, স্বভাব এবং দৈব (?) এইবার যথাক্রমে আমরা তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করব।

অভ্যাস-অপরাধী

প্রথমে অভ্যাস-অপরাধী সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্। দেহকোষের ⅜ অংশ অপরাধ স্পৃহার বহিঃপ্রকাশ দ্বারা যে সকল অপরাধী অপরাধীতে পরিণত হয়, তাদেরই আমরা অভ্যাস-অপরাধী বলি। এদের এই অপরাধ স্পৃহার বহিঃপ্রকাশ অভ্যাসজনিত হয়ে থাকে, এই জন্যেই এদের অভ্যাস-অপরাধী বলা হয়। পূর্ব্বেই বলেছি, মানুষের আদিম অপরাধ স্পৃহা বাহ্যতঃ পরিত্যক্ত হ'লেও মানব মনের অন্তর্প্রদেশ হ'তে তা আজও সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নি। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে পাপ ও অন্যায়রূপে দুইটী ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে। মনুষ্য সমাজে এই পাপ ও অন্যায়ের প্রাবল্য মানুষের অন্তর্নিহিত অপরাধ স্পৃহার একটী বিশেষ প্রমাণ। জলপাত্র থেকে উপচে পড়া জলের সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। কোনও ভূমিখণ্ডেরও উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড দেখে ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ যেমন বলে দিতে পারেন যে সেই ভূমিখণ্ডের তলায় খনি আছে, তেমনি মনুষ্য সমাজে এই অন্যায় ও পাপের প্রাবল্য দেখে আমরাও জানতে পারি যে মানুষ মাত্রেরই মন অপরাধপ্রবণ। প্রত্যেক মানুষেরই মনে অপরাধ স্পৃহা অল্পবিস্তর বিদ্যমান। আদিম যুগের মনোবৃত্তি সকল মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু রয়ে গেছে। কারও মধ্যে কম, কারও মধ্যে বা বেশী। শিষ্টতার প্রাচুর্য্য ও সাহসের অভাব সহজ মানুষকে এরূপ ইচ্ছা থেকে রক্ষা করে মাত্র। কখন যে দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে কার মধ্যে এই ইচ্ছা প্রকাশ পাবে তা কেউ বলতে পারে না। নীচের স্বীকার উক্তি থেকে সেইরূপ সত্য প্রতীয়মান হবে।

"আমি বিনা ধূমপানে বহু দূর চলে এলাম। হঠাৎ এক জায়গায় দেখলাম, লেখা আছে ধূমপান নিষিদ্ধ। হঠাৎ জেগে উঠল আমার আদিম অপরাধ স্পৃহা; বহু চেষ্টায়ও আমি ঠিক থাকতে পারি নি। কেন জানি না ঐ জায়গায় দাঁড়িয়েই ধূমপান করবার একটী দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা আমাকে পেয়ে বসল।"

উপরিউক্ত কাহিনী থেকে আমরা বুঝতে পারি কোন মানুষই আদিম বৃত্তি একেবারে ভুলে নি। সকলের মধ্যেই অপরাধ-সুলভ মনোবৃত্তি সুপ্ত অবস্থায় আছে। যে কোনও দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তা আত্মপ্রকাশ করতে পারে। কুসঙ্গ, লোভ, ক্রোধ, হিংসা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা পারিপার্শ্বিক বা সামাজিক অসমতা, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি দোষ মানুষের এই মনোবৃত্তির আত্ম-প্রকাশের সহায়ক হয়। যে কোনও সৎলোক মনের দুর্ব্বলতাজনিত বা কুসঙ্গে পড়ে অপরাধী পর্য্যায়ভুক্ত হ'তে পারে। কি ভাবে তা সম্ভব হয়, তা নীচের একটী স্বীকারোক্তি থেকে বুঝা যাবে।

"একটা দোকানে জিনিস কিনতে এসে দোকানীর অজ্ঞাতেই কিছু সূতা তুলে জিনিসটী আমি বেঁধে নি। তুচ্ছ জিনিস বিশ্বাসে দোকানীর অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন মনে করি নি। কিন্তু সূতা নেয়ার ব্যাপারে দোকানী লক্ষ্য করতে পারে নি দেখে, আমি কি জানি কেন বেশ একটু আত্মতৃপ্তি লাভ করলাম। আমার মধ্যেকার সুপ্ত অপরাধ-বৃত্তি যেন জাগ্রত হয়ে উঠেছে। পরদিন দোকানে আসামাত্র আমার মন আবার অপরাধ-মুখী হয়ে উঠে। দোকান থেকে একটা জিনিস উঠিয়ে নিয়ে দাম দেবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকি। অন্যান্য খরিদ্দারদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দোকানী আমার লক্ষ্য করে নি। হঠাৎ কি মনে হ'ল জানি না আমি দাম না দিয়েই সরে পড়ি। এমনি ভাবে লোভ বেড়ে যায়। পরে অন্য দোকানেও গিয়েছি। কুসঙ্গও জোটে, পরামর্শেরও অভাব নেই।

কোকেন খেতে শিখি। শেষে এক দিন ধরা পড়ি! একবার, দুবার, তিনবার, বহুবার জেল খেটেছি। কয়েক বৎসরের ব্যবধান। আমি একজন দাগী চোর।"

এই হচ্ছে মানব মনের সত্যকার অবস্থা। আইনের ভয়, শিক্ষা ও পুরুষানুক্রম সংস্কার প্রভৃতি মানুষের এই স্বভাব-সুলভ অপরাধ স্পৃহাকে সংযত রাখে মাত্র। ভয় বলতে এখানে আইনের ভয়ের ন্যায়, ধর্ম্মের ভয়ও বুঝায়। কেউ ভয় করে ইহলোকের শাস্তিকে, কারও বা সংস্কারবদ্ধ মন ভয় করে পরলোকের শাস্তিকে। এই উভয়বিধ ভয়ই ইচ্ছা সত্ত্বেও মানুষকে অনেক দুষ্কার্য্য থেকে বিরত রাখে। এই ভয় ও সংস্কার মানব মনের চেতন এবং অবচেতন উভয় স্তরেই বিদ্যমান। ভয়, সংস্কার ও শিক্ষাকে আমরা খনির উপকার শক্ত মাটির সঙ্গে তুলনা করতে পারি। উপরকার এই কঠিন ভূস্তরের জন্য যেমন আমরা নিম্নের খনির অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতে পারি না, তেমনি শিক্ষা সংস্কার ও ভয়ের জন্য আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত অপরাধপ্রবণতা সকল সময় অনুভব করি না। এই শিক্ষা সংস্কার ও ভয়ের গভীরতা স্বল্প হলে, মানুষের মন কম বেশী অপরাধ-প্রবণ হয়। এক কথায়, শিক্ষা, সংস্কার ও ভয় বেশী থাকলে, অপরাধ স্পৃহা অন্তর্মুখী হয় অর্থাৎ সুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অন্য দিকে শিক্ষা সংস্কার ও ভয় কম থাকলে বা বিপরীত শিক্ষা ও সংস্কার প্রবল হ'লে বা ভয় অপসারিত হলে, এই অপরাধ বা অপরাধ স্পৃহা বহির্মুখী হয় অর্থাৎ জাগ্রত হয়। অপরাধ স্পৃহার বহির্মুখী হওয়ার প্রথম বাধা হচ্ছে মানুষের জন্মগত সংস্কার; পুরুষানুক্রমে সৎ থাকার পর হঠাৎ অসৎ হওয়ার পথে এটা একটা মস্ত বাধা, দ্বিতীয় বাধা হচ্ছে শিক্ষা ও দীক্ষা। সৎ বংশের ছেলেদের পক্ষে এই দ্বিতীয় বাধা প্রথম বাধাকে আরও শক্ত করে। ভয় হচ্ছে তৃতীয় বাধা, এই ভয় প্রথম ও দ্বিতীয়

বাধাকে আরও শক্ত করে। আইনের সার্থকতা এইখানেই। এই ভয়, শিক্ষা * ও সংস্কার স্ব স্ব উপস্থিতি ও ক্ষমতা অনুযায়ী মানুষের, এই স্বভাব-সুলভ অপরাধ স্পৃহাকে সংযত করে বলেই আমার বিশ্বাস। মানুষের এই "সংযত" করার ক্ষমতাকেই বলা হয় প্রতিরোধ শক্তি বা পাওয়ার অব রেজিস্টেন্স্। মানুষের এই অপরাধ-প্রবণতা 'ভলকানিক' পদার্থের ন্যায় মানুষের শিক্ষা ও সংস্কারের পাথর ফুঁড়ে বাইরে আসতে চায় কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কারের প্রাবল্য তখন তাদের এই অপরাধ স্পৃহাকে দাবিয়ে রাখে। খনির উপরকার মৃত্তিকা-স্তর না সরালে যেমন খনিজ দ্রব্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। তেমনি শিক্ষা ও সংস্কারের বাঁধ না ভাঙ্গলে অপরাধ-প্রবণতার স্বরূপ বুঝা যায় না। খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের জন্য প্রচুর সময় ও যন্ত্রপাতিরও প্রয়োজন হয়। ঠিক এইরূপেই সৎ বংশের ধর্ম্মভীরু কোনও ব্যক্তির ভিতরকার অপরাধ স্পৃহা জাগ্রত করতে হলেও কিছু সময় ও কার্য্যকারণের প্রয়োজন হয়। মানুষের লোভ ও অভাব বা প্রয়োজনকে উক্তরূপ যন্ত্রপাতির সঙ্গে, মানুষের সংস্কার শিক্ষা ও ভয়কে খনির উপরকার মৃত্তিকা-স্তরের সঙ্গে এবং খনিগর্ভস্থ খনিজ দ্রব্যের সঙ্গে অপরাধ স্পৃহার তুলনা করা চলে। যন্ত্রপাতির সাহায্যে যেমন ধীরে ধীরে, মৃত্তিকা স্তর অপসরণ করে খনিজ দ্রব্যাদি উত্তোলন করা হয়, ঠিক তেমনি লোভ

---

* শিক্ষা বলতে এখানে আমরা নৈতিক শিক্ষাই বুঝব। শিক্ষা তিন প্রকারের হয়ে থাকে :—দৈহিক, নৈতিক ও বুদ্ধিগত। দৈহিক ও বুদ্ধিগত শিক্ষা বরং অনেক সময় অপরাধীদের অপরাধ প্রণালীর সহায়ক হয়। একমাত্র নৈতিক শিক্ষাই মানুষের অপরাধ স্পৃহার হ্রাস করণে সক্ষম হয়। দৈহিক বা বুদ্ধিগত শিক্ষা এই বিষয়ে একেবারেই কার্য্যকরী হয় না। যে ব্যক্তির টপকা ঠগী হবার কথা তাকে যদি নৈতিক শিক্ষা না দিয়ে কেবলমাত্র বুদ্ধিগত শিক্ষা দেওয়া হয় ত সে হবে ব্যাঙ্ক-সুইণ্ডলার কিন্তু সাধু হবে না।

ও অভাবের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে মানুষের শিক্ষা সংস্কার ও ভয় দূরীভূত হয় এবং অপরাধ স্পৃহার আবির্ভাব ঘটে। এই লোভ অভাব ও কুসঙ্গ তাদের স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী আঘাত হেনে মানুষের শিক্ষা সংস্কার ও ভয়কে অপসারিত করে তার অন্তর্নিহিত অপরাধ স্পৃহাকে যে কোনও



মুহূর্তে বহির্মুখী করতে পারে। এই অপরাধ স্পৃহার বহিঃপ্রকাশ মানুষের শিক্ষা, সংস্কার ও ভয়রূপ প্রস্তরের কাঠিন্য বা প্রাবল্যের উপর নির্ভর করে।

পূর্ব্বেই বলেছি, এরূপ বিপর্য্যয় একদিনে সাধিত হয় না। আমরা এমন অনেক বিশ্বাসী দারোয়ান দেখেছি, যে লাখ দুই তিন টাকা নিরাপদে

গত বিশ ত্রিশ বছর ধরে ব্যাঙ্কে পৌছে দিয়েছে, কখনও বিশ্বাস ভঙ্গ করে নি। কিন্তু যখন সে পালাল মাত্র হাজার দুই টাকা নিয়েই পালাল। ব্যাঙ্কের বিশ্বাসী ট্রেজারার ব্যাঙ্কের উন্নতির জন্য চেষ্টার তার ত্রুটী নেই। হঠাৎ একদিন শোনা গেল সে বিশ হাজার টাকার তহবিল তছরূপ করেছে। সাধারণতঃ আমরা এই সব বিশ্বাসী বন্ধুদের কাণ্ড-কারখানা দেখে অবাক হই। এরূপ ঘটনা কিরূপ অবস্থায় ঘটে, তা নিম্নের বিবৃতি-মূলক দৃষ্টান্তটী থেকে কিছুটা বুঝা যায়।

"তোমার কাছে ভাই কোনও কথাই গোপন করব না। তোমরা জানতে আমি একজন নামজাদা সওদাগরী অফিসের বড় সাহেবের পেটোয়া ও মোটা মাইনের হেডক্লার্ক। কিন্তু আমার সংসারের জন্য প্রতি মাসে কত খরচ হ'ত, তার হিসাব তোমরা রাখ নি। চাঁদার খাতা নিয়ে যখনই এসেছ, নিয়ে গেছ একটা মোটা অঙ্ক। বন্ধু বান্ধবকে ধার দিয়ে ও দান করে আমি ফতুর হয়েছি, কিন্তু কাউকে কখনও বিমুখ করি নি। পরিচিতদের কাছে মান ও প্রতিপত্তি বজায় রাখবার জন্য দেনাও করেছি অনেক। তাগাদার জ্বালায় অস্থির হয়ে একদিন ভাবলাম অফিসের ক্যাস থেকে কিছু নিয়ে দেনার টাকাটা মিটিয়ে দি। কথাটা কিন্তু মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি চমকে উঠি। ভাবি, তাও কি কখনও হয়, এর চেয়ে আত্মহত্যা করা ভাল। এই রকম একটা কুকাজ করা উচিত কিনা, ধরা না পড়ে কাজ হাসিল করা সম্ভব কিনা, অভাবের তাড়নায় প্রায়ই আমি জল্পনা কল্পনা করতাম নিজের মনেই। পরক্ষণেই কিন্তু আমার মনে এরূপ চিন্তার জন্য ধিক্কার আসত। 'মানুষের নাম মহাশয়, যা সওয়ান যায় তাই সয়।' কিছুদিন পরে দেখলাম এরূপ কল্পনা আমার কাছে বেশ সহজ হয়ে উঠেছে, এরূপ চিন্তার মধ্যে যেন আর গ্লানি নেই প্রায় শুনি ও পড়ি, অমুক ব্যক্তি অমুক জায়গা থেকে দুলাখ মেরে

বেশ আছে। আইন আদালত তার কিছুই করতে পারে নি। এমনি ভাবে এমনি করে, এই এই করলে ধরা নাও পড়তে পারি। কোম্পানীর অনেক টাকা আছে, কি আর এমন তাদের ক্ষতি হবে। দুৎ, শালারা গরীব মেরে পয়সা করে। আমিও ত গরীব, দিন রাত খাটিয়ে নেয়। কতই বা মাইনে দেয় আমাকে। এরূপ পরামর্শ পূর্ব্বে কেউ আমাকে দিলে তাকে আমি মেরে বসতাম। পরে কিন্তু এরূপ পরামর্শের জন্যই আমার মন পাগল হয়ে থাকে। একদিন এক ধনী ও সুখী পরিবার সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। তাঁদের পূর্ব্বপুরুষ নাকি তহবিল তছরূপ করে বড়লোক হন। হাজার হাজার লোক তাঁকে সম্মান করত। দান-ধ্যান ছিলও তাঁর বিস্তর। পূর্ব্ব থেকেই জমী প্রস্তুত ছিল। বহুদিন ধরে যা আমি কল্পনা করেছি, আমার মন তাকে সেদিন রূপ দিতে চাইল। এদিকে আর্থিক অবস্থা আমার মন্দ থেকে আরও মন্দ হয়ে উঠেছে। একদিন চাপও পড়ল খুব বেশী। কিছু টাকা সেদিনই চাই। কপালগুণে সুযোগ হ'ল, সেইদিনই সব চেয়ে বেশী। কি ভাবে কাজ হাসিল করতে হবে পূর্ব্ব হতেই তা আমার ভাবা ছিল। কিছু মাত্র অসুবিধা হ'ল না। স্তূপীকৃত বারুদ যেন একটা দেশলাইয়ের কাঠির অপেক্ষায় ছিল। আমি তহবিল তছরূপ করে বসলাম। নিশ্চয় শুনেছ আমার আট মাস জেল হয়েছে। বউ ও বাচ্ছা ছেলেটাকে গাঁয়ে পাঠিয়েছি। একটু দেখ তাদের ভাই। তারা যেন কষ্ট না পায়।"

ধর্ম্মঘটজনিত অপরাধসমূহও এরূপ চিত্ত প্রস্তুতির প্রত্যক্ষ ফল। শান্তিপূর্ণভাবে শ্রমিকেরা কাজ করে চলেছে। হঠাৎ তারা একজোটে কর্ম্মত্যাগ করে ম্যানেজারকে নিহত করে। ঘটনাটী বাহ্যতঃ একদিন সংঘটীত হলেও অপরাধীদের গণ-চিত্ত এর জন্য বহুদিন ধরে প্রস্তুত হয়েছে। অভাব ও অত্যাচার জনিত আক্রোশ বহুদিন ধরে তাহাদের চিত্ত মধ্যে

সঞ্চিত হচ্ছিল। বারুদের স্তূপ চাইছে অগ্নি-সংযোগ। এই সময় কোনও নেতা এসে তাদের উত্তেজিত করলে তারা একদিনেই অপরাধ-মুখী হয়ে উঠবে।

অনেকের বিশ্বাস যারা পুনঃ পুনঃ অপরাধ করে তাদেরই অভ্যাস-অপরাধী বলা হয়। কিন্তু তা সত্য নয়। যারা একবার অপরাধ করে, কিন্তু এই অপরাধটার জন্য চিত্তকে বহুদিন থেকে প্রস্তুত করে, তাদেরও অভ্যাস-অপরাধী বলা হয়।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক অসমতা প্রভৃতিও অনেক সময় অপরাধ স্পৃহা বহির্বিকাশের সহায়ক হয়। কোনও কোনও ব্যক্তি অফুরন্ত কর্ম্মশক্তি ও প্রতিভা নিয়ে বেঁচে থাকে, কিন্তু তার সেই কর্ম্মশক্তি ও প্রতিভার বিকাশের কোনও উপযুক্ত ক্ষেত্র সে পায় না। সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক কারণে সৎ উপায়ে সে বড় হ'তে বা নাম অর্জ্জন করতে না পেরে সে তখন অসৎ উপায়ের সাহায্য নেয়। অনেককে আবার একটা সস্তা ও সাময়িক নামের আকাঙ্ক্ষাও পেয়ে বসে। তারা তখন সুবিধামত রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক বা অর্থ-নৈতিক দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত হয়। এদের ভিতর কোনও বিশেষ আদর্শ থাকে না, থাকে শুধু নামের আকাঙ্ক্ষা, এমন অনেক ভাল লোককেও আমি জানি যারা এই সব অপকার্য্যে লিপ্ত হয়েছে কেবলমাত্র খবরের কাগজে তাদের নাম বার হওয়ার জন্যে। অনেককে আবার সৎ উপায়ে কার্য্য আরম্ভ ক'রে পরে অকৃতকার্য্য হওয়ার জন্যে, অসৎ উপায় গ্রহণ করতেও দেখা গেছে। এই একই কারণে দেশের অনেক বরেণ্য ব্যক্তিও রাজনৈতিক মতবাদের "আনএক্সপ্লয়টেড" ক্ষেত্রগুলি বিবেকের বিরুদ্ধেও বেছে নেন্ কেবলমাত্র সহজ উপায়ে নাম অর্জ্জনের জন্য, কিন্তু সুবিখ্যাত বা কুবিখ্যাত হওয়ার পর সুবিধামত এঁরাই আবার পরে নিজেদের আকাঙ্ক্ষিত মতবাদে ফিরে

আসেন। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার ন্যায় অর্থ-নৈতিক অসমতাও মানুষকে অপরাধী করে তুলে। যুদ্ধের সময় দেশে অর্থ-নৈতিক অসমতা প্রকটরূপে দেখা দেয়। পূর্ব্বেকার ধনী লোক হয়ে যায় দীন দরিদ্র এবং পূর্ব্বেকার দীন দরিদ্রেরা হয়ে উঠে ধনী। সকলেই লক্ষ্য করে টাকা উড়ছে ধরে নিলেই হয়। একজন তার অনেষ্টি বা সাধুতার বোঝা নিয়ে অনাহারে মরেন, অন্যজন তারই পাশের টেবিলে উৎকোচ গ্রহণ দ্বারা লাভ করেন আর্থিক স্বচ্ছলতা। যুদ্ধকালীন সুযোগ, সুবিধা ও অর্থ-নৈতিক অসমতা, মানুষের সুপ্ত অপরাধ স্পৃহাকে বহির্ম্মুখী বা জাগ্রত করে অনেক সাধুলোককেও অপরাধীতে পরিণত করে, এই বিশেষ মনোবৃত্তিকে বলা হয় যুদ্ধকালীন মনোবৃত্তি। এই জন্য যুদ্ধের সময় অনেক নূতন নূতন আইনের প্রয়োজন হয়, এই সব গণ-অপরাধ দমন করার জন্যে।

কুসঙ্গ, লোভ, অভাব, প্রতিশোধ-স্পৃহা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থা উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির ন্যায় ঔষধাদি দ্বারাও মানুষের অন্তর্নিহিত অপরাধ স্পৃহার বিকাশ সাধন হয়। কোকেন এক প্রকার ঔষধ। নিয়মিত কোকেন প্রয়োগ দ্বারা যে কোন সহজ মানুষকে অপরাধীতে পরিণত করা যায়। মানুষের অপরাধ স্পৃহা স্নায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোকেন প্রভৃতি ঔষধ স্নায়ুর উপর ক্রিয়া করে। কারও কারও মতে কোকেন দেহাভ্যন্তরস্থ রসপিণ্ডগুলিকে উত্তেজিত করে। ফলে রস-পিণ্ডগুলি হতে রস নির্গত হয়। এই রস স্নায়ুগুলিকে প্রভাবান্বিত করে। কারণ যাই হোক কোকেন প্রভৃতি ঔষধ মানুষকে অপরাধ-প্রবণ করে। এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। প্রায় দেখা যায়, পুরান চোরেরা ছোট ছোট ছেলেদের পানের সঙ্গে কোকেন খাওয়ায়। এই ভাবে তারা তাদের অপরাধ স্পৃহা জাগ্রত করে দলের জন্য ছেলে সংগ্রহ করে। * বে আইনী

* এতদ্ব্যতীত দুর্দ্দমনীয় নেশার কারণে বারে বারে এই সকল বালক দলপতিদের সাহচর্য্য কামনা করে।

কোকেন চালুর সঙ্গে স্থান বিশেষে চৌর্য্য আদি অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি এর একটী বিশেষ প্রমাণ। এই কোকেন ছেলেদের চোর এবং মেয়েদের বেশ্যায় পরিণত করে। কলকাতায় এমন অনেক সংগ্রাহিকা আছে, যারা নানা অছিলায় ভদ্রপরিবারে মেলামেশা করে এবং সুন্দরী কন্যা বিশেষকে বেছে নিয়ে পানের সঙ্গে তাকে কোকেন খাওয়ায়। এই ভাবে ধীরে ধীরে মেয়েদের মধ্যে নির্ব্বিচারে যৌন স্পৃহার আবির্ভাব ঘটিয়ে সংগ্রাহিকা আপন উদ্দেশ্য হাসিল করে। হঠাৎ মেয়েটীকে সংগ্রাহিকার অনুরক্ত * হ'তে দেখে বাটীর সকলে অবাক হয়, কিন্তু সময়ে সাবধান হয় না। কোকেন আদি ঔষধ যেমন সরল-চৌর্য্য আদি অপরাধের সহায়ক হয়, তেমনি মাদক আদি ঔষধ সহায়ক হয় খুন জখম আদি অপরাধ সমূহের। প্রথমোক্ত অপরাধসমূহকে বলা হয় নিষ্ক্রীয় (উইদাউট ভায়লন্স) অপরাধ ও শেষোক্ত অপরাধ সমূহকে বলা হয় সক্রীয় (উইথ ভায়লন্স) অপরাধ। মাদক দ্রব্যের সমধিক প্রচলনের সঙ্গে শেষোক্ত অপরাধের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয় বলে মনে হয়। তবে কোকেন আদির ন্যায় মাদক আদি সম্বন্ধে জোর করে কোনও কথা বলতে আমি অক্ষম। কারণ এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও অনুসন্ধান হয় নি। অনেকের মতে মাদক দ্রব্য মানুষের সহজাত অপরাধ স্পৃহার দমনেচ্ছার বিলোপ ঘটায় এবং এজন্য অনেকে অপরাধ করবার পূর্ব্বে মদ খায়।

ঔষধাদির ন্যায় সাজেস্‌সন বা বাক্‌-প্রয়োগ দ্বারাও মানুষকে অপরাধী করে তুলতে পারে। পূর্ব্বেই বলেছি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কম বেশী সুপ্ত অপরাধ স্পৃহা বর্ত্তমান। যার মধ্যে যত বেশী পরিমাণ অপরাধ স্পৃহা আছে তাকে শীঘ্র ও তত সহজে অপরাধী করা যায়। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটী প্রাণিধান যোগ্য।

* ইহা কি কেবল মাত্র নেশার খাতিরে বা কারণে? আমার মতে অন্য কারণও আছে।

"আমি একটী নামজাদা অফিসের ষ্টোর-কিপার (ভাণ্ডার-রক্ষক)। ওপরওয়ালাদের আমার উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। সব কিছুই তারা আমার উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। হঠাৎ একদিন এক ভদ্রলোক একটা তাসের মজলিসে আমার সঙ্গে আলাপ জমাল। ধীরে ধীরে সে আমার বন্ধু হয়ে উঠল। ভদ্রলোক বাজারে দালালি করত, সে প্রায়ই ব্লাক-মার্কেট বা চোরা-বাজার সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলাপ করত, এই সব চোরা-কারবার থেকে কত গরীব কি ভাবে কত কম সময়ের মধ্যে ধনী হ'তে পেরেছে, সে সম্বন্ধে অনেক চমকপ্রদ গল্প সে আমায় শোনাত। প্রথম প্রথম এই সব ভদ্র-বেশী গৃহস্থ চোরদের উপর আমার ঘৃণাই আসত। একদিন কথায় কথায় আমি জিজ্ঞাসা করি—'আচ্ছা এই সব মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য জিনিষ চোরা-হাটায় আসে কি করে?' উত্তরে ভদ্রলোক জানাল, "কেন? আপনার মতই কর্ম্মচারীরা বড় বড় কোম্পানীর গুদাম থেকে মাল পাচার করে আমাদের দেয়।" এর পর সে আমায় প্রায়ই বড়লোক হবার লোভ দেখাত। কিন্তু আমি সব সময়ই তার এই সব কু-প্রস্তাব সকল প্রত্যাখ্যান করতাম, বেশ মনে পড়ে এগারো বার তার এই কু-প্রস্তাব সকল প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। কিন্তু বারো বারের বার আমার মনটা যেন কেমন উতলা হয়ে উঠল। ঠিক এই সময় ভদ্রলোক আমায় নানারূপ প্রলোভন দেখাতে লাগল। সে আমায় বোঝালে, বড়লোকদের সামান্য কয়েকটা জিনিষ অপহরণ করলে তাদের কোনও ক্ষতি হয়ই না, এমন কি এতে কোনও দোষও বর্ত্তায় না। ধীরে ধীরে আমি তার কথাগুলি বিশ্বাস করতে সুরু করলাম। একদিন তার কথায় রাজীও হয়ে গেলাম। তখনও পর্য্যন্ত আমি জানতাম না ভদ্রলোক কোম্পানীরই নিযুক্ত একজন গোয়েন্দা বা গুপ্তচর। কোম্পানী তাকে চুরি বন্ধ করবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।

পয়সার লোভে তিনি আমাকে দিয়েই জিনিস বার করিয়ে কোম্পানীর নিযুক্ত জাল ক্রেতাকে সেই জিনিসগুলি আমাকে দিয়েই বিক্রী করান। বড় সাহেব দূরে অপেক্ষা করছিলেন। তা ছাড়া নোটে মার্কা দেওয়াও ছিল। হাঁ, বলি শুনুন। এরপর আমি ধরা পড়ি এবং আমার জেল হয়।" এইভাবে এজেণ্ট প্রপোগেটার বা প্রলুব্ধকারী চর দ্বারা, অসুস্থমনা অপরাধ-মুখী মানুষকে ত অপরাধী করা যায়ই, এমন কি, সুস্থ সহজ, সাধুপ্রকৃতির মানুষকেও এইভাবে অপরাধীতে পরিণত করা সম্ভব। বাক্-প্রয়োগ বা সাজেস্‌সনের ক্ষমতা যে কত অসীম তা মনোবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত মাত্রেরই জানা আছে। পুনঃ পুনঃ সাজেস্‌সন দ্বারা সাধুকেও চোর করা যায়। মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত অপরাধ স্পৃহাই মানুষের এরূপ অবস্থার জন্য দায়ী। উক্তরূপ পরীক্ষা দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত অপরাধ স্পৃহার অবস্থিতি প্রমাণিত হয়।

এই সাজেস্‌সন বা বাক্-প্রয়োগ দেশের সাহিত্য ও আলোক-চিত্রের মধ্য দিয়েও প্রকাশ পায় এবং তারা স্ব স্ব ক্ষমতা অনুযায়ী মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক অপঃস্পৃহার বহির্বিকাশের সহায়ক হয়। এই জন্য সৎ-সাহিত্য পাঠে মানুষ সৎ এবং অসৎ-সাহিত্য পাঠে মানুষ অসৎ হয়ে থাকে। আলোক-চিত্র (সিনেমা) হ'তে অনুপ্রেরিত হয়ে চিত্র-প্রদর্শিত পন্থা অনুযায়ী বহু বালক ও যুবককে অপরাধীতে পরিণত হওয়ার দৃষ্টান্ত কোনও দেশে বিরল নয়। এ সম্বন্ধে এ দেশের আধুনিক সাহিত্যের নমুনা স্বরূপ কয়েকটী চোখা চোখা বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করলাম, যথা—(১) আচ্ছা ভাই, নারী কি চায়? আমার মতে নারী চায় পুরুষ তার দেহ ও মনের উপর ডাকাতি করুক। (২) সতীত্ব একটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়; তা ছাড়া জানতে পারলেই দোষ, না জানলেই দোষ নেই। (৩) পাপ পুণ্য মনের বিকার, দেয়ার ইজ নাথিং গুড্

অর ব্যাড্ ইন্ দিস্ ওয়ার্লড বাট্ থিংকিং মেকস্ ইট্ সো। (৪) লাইফ ইজ এ মেকানিকেল ষ্টপেজ অফ হার্ট। এ পারেও কিছু নেই, ওপারেও না। পরলোক বা পাপের ভয় জুজুর ভয়েরই নামান্তর মাত্র। খাও দাও স্ফূর্ত্তি করো, আত্মাকে কষ্ট দিও না। মন যা চায় তাই তাকে দেওয়া উচিত। (৫) মেয়েদের বুক ফাটে ত মুখ ফুটে না। তুই যেমন বোকা, ও সবই কৃত্রিম ক্রোধ। সাহস করে এগো, কোনও আপত্তিই করবে না, চেঁচাবে ত না-ই। (৬) আমি ভাই লাইফের ইঞ্চি বাই ইঞ্চি ভোগ করেছি, মন যা চেয়েছে, তাই তাকে দিয়েছি। মরতে আমি ভয় করি না, কারণ আমার মনে কোনও ক্ষোভ নেই, কিন্তু তুই যখন মরবি, তখন তুই গুমরে গুমরে মরবি, মনে হবে কি'না করতে পারতাম, কিন্তু কিছুই করলাম না। (৭) যে ঘুষ নেয় না সে বোকা, কারণ সে জানে না কি করে ধরা না পড়ে ঘুষ নিতে হয়—ইত্যাদি।

উপরিউক্ত বাক্য সকল সাজেস্‌সন বা বাক্-প্রয়োগের দ্বারা একদিক থেকে যেমন মানুষের শিষ্টতার প্রাচুর্য্য নষ্ট করে, অন্যদিক থেকে তেমনি তার স্বাভাবিক ভয় ও ভাবনাকে অপসারিত ক'রে তার অপঃস্পৃহার বহির্বিকাশের সহায়ক হয়।

এ সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্ব্বেকার একটী বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কোনও এক শিক্ষিত অবাঙ্গালী ভদ্রলোক কোনও এক বাঙ্গালী বধূকে একা পেয়ে, হঠাৎ তাঁর উপর একটী নীতি-গর্হিত কার্য্য করে বসেন, কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন। এদিকে বধূটীও মানা সত্বেও চেঁচিয়ে উঠেন এবং আত্মীয়দের কাছে নালিশ জানান। এ সম্বন্ধে আমি সেই অবাঙ্গালী ভদ্রলোককে জিজ্ঞেসা করি, "আচ্ছা, আপনি কি সাহসে এরূপ কাজে এগিয়ে গেলেন?" উত্তরে ভদ্রলোক জানান, "দেখুন, আমি আমার প্রদেশের বকা ছেলেদের

কাছ থেকে ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছি, বাঙ্গালী মেয়েদের উপর সুবিধামত অসৎ ব্যবহার করলে, ভয়ে ও লজ্জায় সেই কথা, ইচ্ছা সত্ত্বেও, তারা কাউকে বলে না। আজ জেনেছি আমার এ ধারণা একেবারে ভুল।"

এই বিশেষ স্থলে আশৈশব সাজেস্‌সন দ্বারা ভদ্রলোকের স্বাভাবিক ভয় অপসারণের জন্যই, ভদ্রলোক উক্তরূপ অপকার্য্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই সব বাক্-প্রয়োগের ক্ষমতা যে কত অধিক তা আমরা জনসভা বিশেষে গমন করলেই বুঝতে পারি। আমরা প্রায়ই দেখি সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা সকল শ্রোতৃগণকে সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন এবং অসাম্প্রদায়িক বক্তৃতা মানুষকে অসাম্প্রদায়িক করে থাকে। দেশের সংবাদপত্র সকল ও দেশের সাহিত্য দেশবাসীর চরিত্র গঠন সম্বন্ধে যে বহুলাংশে দায়ী তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। এই সব সংবাদপত্র, সাহিত্য ও আলোক-চিত্র গণ-বাক্-প্রয়োগের কাজ করে, এজন্য রাষ্ট্র বা ষ্টেট্ দেশের সংবাদপত্র, সাহিত্য ও আলোক-চিত্র প্রয়োজন বোধে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

গণ-বাক্-প্রয়োগ বা মাস সাজেস্‌সন মানুষের অন্তর্নিহিত আদিম স্পৃহার অপর এক প্রমাণ। মানুষের মন সর্ব্বদাই বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী নয়, মানুষ যা কিছু শোনে মানুষের মন তা সব সময়ই বিশ্বাস করতে চায়, কিন্তু তা তার অবচেতন মন বিশ্বাস করলেও তার চেতন মন বিচার বুদ্ধি বা যুক্তি তর্ক দ্বারা কোনওটা করে বিশ্বাস, কোনওটা বা করে অবিশ্বাস, জনসভায় বহুলোক একত্রিত হয়ে যখন আলোচনা করে, তখন তারা প্রায়ই একজন অন্য জনের কথা শোনামাত্রই বিশ্বাস করে এবং তাদের মনও তখন সেই ভাবে কাজ করতে চায়। তারা পরস্পর পরস্পরকে গণ-বাক্-প্রয়োগ বা মাস সাজেস্‌সন দ্বারা ক্ষিপ্ত করে তুলে এবং তারা তখন পশুর মতই বিচারবুদ্ধিহীন ও নিষ্ঠুর হয়ে অভাবনীয় ভাবে অপরাধ মূলক কার্য্য করে। এই কারণে সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক উত্তেজনার

সময় জনসভা আহ্বান নিষিদ্ধ হয়ে থাকে। গণ-বাক্-প্রয়োগ দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত অপরাধ স্পৃহার উন্মেষ যে অতি সহজে ঘটে তা শান্তিরক্ষক মাত্রেই অবগত আছে, যে অকাজ মানুষ একা বা দশজনে মিলে করে না, সেই কাজ তারা শত জন মিলে সহজেই করে ফেলে, কারণ তখন তারা বিবেক-বিবর্জ্জিত ও পশুসুলভ প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না, মানুষ তখন হয়ে উঠে পশুরও অধম মানুষের অন্তর্নিহিত পশু-প্রবৃত্তির ইহা একটী বিশেষ প্রমাণ।

এমন অনেক ঔষধ আছে যা মানুষের মধ্যে জাগৃ-ঘুম বা ইনসম্বোলিসম্-এর ন্যায় রোগেরও আবির্ভাব ঘটাতে পারে। কারও কারও মতে এই সব ঔষধ বা আরক সোজাসুজি স্নায়ু-শক্তির হ্রাস ঘটিয়ে বা মানুষের সুপ্ত অপরাধ স্পৃহাকে জাগ্রত করে মানুষকে অপরাধী করে। কারও কারও মতে আবার এই সব ঔষধ দেহাভ্যন্তরের বিশেষ বিশেষ রস-পিণ্ড বা গ্লাণ্ডকে উত্তেজিত করে, ফলে রসপিণ্ডগুলি থেকে একপ্রকার রস নির্গত হয় এবং সেই রস মানুষের প্রতিরোধশক্তির বিনাশ ঘটায় বা তাদের সুপ্ত অপরাধ স্পৃহাকে জাগ্রত করে। যে ভাবেই হোক, এই সব ঔষধ যে মানুষকে অপরাধ-মুখী করে তুলে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এজন্য অভ্যাস-অপরাধীদের জীবন-বৃত্তান্ত আলেচনা করলে দেখা যায় তাদের অনেকেই প্রথমে নেশাভাঙ করে অলস ভাবে ঘোরা-ফেরা করেছে এবং পরে কুসংস্পর্শে মিশে তারা চোর হয়েছে। ঔষধাদি দ্বারা মানুষের স্নায়ু দুর্ব্বল করা যায়, উপরন্তু, পরে বাক্-প্রয়োগ বা সাজেস্সন দিলে মানুষকে আরও সহজে অপরাধী করা যায় বলে আমি বিশ্বাস করি।

প্রাথমিক অবস্থায় অভ্যাস-অপরাধীরা অপরাধকে অপরাধ বলে বুঝতে

পারে। মাঝে মাঝে তাদের অনুতাপও আসে, কিন্তু তবুও তারা অপরাধ করে। তারা তখন অভ্যাসের দাস হয়ে পড়েছে। অভ্যাস-বেশ্যাদের ন্যায়ই তখন তারা নিরুপায়। এইজন্য প্রাথমিক অবস্থায় অপরাধীদের প্রকৃত অভ্যাস-অপরাধী বলা উচিত নয়। বরং তাদের দৈব-অপরাধীর পর্য্যায়ভুক্ত করলেও করা যেতে পারে। শেষের দিকে কিন্তু তারা অনেকটা স্বভাব-অপরাধীর মত হয়ে উঠে। তখন আর তাদের অনুতাপ আসে না। তারা হয়ে উঠে মানব-দানব। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে অপরাধ-বিরাম বা লুসিড্ ইনটারভ্যাল দেখা যায়। অল্প সময়ের জন্য তারা তখন সহজ মানুষ হয়, তাদের জ্ঞান ফিরে আসে, তারা অনুতপ্তও হয়। এই লুসিড্ ইনটারভ্যাল স্বভাব-অপরাধীদের মধ্যে থাকে না বা কম থাকে। অভ্যাস-অপরাধীদের মধ্যে কিন্তু এই অপরাধ-বিরাম প্রায়ই দেখা যায়। এই অপরাধ-বিরাম কোনও কোনও অপরাধীদের মধ্যে বহুক্ষণ, কারও কারও বা কয়েক ঘণ্টা, কারও কারও মধ্যে আবার কিছু দিন পর্য্যন্ত দেখা যায়। পাগল ও অপরাধীদের নিকট সম্পর্ক এই লুসিড্ ইনটারভ্যাল থেকে প্রমাণিত হবে। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটুকু প্রণিধান যোগ্য।

"শালে আ'কে বোলা, চলো চলো আজ একটা জরুরী কাম হ্যায়। লেকেন উস্-রোজ মেরা কামকো লায়েক দিল্ নেহি থে। মে বোলা, নেহি ভাই মে নেহি যায়গা মেরি দিল কাম নেহি মাংতা। হাঁ হুজুর; মাহিনামে দো চার রোজ কভি সপ্তাহ ভর মেরা দিল কেইসেন হো যাতা, মেরি দুঃখ ভি বহুত আতা, ডর ভি। লেকেন পিছু এক রোজ হাম ঠিক হাম বান্ যাতা, দিল ভি মেরা হো যাতা কামকো লায়েক। লেকেন শালে মোকে বিলকুল ভুল সমজা। আঙিনামে একটো লেকড়ি থে। উ উঠায়কে শালে মেরা শির পর ডালদিয়া—গোঁসা করকে। চোট ভি

লাগা খুন ভি নিকলা, লেকেন ই আপষকা লড়াই হুজুর। আপষ—নেহি নেহি হুজুর উনকেপর ফরিয়াদি মে নেহি বানেগা।"

কোনও কোনও অপরাধীদের মধ্যে আবার এই অপরাধ-বিরাম ছয় মাস বা পুরা এক বছর পর্য্যন্তও দেখা যায়।

এদেশে প্রত্যেক প্রদেশেই সরকার বাহাদুর একটী করে টিপ ঘর বা ফিঙ্গার প্রিণ্ট বুরো মেইনটেন্ করেন। এই সব টিপ ঘরে হাজার হাজার অপরাধীর টিপ্-পত্র (অঙ্গুলীর টিপ্) রক্ষিত আছে। এই সব টিপ-পত্র থেকে অপরাধী-বিশেষ কতবারের দাগী এবং কোন কোন তারিখে ও কি জন্য তার জেল হয়েছিল তা জানা যায়। কোনও কোনও টিপের কাগজ থেকে জানা যায় যে অপরাধী-বিশেষ ৩০ বারের অধিক বারও জেল খেটেছে। এই ধরণের অপরাধীদের টিপের কাগজ পরীক্ষা করে আমি দেখেছি অপরাধী-বিশেষ প্রথম বৎসর হয়ত দু মাস, দেড় মাস করে তিন বার জেল খেটেছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরেরও অনুরূপ ভাবেই তার দিন কেটেছে, কিন্তু চতুর্থ বৎসরে ও পঞ্চম বৎসরের প্রথম ভাগে সে জেল খাটে নি। কিন্তু পঞ্চম বৎসরের শেষার্দ্ধে ও ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম বৎসরে সে পুনঃ পুনঃ জেল খাটে। এর পর নবম বর্ষে তার আর কোনও সাজা দেখা যায় না, কিন্তু দশম বৎসর থেকে পুনরায় তাকে অপরাধী দেখা যায়। মধ্যেকার এ ব্যবধানকে বলা হয় অপরাধ-বিরাম বা অপরাধের ফাঁক। এই সকল অপরাধীদের। জিজ্ঞাসাবাদ করে আমি জেনেছি যে তাদের অপরাধী জীবনের উক্তরূপ ফাঁকের সময়ে সত্য সত্যই তারা কোনও রকম অপরাধমূলক কাজ করে নি। অপরাধ-বিরামের উপস্থিতির জন্যই এরূপ ঘটে থাকে বলে আমি মনে করি। তবে এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। অভ্যাস-অপরাধীদের টিপ-পত্রগুলি বিশেষরূপে বেছে নিয়ে এ সম্বন্ধে আমাদের আরও পরীক্ষা করা উচিত,

কারণ অপরাধ-বিরামের আধিক্য অভ্যাস-অপরাধীদের মধ্যেই অধিক দেখা যায়।*

অনেকের মতে এই অভ্যাস-অপরাধীরা আত্ম-বিস্মৃত হয় না। মাঝে মাঝে অর্থাৎ অপরাধ-বিরামের সময় তাদের অনুতাপও আসে। অন্য-সময় কিন্তু উৎকট অভ্যাস-অপরাধীদের অনুতাপ আসে না। স্বভাব-অপরাধীদের মতই তারা তখন অনুতাপ-বিহীন হয়ে উঠে। এরা টাকা চেনে ও বোঝে, এরা চালিত হয় বুদ্ধির দ্বারা, প্রেরণা দ্বারা নয়। বিশেষ চিন্তা করে এরা কাজ করে, কখনও বেপরোয়া হয় না। কুসঙ্গে পড়ে এরা যেমন অপরাধী হয়, সৎসঙ্গে পড়ে আবার এরা ভালও হয়ে উঠে। প্রাথমিক অবস্থায় অভ্যাস-অপরাধীর ন্যায়, অভ্যাস-বেশ্যারাও তাদের কাজের জন্য লজ্জিত থাকে। বিপরীত অবস্থায় পড়লে এরা চোর বা বেশ্যা না হয়ে সৎ বা সতী হ'তে পারত। তাদের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য দায়ী তাদের ভাগ্য।

বিপরীত ঔষধাদি বা বাক্-প্রয়োগ দ্বারা বা নূতন পরিবেশের মধ্যে ফেলে অভ্যাস-অপরাধীদের আবার সাধুতে পরিণত করা সম্ভব। আমি একজন বিশিষ্ট ভদ্রচোরকে জানতাম, যে কি না স্ব-বাক্ প্রয়োগ দ্বারা নিজেকে পরবর্ত্তীকালে সাধুতে পরিণত করেছিল। নিম্নের বিবৃতিটী প্রণিধান যোগ্য।

"আমি কোন এক বড় কোম্পানীর হেডক্লার্ক ছিলাম। কর্ম্মরত অবস্থায় আমি প্রচুর ঘুষ নিতাম। এই ভাবে উৎকোচ গ্রহণ দ্বারা আমি প্রভূত সম্পত্তি লাভ করি। নানারূপ প্ররোচনা ও লোভের বশবর্ত্তী হয়েই

* এই সকল টিপ্-পত্রগুলি হ'তে আরও জানা যায় যে, অপরাধীরা পঞ্চাশ ও ষাট বৎসর বয়ঃক্রমের পর প্রায়ই আর অপরাধ করে না। দৈহিক ও মানসিক শক্তিহীনতাই এ জন্য দায়ী বলে আমি মনে করি। এই বয়সে কখনও কখনও তারা অপরকে দূর হ'তে পরামর্শ দেয়, কিন্তু পারতপক্ষে সাক্ষাৎভাবে অপকার্য্যে লিপ্ত থাকে না। এখানেও অনুসন্ধানের একটী বিশেষ ক্ষেত্র আছে বলে আমি মনে করি।

আমি এরূপ করতাম। শেষের দিকে আমার ভয় বা অনুতাপ কিছুই আসত না। অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে কিন্তু আমার মধ্যে এক বিশেষ পরিবর্ত্তন আসে। আমি নিজেকে বোঝাই, সারা জীবন আমি কি করলাম। সকলেই ত আমাকে চোর মনে করে, আমি ত সকলেরই ঘৃণ্য। কতদিনই বা আমি বাঁচব, টাকা হবেই বা কি আমার। জীবনটা ত আমি পুরাপুরি ভাবেই ভোগ করেছি। এই দিক থেকে ত আমার কোনও ক্ষোভ বা আত্মগ্লানির কারণ নেই। এমনি সব ভাবনার মধ্যে, আমার টাকার উপর ঘৃণা আসে। আমি ঘুষ নেওয়া বন্ধ করি, শুধু তাই নয়, অবসর গ্রহণের পর আমি দান ধ্যানও আরম্ভ করি। আমি ধীরে ধীরে সাধু, নির্লোভী ও দাতা হয়ে উঠি।"

এমনি ভাবে কেউ কেউ স্ববাক্-প্রয়োগেই সাধু হয়ে উঠে, কারও কারও আবার পর-বাক্-প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। আমার মতে স্ববাক্-প্রয়োগের সঙ্গে পর-বাক্-প্রয়োগ মিলিত হ'লে ফল অধিকতর শুভ হয়। কর্ম্মরত-কালীন যাঁরা ঘুষ নেন, অবসর প্রাপ্তির পর যেমন তাঁদের কাউকে কাউকে সাধু ও দাতা হ'তে দেখা যায়, তেমনি এমন ব্যক্তিও দেখা গেছে যারা কর্ম্মরতকালীন অত্যধিক সাধু জীবন যাপন করেছেন, কিন্তু অবসর প্রাপ্তির পর তারাই আবার লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করেছেন ও লোক ঠকিয়েছেন। এরূপ অবস্থার বৈজ্ঞানিক নাম রিঅ্যাকসন বা অপফল বা অনুফল। সারা কর্ম্মজীবন তাঁরা ভয়ে ও সম্মানহানির আশঙ্কায় জোর করে লোভ দমন করে সাধু জীবন যাপন করেছেন, কিন্তু কোনও দিন তাঁরা অসাধু হবার ইচ্ছা দমন করতে পারেন নি। আশে পাশের, দশজনের অসাধুতা তাঁদের অন্তরে অপঃস্পৃহাকে জাগিয়ে রেখেছিল; কিন্তু তাঁরা তাকে রূপ দিতে পারেনি। ফলে তাঁরা অপরাধী না হ'লেও অপরাধ-মুখী হয়ে দিন কাটিয়েছেন, তাই অবসর প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের প্রথম

প্রয়াস হয়, ভাইকে ও আত্মীয়দের বা বিধবা ভ্রাতৃবধূকে ফাঁকি দিয়ে কিছু টাকা করা। জোর করে চেপে রাখা অপরাধ স্পৃহা বা অতৃপ্ত বাসনা ফাঁক পেয়ে ভলকানিক পদার্থের ন্যায়ই তখন বেরিয়ে আসে, পেনসনের পর অর্থের ঘাটতি এবং বাড়তি পরিবারও এই সময় তাঁদের উক্তরূপ মনোবৃত্তির সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। এই সব সাধু ব্যক্তি যদি কর্ম্মজীবনে কেবলমাত্র সাধু ব্যক্তিরই সন্ধান পেত, অসাধু ব্যক্তির সন্ধান একেবারেই না পেত, তা হলে অবশ্য এই সব ব্যক্তি আজীবন সাধুই থেকে যেত। সাধারণতঃ আমরা শিশুদের এরূপ উপদেশ দিই, "খোকা, মিথ্যা কথা বলো না, কখনও চুরিও করো না—এই সবের মধ্যে পাপ আছে।" খোকা বড় হয়ে দেখে আশে পাশের সকলেই এর বিপরীত কাজ করে কেবল সেই করে না। ফলে তার আশৈশব "বাক্-প্রয়োগ (অভিভাবকের উক্তরূপ সাজেস্সন) কার্য্যকরী হয় না। আমার মতে অভিভাবকদের বাক্-প্রয়োগ হওয়া উচিত এরূপ, "খোকা, বড় হয়ে দেখবে অনেকেই চুরি করছে, মিথ্যা কথাও বলছে, কিন্তু তুমি যেন তাদের দলে ভিড় না।" বাক্-প্রয়োগ এরূপ হ'লে কার্য্যকরী হ'লেও হ'তে পারে, কারণ, এটা মনকে পূর্ব্ব হ'তেই প্রস্তুত রাখে—তবে এর সম্বন্ধেও জোর করে কিছু বলা যায় না। এই সব কারণে পৃথিবীতে বিশ্বাস কাউকে করা উচিত নয়, সাধুকেও নয়, অসাধুকেও নয়। আজ যে ভাল আছে, অবস্থাগতিকে কালই সে মন্দ হয়ে যেতে পারে। বাপ ভাইও এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত হয় না, অন্য ত পরের কথা। তবে এমন লোকও পৃথিবীতে দেখা যায় যাদের কাছে সাধুতা বা অনেষ্টি একটা রোগ বা ডিসইজ। তাদের সাধুতা বা অনিষ্টি ফ্যানাটিসিমের নামান্তর মাত্র। এই সব রোগীরা সাধারণতঃ একটু বোকা ধরণের ও রাগী হয়, বুদ্ধিমত্তাও থাকে এদের কম। এরা কাউকে না ঠকালেও

এদের অন্যে ঠকিয়ে যেতে পারে। তবে কঠিন রোগেরও কখন কখনও উপশমও হয়, এ কথা ভুলা উচিত হবে না। এজন্যে যারা ঠকে, তাদেরই আমি বেশী দোষী মনে করি—কারণ ঠগীদের ঠকাবার তারা সুযোগ করে দেয়।

এই সম্বন্ধে আরও একটী কথা বলে আমি বর্ত্তমান পরিচ্ছেদ শেষ করব। এই বিশেষ দিকটী আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ভেবে দেখতে বলি। প্রত্যেক বিভাগেই কতকগুলি লোক অপরাধী কতকগুলি নিরপরাধ এবং কতকগুলি অপরাধ-মুখী থাকে, এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণ অপরের দৃষ্টান্তে অনুপ্রেরিত হয়ে অপরাধী হয়। কেবলমাত্র ভয়ে ও ইজ্জতহানির আশঙ্কাতেই এদের কেউ কোনও অপরাধ করে না।* এই কারণে প্রায়ই দেখা যায় যে ওপরওয়ালা বা বস্ ষ্ট্রিক্ট ও সাধু হ'লে নিম্নস্থ সকলেই সাধু থাকে এবং ওপরওয়ালা বা বস্ লিনিয়েণ্ট বা অসাধু হ'লে ডিপার্টমেণ্ট শুদ্ধ অসাধু হয়ে উঠে। এই কারণে একের অপরাধ বা দোষে আমরা প্রায়ই বহুকে অপরাধী হ'তে দেখি।

এই অভ্যাস-অপরাধীদের সম্বন্ধে আরও একটী কথা বলে বর্ত্তমান পরিচ্ছেদ শেষ করব। এই অভ্যাস-অপরাধীদের সংখ্যা সভ্যতা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হচ্ছে। মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান অভাব ও অভিযোগই এর কারণ। মধ্য-যুগে যে মানুষ একজোড়া খড়ম একখানা ধুতি ও একখানা চাদরে সন্তুষ্ট থাকত, তারই এখন নানাবিধ পরিচ্ছদ, আসবাব, টয়েলেট, ও যানের প্রয়োজন হয়। মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়ে নানারূপ আদর্শজনিত ও অসমতার কারণে আর স্বল্পে

* অনেক সময় দৃষ্টান্তও বাক্-প্রয়োগের স্থল অধিকার করে। এই জন্য আমরা যেমন একই পরিবারে বহু অসৎ ব্যক্তির সন্ধান পাই তেমনি একই পরিবারের বহু সৎ ব্যক্তিরও সন্ধান পেয়ে থাকি।

সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তাই সদ্-উপায়ে অপারক হ'লে অসদ্ উপায়ে সাহায্য নিতে তাদের বাধ্য হ'তে হয়। কোলকাতা সহরের বহু বালক যে কেবলমাত্র সিনেমা দেখার প্রয়োজনেই চোর হয়েছে এ কথা সহরবাসী মাত্রই পরিজ্ঞাত আছেন, তা ছাড়া পূর্ব্বে মানুষ প্রায় চাষ-বাসে নিযুক্ত থাকত ও পারিবারিক আদর্শের মধ্যে মানুষ হ'ত, কিন্তু আজকের যুগ উদ্যোগ-শিল্পের যুগ (ইনডাষ্ট্রি), কুটীর-শিল্পের যুগ নয়। ক্রমবর্দ্ধমান উদ্যোগ-শিল্প মানুষকে তার মা বোন স্ত্রী ও অন্যান্য পরিবারবর্গ থেকে দূরে টেনে এনে তাকে পাবিবারিক আদর্শ থেকে বঞ্চিত করে তাকে অপরাধ-মুখী হ'তে প্রতিদিনই সাহায্য করছে। এই জন্য প্রতিদিনই নূতন নূতন আইন কানুনেরও প্রয়োজন হচ্ছে এই সব অভ্যাস-অপরাধীদের দমন করার জন্যে। আজকালকার শহুরে সমাজ অপরাধীদের দ্বারা তৈরী না হ'লেও তা অপরাধ-মুখী মানুষের দ্বারা তৈরী, এই কারণে কঠোর রাষ্ট্রিয় শাসনে না থাকলেই মানুষ বহু পূর্ব্বেই আবার তার আদিম বর্ব্বর যুগে ফিরে যেত বলে আমি মনে করি। সামাজিক শাসনের, ধর্ম্মের ও নীতির ভয় আজকাল স্বল্প লোককেই অভিভূত করে, তাই একমাত্র রাষ্ট্রের ভয় ছাড়া লোকের আর কোনও ভয় নেই, এইজন্য যে সকল অত্যল্প পাপ ও অন্যায়ের জন্য পূর্ব্বে সমাজ, ধর্ম্মযাজকেরা ও মাননীয় বৃদ্ধেরা শাস্তি-বিধান করত, সেই সব পাপ ও অন্যায়ের জন্য শাস্তি দেওয়ার ভারও আজ রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়ারও প্রয়োজন হয়েছে বলে আমি মনে করি, যদিও এই পাপ ও অন্যায়কে বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে প্রকৃত অপরাধ পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় না বা করা উচিত না। এ সম্বন্ধে দেশবাসীকে সবিশেষ অবহিত হয়ে ভেবে দেখবার জন্য আমি অনুরোধ করি।

স্বভাব-অপরাধী

গোত্রগত অপরাধীদেরই আমরা স্বভাব-অপরাধী বলি। একটা দুর্দ্দমনীয় অপরাধ স্পৃহা নিয়েই এরা জন্মগ্রহণ করে। এই স্পৃহা তাদের মৃত্যুর দিন পর্য্যন্তও অবিচলিত থাকে। এই দুর্দ্দমনীয় অপরাধ স্পৃহা তাদের মধ্যে কিরূপে আসে এবং আসেই বা কেন, সেই সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। প্রায়ই দেখা যায়, সাধুর ছেলে চোর হয় এবং চোরের ছেলে সাধু হয়ে উঠে। সুতরাং এই অপরাধ স্পৃহা যে জন্মগত তা ঠিক বলা যায় না। এটা ঠিক জন্মগত নয় তবে এটা গোত্রগত। ইংরাজীতে একে গোত্রানুক্রম বা Atavism বলে। গোত্রানুক্রম দুই প্রকারের, মানসিক ও দৈহিক। পূর্ব্বেই বলেছি, মানুষের বীজকোষস্থিত $\frac{২}{৩}$ অংশ অপরাধ স্পৃহার সঙ্গে তার দেহকোষস্থিত $\frac{১}{৩}$ অংশের অপরাধ স্পৃহার সংযোগ সাধনের দ্বারাই স্বভাব-অপরাধীর জন্ম হয়। এরূপ সংযোগ মানসিক গোত্রানুক্রম দ্বারাই স্থাপিত হয়। মানসিক গোত্রানুক্রম সম্বন্ধে বুঝতে গেলে, প্রথমে বোঝা দরকার দৈহিক গোত্রানুক্রম কাকে বলে। অনেক সময় আমরা দেখেছি, কি মাতা, কি পিতার দিক হ'তে দুই তিন পুরুষ কৃষ্ণকায় হলেও দম্পতি বিশেষের শ্বেতকায় পুত্রও হয়েছে। কিরূপে এটা সম্ভব হয় তা ভেবে আমরা বিস্মিত হই। কিন্তু বিস্মিত হবার কিছু নেই! এরূপ হ'লে বুঝতে হবে, তার কয়েক পুরুষ পূর্ব্বেকার কোনও ব্যক্তি শ্বেতকায় ছিল।

এই শ্বেতবর্ণ কয়েক পুরুষ সুপ্ত অবস্থায় থেকে সহসা শিশুটীর মধ্যে বিকাশ পেয়েছে। এরূপ আকস্মিক বিকাশকে বলা হয় গোত্রানুক্রম। এটি একটী বংশ-গোত্রানুক্রমের দৃষ্টান্ত। এই বংশ-গোত্রানুক্রমের ন্যায়

জাতি-গোত্রানুক্রমও দেখা যায়। আমাদের বাঙ্গালী জাতির মধ্যে কারও কারও মুখাবয়ব হুবহু চীনা বা জাপানীদের মত হ'তে দেখি। একে বলে জাতি গোত্রানুক্রম। প্রমাণ-স্বরূপ নিম্নে একজন উচ্চবংশীয় সাধু প্রকৃতির বাঙালী বালকের ছবি দেওয়া হ'ল। এ থেকে বুঝতে হবে



কোনও এক বিস্মৃত যুগে আমাদের মধ্যে কিছু মঙ্গোলীয় রক্ত মিশেছে। এ ছাড়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যে বানরের ন্যায় কোনও লোমশ জীব ছিল তারও প্রমাণস্বরূপ কদাচিৎ কোনও কোনও মানুষের মুখেও লোম দেখা যায়। প্রমাণস্বরূপ পর পৃষ্ঠায় একটী বানর ও একটী আদিম মানুষের প্রতিকৃতি দেওয়া হ'ল। রুশদেশীয় কুকুর-মানুষ এর অপর এক দৃষ্টান্ত। ইনি একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। পর পৃষ্ঠার চিত্র দেখুন। এই ভাবে গোত্রানুক্রম কখনও লক্ষ পুরুষ, কখনও সহস্র পুরুষ, কখনও বা বিশ পঁচিশ পুরুষ সুপ্ত অবস্থায় থেকে হঠাৎ কোনও এক বংশধরের মধ্যে আবির্ভাব হয়। এই দৈহিক গোত্রানুক্রমের ন্যায় মানসিক গোত্রানুক্রমও দেখা যায়।

এই মানসিক গোত্রানুক্রমের জন্যই অনেক সৎ বংশে স্বভাব-অপরাধীর জন্ম হ'তে দেখি। সৎবংশে জন্মে, সৎভাবে বর্দ্ধিত হয়েও





তারা অপরাধ-মুখী হয়ে উঠে। আদিম যুগে মানুষ যখন বর্ব্বর ছিল, তখন মনুষ্য সমাজে অনেক অপরাধকে অপরাধ বলেই ধরা হ'ত না। এযুগে যা ঘৃণ্য অপরাধ, সে যুগে তা বীরত্বের আখ্যায় ভূষিত হয়েছে। পরদ্রব্য ও পর-স্ত্রী হরণ প্রভৃতি তখনকার এক সহজ সামাজিক ব্যাপার। পরে মানুষ যতই সভ্য হ'তে থাকে,



তার স্বভাবও সেই পরিমাণে বদলায়। পূর্ব্বের অনেক স্বভাব ও

অভ্যাস মানুষ ত্যাগ করেছে। কিন্তু ত্যাগ করলে কি হয় তাদের বীজকোষে আদিম অপরাধস্পৃহার ⅔ অংশ থেকে গেছে। সাধারণতঃ পুরুষানুক্রমে সেটা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বীজকোষে নিহত থাকায় সেটা বাইরে প্রকাশ পায় না। কিন্তু গোত্রানুক্রম দ্বারা যদি পরবর্ত্তী কোনও এক পুরুষে দৈবক্রমে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে, তা হ'লে সেই প্রাপ্ত স্বভাব শিশুটীর আর রক্ষা নেই। দেহকোষের আদিম অপরাধ স্পৃহার ⅓ অংশের অবস্থান হেতু মানুষের মন স্বভাবতঃই অপরাধ-প্রবণ থাকে। এর সঙ্গে গোত্রানুক্রম দ্বারা বীজকোষস্থিত অপরাধ স্পৃহার ⅔ অংশের সংযোগ হ'লে শিশুটী স্বভাবতঃই হয়ে ওঠে একজন উৎকট স্বভাব-অপরাধী। তার স্বভাব চরিত্র হয় ঠিক আদিম যুগের মানুষের মত। অপরাধকে অপরাধ বলে সে কিছুতেই বুঝতে চায় না। পরস্বাপহরণ হয় তার কাছে একটা জন্মগত অধিকার। যতই তাকে বোঝান যাক, সে ওতে কোন দোষই দেখে না। কোনও একটা অপরাধ না করে সে কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। আমি এক বালক স্বভাব অপরাধীকে জানি। পিতার নিকট হ'তে প্রত্যহ খুচরা ৪০৲ টাকা পাওয়া সত্ত্বেও সে সুবিধা পেলেই ৫৲ বা ১০৲ টাকার জন্য চুরি করেছে। এই সব অপরাধীরা অতি মাত্রায় সাহসী ও বেপরোয়া হয়। এরা খায় দায় স্ফূর্ত্তি করে, কিন্তু অর্থ সঞ্চয় করে না। সামান্য কারণেই এরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, আবার হঠাৎ ঠাণ্ডাও হয়ে যায়। এদের দৃষ্টি ক্রূর ও স্বভাব পশু-সুলভ। এরা চালিত হয় প্রেরণা বা ইন্‌ষ্টিংক্ট দ্বারা, বুদ্ধি বা যুক্তি তর্কের তারা ধার ধারে না।

এদের কারও কারও মধ্যে কেবলমাত্র মানসিক গোত্রানুক্রম দেখা যায়। কারও কারও মধ্যে কেবলমাত্র মানসিক ও দৈহিক উভয় গোত্রানুক্রমই দেখা যায়। শেষোক্ত কারণে পূর্ব্বেকার অনেক মনীষী দৈহিক গোত্রানুক্রমেই স্বভাব-অপরাধীর জন্মের জন্য দায়ী করতেন। ফলে

'বাপকো বেটা সিপাইকো ঘোড়া, কুছ নেহি ত থোড়া থোড়া' ও 'কটা শূদ্র কালো বামুন বেঁটে মোছলমান তিনই সমান' প্রভৃতি প্রবাদের প্রচলন হয়। দার্শনিক সক্রেটিস একজন এই ধরণের ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অবয়বের সঙ্গে আদিম যুগের মানবের কোনও কোনও বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি নাকি উত্তরে বলেছিলেন, "হাঁ, আমার মন অত্যধিক অপরাধ-প্রবণ। কিন্তু আমার এই অপরাধ স্পৃহা আমি দমন করে থাকি। পুরাতন অপরাধ-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতদের মধ্যে লমব্রোসো এবং গোরিঙ এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করেন। লম্‌ব্রোসো সাহেবের মতে নিম্নের চোয়াল লম্বা হ'লে, চক্ষু শূকরের মত দেখা গেলে, শ্মশ্রুর অভাব ঘটলে, ব্যক্তি বিশেষ সাধারণতঃ স্বভাব-অপরাধী হয়। বলা বাহুল্য, এই সকল চিহ্নগুলি দৈহিক গোত্রানুক্রমের চিহ্ন। নিম্নের চিত্রগুলি দেখুন। আদিম যুগের মানুষদের মধ্যে

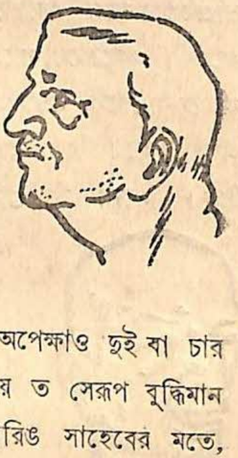


এই ধরণের বৈশিষ্ট্য দেখা যেত। লমব্রোসোর শিষ্যরা আবার আরও এগিয়ে যান। তাঁদের মতে এই সকল উঁচু কপাল, লম্বা চোয়াল, কুলো কান, থ্যাব ড়া নাক প্রভৃতি চিহ্ন* থেকে ব্যক্তি বিশেষ কি প্রকারের

* অনেকের মতে এই সব চিহ্নগুলি দৈহিক অবনতি বা ডিজেনারেশনের কারণে মনুষ্য দেহে বর্ত্তিয়ে থাকে। জরায়ুর বা ভ্রূণ সম্বন্ধীয় ক্ষয় ক্ষতির জন্যও এরূপ হয়ে থাকে।

অপরাধী অর্থাৎ সে একজন চোর বা খুনে বা যৌন-অপরাধী তা নাকি জানা যায়। কিন্তু গোরিঙ সাহেব তাঁদের এই ভুল ভেঙে দেন। তিনি বিলাতী জেলসমূহে প্রায় ৩০০০ কয়েদীর দেহ পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে অপরাধ স্পৃহার সঙ্গে অপরাধীর দৈহিক চিহ্নগুলির কোনও সম্বন্ধ নেই। গোরিঙ সাহেবের মতে চিত্ত দৌর্ব্বল্যের জন্যই মানুষ অপরাধ করে। চিত্ত দৌর্ব্বল্য বা ফিব্‌ল মাইণ্ডেডনেস সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্। একজন ১৫৲ বৎসর বয়স্ক বালকের যেরূপ বুদ্ধি





থাকা উচিত একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির যদি তা অপেক্ষাও দুই বা চার বৎসরের কম বয়স্কের (বালকের) ন্যায় বুদ্ধিশুদ্ধি হয় ত সেরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বলা হবে একজন চিত্ত-দুর্ব্বল ব্যক্তি। গোরিঙ সাহেবের মতে, এই সকল চিত্ত-দুর্ব্বল ব্যক্তিরাই হ'ত স্বভাব-অপরাধী। তিনি পরীক্ষা দ্বারা এরূপ বহু চিত্ত-দুর্ব্বল অপরাধী বার করেন। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যদের মধ্যে এরূপ অনেক পরীক্ষা করা হয়। এই সব

জন্মের পরেও এরূপ অবনতি ঘটলেও ঘটতে পারে। এই সব অবনতি বা ডিজেনারেশনের সঙ্গে অপস্পৃহার কোনও সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয় না। তবে উত্তমরূপ ক্ষয় ক্ষতি যদি মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ঘটে তা হ'লে অপরাধ-রোগীর জন্ম হ'লেও হ'তে পারে—স্নায়ুবিক কারণেই এরূপ হয় বা হয়ে থাকে।

পরীক্ষাতে দেখা যায় প্রায় ১০ লক্ষ সৈন্যের বুদ্ধিমত্তা ঠিক ১৩ বা ১৪ বৎসর বয়স্ক বালকদের মত। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কখনও কোন অপরাধ করে নি। এইভাবে গোরিঙ সাহেবের মতবাদও পরে ভুলরূপে প্রমাণিত হয়।

আমার মতে মানসিক গোত্রানুক্রমই স্বভাব-অপরাধীদের জন্ম দেয়। এই মানসিক গোত্রানুক্রমের সঙ্গে দৈহিক গোত্রানুক্রমের কোনও সম্বন্ধ নেই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই দৈহিক ও মানসিক গোত্রানুক্রম একত্রে দেখা যায় বটে কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই মানসিক গোত্রানু-ক্রম এককই দেখা যায়। পার্শ্বের চিত্রটীতে একজন বালক অপরাধীর ফটো দেওয়া হয়েছে। বালকটীর মধ্যে দৈহিক ও মানসিক—উভয় গোত্রানুক্রমই পরিস্ফুট দেখা যায়। বালকটীর স্বভাব চরিত্র ছিল ঠিক আদিম মানুষের ন্যায়। সে পশুর ন্যায় খড়া বেয়ে ছাদে উঠত, নর্দমা গলে গৃহ প্রবেশেও সে ছিল দক্ষ। পর পৃষ্ঠার ছবিটীতে অপর দুইটী বালক অপরাধীর প্রতিকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই বালক দুইটীর মধ্যে কেবলমাত্র মানসিক গোত্রানুক্রমই দেখা যায়, তাদের মধ্যে দৈহিক গোত্রানুক্রমের কোনও চিহ্ন মাত্র নেই। অপরাধীদের অন্তর্স্বভাব, তাদের অঙ্গসৌষ্ঠব, চলন, দৃষ্টিভঙ্গি ও কথোপকথন প্রভৃতির মধ্যে কিছু কিছু পরিস্ফুট হয়, তবে তাদের এই বৈশিষ্ট্য প্রকৃতিগত, আকৃতিগত নয়। ক্রিপটো-ম্যানিয়াগ্রস্ত রোগী অপরাধীরা চুরি করে তাদের ইচ্ছাবৃত্তির উপশমের জন্য, বিত্ত-



লাভের জন্য নয়। কিন্তু এই স্বভাব-অপরাধীরা চুরি করে তাদের লাভের, ভোগের ও ব্যবহারের জন্য। তারা কখনও তাদের কাজের জন্য অনুতপ্ত



হয় না। চৌর্য্য আদি দুষ্কার্য্য তাদের কাছে অধিকারের সামিল। অতি অল্পসংখ্যক অপরাধীই স্বভাব-অপরাধী হয়। অভ্যাস-অপরাধীদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। স্বভাব-দুর্বৃত্ত (ক্রিমিনাল ট্রাইব) জাতিগুলির স্বভাব, কতকটা স্বভাব-অপরাধীদের মতই হয়ে থাকে। এই সব জাতিরা তাদের আদিম-স্বভাব আজও ত্যাগ করে নি। এখন পর্য্যন্ত 'অপরাধ'ই তাদের প্রধান উপজীবিকা। দেহের দিক থেকে পরিবর্ত্তিত হ'লেও, মনের দিক থেকে তারা প্রায় আদিম যুগেরই মানুষ।

মধ্যম-অপরাধী

স্বভাব, অভ্যাস ও দৈব-অপরাধী ছাড়া আরও একপ্রকার অপরাধী আছে। তাদের মধ্যম অপরাধী বলা হয়। তাদের ব্যবহার কতকটা অভ্যাস ও কতকটা স্বভাব-অপরাধীদের ন্যায়। পূর্ব্বেই বলেছি, বীজ-কোষস্থিত অপরাধ স্পৃহার ২/৩ অংশ দেহকোষের ২/৩ অংশ অপরাধ স্পৃহার সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বভাব-অপরাধীর জন্ম দেয়। কিন্তু জীবকোষের অপরাধ স্পৃহার কতটা অংশ দেহকোষের অপরাধ স্পৃহার সঙ্গে মিলিত

হবে, তা নির্ভর করে অপরাধীর ভাগ্যের উপর। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বীজকোষের অপরাধ স্পৃহার সবটুকু অংশ দেহকোষে বর্ত্তায় না। কখনও কখনও সেটা অল্প মাত্রায় বর্ত্তায়। এরূপ অবস্থায় অপরাধীরা স্বভাব-অপরাধীদের ন্যায় এতটা উৎকট হয় না। এদের তখন বলা হয় মধ্যম-অপরাধী। এই সকল মধ্যম-অপরাধী ছাড়া আরও একপ্রকার মধ্যম-অপরাধী দেখা যায়। এদের কেউ কেউ উৎকট অভ্যাস অপরাধীও বলে থাকেন। এই সকল অপরাধীরা সাধারণ অভ্যাস-অপরাধী থেকে অধিকতর উৎকট হয়। আসল অভ্যাস-অপরাধীরা সহজ মানুষ থেকে অপরাধী হয়। এজন্য এদের মধ্যে অপরাধ বিরামের আধিক্য দেখা যায়। এই সব অভ্যাস-অপরাধীরা জ্ঞান উন্মেষের পরেও কিছুকাল নিরপরাধ থাকে, পরবর্ত্তীকালে অভ্যাসজনিত তারা অপরাধীতে পরিণত হয়। কিন্তু এমন অপরাধীও আছে যারা তাদের জ্ঞান উন্মেষের পূর্ব্ব থেকেই সুনিয়ন্ত্রিতরূপে অপকার্য্য শেখে। সহজ ও নিরপরাধ মানুষ সম্বন্ধে তাদের কোনও ধারণা থাকে না। স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতির ছেলেরা এই জাতীয় হয়ে থাকে। সহজ মানুষের শিশুদের দ্বারা কৃত অপরাধের সঙ্গে এই সব স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত বালককৃত অপরাধের (পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ—৪০ পৃষ্ঠা দেখুন) তুলনা করলে উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যাবে। সহজ বালকদের অপরাধ সমূহ কখনও সুনিয়ন্ত্রিত হয় না, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত বালক কৃত অপরাধ সমূহ সব সময়েই সুনিয়ন্ত্রিত ও সুচিন্তিত হয়ে থাকে। শৈশবকাল থেকেই দলগত শিক্ষা-জনিত তারা হয়ে উঠে মধ্যম-অপরাধী। এই জন্য স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতিগুলির মধ্যে মধ্যম-অপরাধীর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। উপরে মাত্র দুই প্রকারের মধ্যম-অপরাধীর কথা বলা হ'ল। কিন্তু নানাপ্রকারের মধ্যম-অপরাধী দেখা যায়। বহুক্ষেত্রে এই মধ্যম, স্বভাব ও অভ্যাস-অপরাধীদের অন্তর্নিহিত পার্থক্য বোঝাও যায় নি। বাঙ্গালীরা বাঙ্গলায় থাকে, বেহারীরা

থাকে বেহারে। কিন্তু বাংলা ও বেহারের মাঝখানে এমন অনেক লোক আছে, যারা বাঙ্গালীও না, বেহারীও না। বাঙ্গালী ঘেঁষা বেহারী ও বেহারী ঘেঁষা বাঙ্গালীরও অভাব নেই। ঠিক অনুরূপ ভাবে মধ্যম-অপরাধীদের নিয়েও গোল বাধে। তাদের শ্রেণী-বিভাগ করা শক্ত হয়ে উঠে। প্রথম শ্রেণীর মধ্যম-অপরাধীরা হয় স্বভাব-ঘেঁষা, দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যম-অপরাধীরা হয় অভ্যাস-ঘেঁষা। ১ম শ্রেণীর মধ্যম অপরাধীদের মধ্যে জন্মগত ও অভাসগত অপরাধ স্পৃহা এক সঙ্গে থাকায় তারা একধারে বুদ্ধি (ইণ্টেলিজেন্স) ও প্রেরণা (ইন্‌ষ্টিংক্ট), উভয় দ্বারাই পরিচালিত। এদেশের কোনও এক মনীষী বলেছিলেন, যে লোকটার একজন পিক পকেট হবার কথা, তাকে যদি এমএ পাশ করান যায় তো সে হবে ব্যাঙ্ক সুইণ্ডলার। কথাটা মধ্যম (প্রথম শ্রেণীর ?) অপরাধীদের সম্বন্ধ বিশেষ ভাবে প্রয়োজ্য। প্রথম শ্রেণীরমধ্যম অপরাধীরা স্বভাব-অপরাধীদের মত অপরাধীরূপে জন্মায় না বটে, কিন্তু অপরাধ-মুখী হয়ে জন্মায়। এই জন্য কুসঙ্গ প্রভৃতি অনুকূল অবস্থা অতি সহজে ও অত্যল্পদিনেই তাদের অপরাধী করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যম অপরাধীরা জ্ঞান উন্মেষের পূর্ব্ব হ'তেই অপকার্য্যে অভ্যস্ত হয়। সহজ ও নিরপরাধ মানুষ সম্বন্ধে তাদের ধারণা থাকে না। আশৈশব অপরাধী হওয়ায় তাদের মধ্যে নৈতিক অসাড়তা আসে। এক কথায় সহজতর স্বভাব-অপরাধী ও উৎকট অভ্যাস-অপরাধীরাই মধ্যম-অপরাধী। আমি বহু মধ্যম-অপরাধীকে জানতাম। নিম্নের বিবৃতিটুকু প্রণিধানযোগ্য। লোকটা ছিল প্রথম শ্রেণীর (?) মধ্যম-অপরাধী।

"আমার বয়স তখন ছিল মাত্র পাঁচ বৎসর। তখনকার সব কথাই আমার মনে পড়ে। মা আমার জমীদার বাড়ীতে রান্না করত। মনিবের ছেলেরা খেত ভাল, পরতও ভাল। তাদের দেখে আমার হিংসে হ'ত,

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা বরফি খায়, চাইলেও আমাকে দেয় না। ইচ্ছা করত এক থাপ্পড়ে তাদের শেষ করে দি। কাছে গেলেই সকলে বলত, দূর হ। প্রাচুর্য্য দেখতাম কিন্তু ভাগ পেতাম না। হঠাৎ একদিন দেখলাম একটা বেরাল ঘর থেকে বেরুচ্ছে, মুখে তার খাবার। বেরালের অপকর্ম্ম আমাকে অনুপ্রেরিত করে। পরের দিন আমিও খাবার চুরি করি। আমার বয়স তখন এগার। চুরির মধ্যে কোনও দোষ আমি দেখি নি। পাপ পুণ্য সম্বন্ধে তখনও আমি অজ্ঞ। পয়সায় খাবার পাওয়া যায়, তাই আমি পয়সা চুরি করি। মনিবের ছেলেদের স্কুলে যেতে দেখে, আব্দার ধরি আমিও স্কুলে যাব, লেখাপড়া করব। সকলে আমাকে ধমক দিয়ে নিরস্ত করে। কাতর নয়নে মা শুধোয়—'তুই যে গরীবের ছেলে বাবা, পড়তে গেলে যে পয়সার দরকার।' পয়সার কথা শুনে আমার হাসি আসে। পয়সা ত উড়ছে, ধরে নিলেই হ'ল। সেই দিনই একজন লোকের পকেট মেরে ১০০৲ টাকা পাই। পাড়ার বিন্দে সর্দ্দার বিদ্যেটা আমায় শিখিয়েছিল। আমার বয়স তখন বার। সোজা ইস্কুলে চলে যাই ভর্ত্তি হবার জন্যে, কিন্তু গোল বাধায় হেডমাষ্টার। হুকুম হয় বাবাকে আনতে হবে। বাবাকে ত দেখিই নি, এমন কি তাঁর নামও জানি না। ভীষণ ফাঁপরে পড়ি। শেষে নাচার হয়ে পাড়ার এক গরীব প্রৌঢ়কে ২৫৲ দিয়ে, মামা সাজিয়ে স্কুলে আনি। বাবার জন্যে একটা মনগড়া নামও বানাই, এতে আমি কোনও দোষ দেখি না। বাবা ত আমার একটা ছিলই, বাবা ছেলের নাম রাখে, আমি না হয় বাবার নাম রাখলাম। চুরি করে আমি স্কুলে মাইনে দিতাম। আমার ভর্ত্তির কথা শুনে মনিবেরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। এবং আমি তাঁদের গৃহ হ'তে বিতাড়িত হই। বিন্দে সর্দ্দার আমাকে আশ্রয় দেয়। থার্ডক্লাশ পর্য্যন্ত পড়েছিলাম, বরাবর ফাষ্ট হয়ে ক্লাশে উঠেছি। হঠাৎ একদিন অফিস ঘরে ডাক পড়ল! রুদ্রমূর্ত্তিতে

হেডমাষ্টার জানালেন আমি বাবার নাম লিখিয়েছি মিথ্যে করে। আমি একজন নাকি কুলটার সন্তান, আমার নাকি বাবা-টাবা নেই, কখন ছিলও না। স্কুল থেকে আমি বিতাড়িত হই, আমার মনের মধ্যে জাগে প্রতিহিংসা। মাত্র সতের বৎসরেই আমি হয়ে উঠি উৎকট অপরাধী। স্কুলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম, আর ছেলে বকাতাম। ঐ স্কুলের ছেলেদের নিয়েই আমি দল গড়ি। আমি নাকি একজন দুর্দান্ত গুণ্ডা ও ডাকাত।"

দৈব-অপরাধী

দৈব-দুর্বিপাকে বা ক্ষুধার জ্বালায় কেউ যদি কোনও অপরাধ করে ত তাকে আমরা দৈব-অপরাধী বলি। আমার মতে এদের অপরাধীর পর্য্যায় না ফেলাই উচিত। দৈব-অপরাধীরা নিজেদের প্রায়ই শুধরে ন্যায় অবশ্য যদি সুযোগ পায়, তবে অভ্যাসজনিত দৈব-অপরাধীদের অভ্যাস-অপরাধীতে রূপান্তরিত হওয়া আশ্চর্য্য নয়। এ অবস্থায় দৈব-অপরাধকে অভ্যাস-অপরাধের প্রাথমিক অবস্থা বলা যায়। খাদ্যের অভাব ঘটলে দৈব-অপরাধীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নিম্নের তথ্য-তালিকা বা পরিসংখ্যা দুইটী (ষ্ট্যাটিষ্টিকস্) প্রণিধানযোগ্য। ক্রিমিন্যালিটি এণ্ড ইকনমিক কনডিসন পুস্তকের ৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ইংলণ্ড

বৎসর	যবের মূল্য	অপরাধীর সংখ্যা
১৮১৬	৭৮·৬	৯০৯১
১৮১৭	৯৪·১১	১৩,৯৩২

বৎসর	যবের মূল্য	অপরাধীর সংখ্যা
১৮৪৬	৫৪.৮	২৩,০৭২
১৮৪৭	৬৯.৮	২২,৪৫১
১৮৫১	৪০.৯	২৪,৪৪৩
১৮৫৩	৫৩.৩	২৭,১৮৭
১৮৫৪	৭২.৫	২৬,৭৬০
১৮৫৫	৭৪.৮	৪১,৩০৯
১৮৫৬	৬৯.২	২৯,৫৯১
১৮৫৭	৫৬.৪	২৬,৫৪২
১৮৫৮	৪৪.২	২৪.৩০৩

স্বভাব, অভ্যাস ও মধ্যম-অপরাধীদের ন্যায় দৈব-অপরাধীদেরও অপরাধ পূর্ব্বকল্পিত ও আদর্শবিহীন হয়, সেই জন্যই তাদের প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে ধরা হয়। তবে তারা তাদের কাজের জন্য সব সময়ই অনুতপ্ত থাকে। শুধু তাই নয় সুযোগ ও সুবিধে পেলে তারা নিজেদের শুধরে নেয়। আমি একজন দৈব-অপরাধীকে জানি যে কি'না লোভে পড়ে ৫০টী টাকা চুরি করেছিল, কিন্তু সেই দিনই আবার কোনও এক গরীবের অনাহার-ক্লিষ্ট ছেলেমেয়েদের দুঃখে দুঃখিত হয়ে চুরির টাকা কটা সে তাদের দিতে এসেছে, তাদের আহারের যোগাড়ের জন্য—নিজের ও নিজ পরিবারের নানাবিধ অসুবিধা সত্বেও। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অপরাধী বিশেষের স্বকীয় অপরাধসকলের জন্য অনুতাপ আসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাকে দৈব-অপরাধীই বলা উচিত। আমি অপর একটী দৈব-অপরাধীকে জানি যে নিজের অপকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত ত ছিলই, পরন্তু অপরাধীদের প্রতি সদাসর্ব্বদাই সে একটা ঘৃণা পোষণ করত, এমন কি সে

অপরাধ নিবারণের জন্য পুলিশকে আন্তরিক ভাবে এবং বিনা স্বার্থে অনেক সাহায্যও করেছিল। নিম্নে কোনও এক দৈব-অপরাধীর একটী উল্লেখযোগ্য বিবৃতি তুলে দেওয়া হ'ল।

"সহরের আজ আমি একজন ধনী ও মানী ব্যক্তি। আজ আমি জনসাধারণের অপকর্ম্মের বিচার করে থাকি। একদিনের কথা মনে পড়ে, আমি তখন গাঁয়ে থাকতাম। প্রথম যৌবনের দিনে এবং বাল্য অবস্থায়, কখনও একা একা, কখনও বা দল বেঁধে, আমরা এর ওর ফল চুরি করেছি, চুরি করে রস পেড়েছি, ডাব চুরি করেছি, পুকুরের মাছও—মাঝে মাঝে ধরা পড়েছি, পাড়ার লোকেরা এনেছে বাবার কাছে, বাবা মেরেছেন, বকেছেন, সাবধান করে দিয়েছেন। ওই সব অপকর্ম্ম যদি আমি কোনও সহরে বসে করতাম ত এতদিনে হয় ত আমি পাঁচ-ছয় বারের দাগী চোর হতাম। আজ আমি দশজনের একজন, দেশের একজন প্রয়োজনীয় নাগরীক—আমাদের পল্লীসমাজ ঐরূপ হবার সুযোগ আমাকে দিয়েছিল, তাই আজ আমি ঘৃণ্য চোর নই, আমি একজন ভাল নাগরিক।"

বালক অপরাধীদের যেমন বর্ত্তমান যুগে প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে ধরা হয় না। তেমনি ওই সব দৈব-অপরাধীদেরও প্রকৃত অপরাধী বলা উচিত হবে না। প্রকৃত অপরাধীর জন্য যেমন পৃথক বিচারালয় আছে, তেমনি তদন্ত দ্বারা কোনও অপরাধীকে যদি দৈব-অপরাধী বলে জানা বা বুঝা যায়, ত তাদেরও বিচার-ব্যবস্থা বালকদের ন্যায়ই পৃথক বিচারালয়ে হওয়া উচিত। বালকদের যেমন জেলে না পাঠিয়ে সময় সময় অভিভাবকদের হাতে সমর্পণ করে তাদের শুধরোবার সুযোগ দেওয়া হয়, তেমনি ভাবে অনুরূপ সুযোগ ও সুবিধা দৈব-অপরাধীদের দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এমন কি দৈব-অপরাধীরা যদি কোনও কারণে

দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার অপরাধও করে এবং সেই অপরাধসকলের জন্য তখনও পর্য্যন্ত যদি তাদের অনুতপ্ত দেখা যায় তো তাদের জেলে না পাঠিয়ে পাঠান উচিত সংশোধনাগারে ; সাধারণ কারাগারে পাঠিয়ে তাদের উৎকট অভ্যাস-অপরাধীতে পরিণত হ'তে দেওয়া উচিত হবে না। যতক্ষণ তাদের অনুতাপ আসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাদের সহানুভূতির সহিতই দেখা উচিত।

এই দৈব-অপরাধী থেকে অভ্যাস-জনিত অভ্যাস-অপরাধীতে পরিণত হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়, এবং এটা হামেসাই হয়ে থাকে। নিম্নের বিবৃতিমূলক দৃষ্টান্তটী এ সম্বন্ধে প্রণিধান-যোগ্য।

"বিশ বছর আগে কোলকাতায় আসি চাকুরীর চেষ্টায়, কিন্তু কোথায়ও চাকুরী পাই না। ফুটপাতেই শুয়ে থাকতাম। হঠাৎ একদিন এক স্যাঙ্গাত জুটে গেল। তার একটা জুয়ার আড্ডা ছিল, চাকুরীর লোভ দেখিয়ে সে আমাকে তার বাড়ী আনে। আমি তাদের আড্ডার পাহারাদার হই। কিন্তু হুজুর, নিজে কখনও আমি জুয়া খেলি নি। একদিন পুলিশ এসে আড্ডায় হানা দেয় এবং অপর সকলের সঙ্গে আমাকেও আড্ডার ভেতর ধরে ফেলে। জুয়া ত সেখানে চলছিলই তা ছাড়া জুয়াড়ীদের মধ্যে নাকি, কয়েকজন চোরও ছিল। জরিমানা অনাদায়ের জন্য সেবার, তিন সপ্তাহ আমার জেল হয়। এইটেই আমার প্রথম সাজা। জেল থেকে বেরিয়ে আমি কিছু দিন এর ওর দোরে ঘুরি, কিন্তু কেউ আমায় খেতে দেয় না। দেশে ফেরবার মত গাড়ী ভাড়াও আমার ছিল না। শেষে নাচার হয়ে, আমার এক পুরাণো বন্ধুর সন্ধানে বের হই। কোনও এক বেশ্যাগৃহে বন্ধুটীর সন্ধান মেলে। বন্ধুবর একটা চোরাই "হার" আমার হাতে গছিয়ে দিয়ে সেটা বিক্রী করে টাকা আনতে বলে। আমি আনমনা ভাবে রাজী হই, কিন্তু অনভ্যাসের ফোঁটা যাবে কোথা, বিক্রীর সময় বামালশুদ্ধ ধরা পড়ি।

বিচারে আমার চার মাস জেল হয়। এর পর আমার ভীষণ অনুতাপ আসে, জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর, পরিচিত চোরেরা আমাকে তাদের দলে ভিড়তে বলে, কিন্তু আমি তাতে রাজী হই না। কোনও এক গৃহস্থের বাড়ীতে আমি চাকরের কাজ নেই। একদিন বাড়ীতে একটা সোনার গহনা হারিয়ে যায়। বাড়ীর কর্ত্তা আমাকে সন্দেহ করে থানায় পাঠান। আমার অঙ্গুলির টিপ্ থেকে প্রমাণিত হয় আমি একজন দাগী চোর। পুলিশ আমাকে জেল-হাজতে পাঠায়। জেলে একজন পরিচিত চোরের সঙ্গে দেখা হয়। সে সব কথা শুনে আমায় শুধোয়—'দেখলে ত চাঁদ! বেয়ে চেয়ে দেখলে ত? এখন এসেছো, ভীড়ে যাও মোদের লগে।' বুঝলাম পূর্ব্ব সমাজে আমার আর স্থান নেই, আমাকে নূতন কোনও সমাজ বেছে নিতে হবে, বাঁচবার জন্য। আরও দু'চার জায়গায় চাকুরীর চেষ্টা করলাম কিন্তু চোরকে কেউই স্থান দিল না। শেষে নাচার হয়ে চোরেদের দলেই ভীড়ে গেলাম। দলবেঁধে আমরা চুরি করতে বেরুতাম। প্রথম প্রথম তারা আমাকে রাস্তায় পাহারায় নিযুক্ত রাখত। শেষের দিকে আমি বাড়ীর পাঁচিলের উপর উঠে পাহারা দিতাম। সন্দেহজনক লোক নিকটে দেখলে সঙ্কেত দ্বারা (শিষ দিয়ে কিংবা অন্য কোনও উপায়ে) ভিতরের চোরদের সতর্ক করে দিতাম। এর পর আমি পাঁচিল টপকাতে, এমন কি তালা ভাঙতেও শিখে নিই। এমনি ভাবে অচিরেই আমি লায়েক হই। জাত-শেয়ানাদেরও আমি চিনে নিতে শিখি। আপনারা যাদের স্বভাব-অপরাধী বলেন, তাদেরই আমরা বলি "জাত-শেয়ানা"। এই জাত-শেয়ানাদের আমরা খুঁজে বার করে তাদের অপকর্ম্মে নিযুক্ত করি। এরা সাপের মত চলে, নিঃশব্দে এরা পাঁচিল টপকায়, দুয়ার ও তালা ভাঙ্গেও এরা নিঃশব্দে। এদের ভয়-ডরের বালাই নেই, তবে এরা বড় বোকা হয়; এবং এরা স্বল্পতেই সন্তুষ্ট থাকে। মোদের

মত বাড়ীর ঝি চাকর এবং বকাটে পুষ্যিদের কাছ হ'তে পূর্ব্ব থেকে "মাল" সম্বন্ধে কি করে খবর নিতে হয়, তা তারা জানে না। আমরা এদের আধুনিক যন্ত্রপাতির কায়দা শেখাই, নানারূপ উপদেশ দিই, কিন্তু এত সত্ত্বেও এরা তাদের সনাতন সিঁদ-কাটাই বেশী পছন্দ করে। এদের আমরা নির্দ্ধারিত বাটীর ঘরের দুয়ার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিই, এমন কি জানলার বাইরে থেকে বামালও (বিশেষ বিশেষ বাক্স বা পেটরা আদি) অনেক সময় দেখিয়ে দিই। চুরির সময়, সুযোগ এবং প্রণালী সম্বন্ধেও এদের আমরা শিক্ষা দিতে থাকি। শেষের দিকে হুজুর, আমি অনেকটা "জাত-শেয়ানাদের" মতই হয়ে উঠি। আমার সব কিছু ভয় ডরও দূর হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে সপ্তাহভোর, কখনও কখনও দুই-তিন সপ্তাহ, আমার অপকার্য্যে, হুজুর, জানি না কেন, মন আসে না। আমি তখন ধার (কর্জ্জ) করে, কখনও বা ফিরি করে জীবিকা নির্ব্বাহ করি। এই সময় আমার প্রায়ই অনুতাপ আসে, মনে হয় আমি কি ছিলাম, কি'ই বা হলাম। মনের মধ্যে নানাপ্রকার ভয়েরও উদ্রেক হয়। বন্ধুরা ডাকতে এসে, গাল দিয়ে ফিরে যায়, আমি তাদের সঙ্গ নিতে রাজী হই না। কিন্তু কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন আমার মধ্যে অপকর্ম্মের হিক্কা বা হিঙ্গা (ইচ্ছা) ফিরে আসে। ভয় ডরও আমার বিদূরিত হয়। আমি তখন নিজে থেকেই দলের লোকেদের খুঁজে বার করে অপকর্ম্মে লিপ্ত হই। হাঁ, হুজুর, তাই হবে। আপনারা যাকে অপস্পৃহা বলেন তাকেই আমরা বলি "হিক্কা বা হিঙ্গা"। দেশবালিরা এ'কে বলে দিল্। এই "হিক্কা বা হিঙ্গা বা দিল্" আনবার জন্য আমরা মদ খাই। এই হিক্কা বা হিঙ্গা বা দিল্ না আসা পর্য্যন্ত আমাদের যেন কেমন ভয় ভয় করে, মনে যেন আমরা কোনও জোর পাই না। তা ছাড়া কেমন যেন একটা আলিস্যি আলিস্যি ভাব আসে, কোথায় বেরুতেও ইচ্ছে করে না;

হাঁ, বলি শুনুন, আমার হুজুর, এই "হিক্কা বা হিঙ্গা" কেবল রাত্রিকালেই আসে, আমার মধ্যে সেটা কখনও দিবাভাগে আসে নি। আমাদের কেউই দিনের বেলা চুরি করে না, করতে পারেও না। কিন্তু এমন চোরও আছে যাদের এই হিঙ্গা হিক্কা কেবলমাত্র দিবাভাগেই আসে। এই জন্যে দিনের চোর এবং রাত্রের চোরের দলও হয় বিভিন্ন। সুরু থেকেই আমি রাত্রিতে চুরি করে এসেছি, কারণ আমার ওস্তাদ ছিল রাত্রের চোর। এই জন্যেই আমার চুরির হিক্কা বা হিঙ্গা রাত্রে আসে কিংবা আমার মধ্যে রাত্রের হিক্কা (স্পৃহা) আছে বলে আমি রাত্রে চুরি করি, তা আমি বলতে পারি না। দলে মোদের হুজুর ছয় বা সাতের বেশী আমরা লোক নিই না। বেশী লোক নিলে, আত্মগোপনের অসুবিধা হয়, তা ছাড়া হিস্যায় বা ভাগেও কম পড়ে। এর পূর্ব্বেও বাবু, আমি ধরা পড়েছি। সকলে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, কি করে আমি চুরি করলাম, কিন্তু 'আমি কেন এবং কি করে চোর হলাম,' এ কথা আমায় কেউই জিজ্ঞেস করে নি। আপনার মিষ্টি কথা আজ আমায় অভিভূত করে দিচ্ছে, মনে পড়ছে আজ আমার গাঁয়ের কথা, আমার মা বেনের কথা। গত বিশ বছর তাদের কোনও খোঁজই নেই নি। আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে হুজুর, এবারের মত আমায় রেহাই দিন। আমি আর কখনও অপকর্ম্ম করব না। আমি হুজুর দেশে চলে যাব। আমাকে আপনারা গাঁয়ে পাঠিয়ে দিন।"

অপরাধীদের অপরাধী হওয়ার কাহিনী, সব সময়ই যে এরূপ করুণ হয়ে থাকে, এমন কথা মনে করবার কোনও কারণ নেই, বরং অধিক ক্ষেত্রে অপরাধীরা স্বইচ্ছাতেই অপরাধী হয়, তবে তা তারা একদিনে হয় না, এবং কার্য্যগতিকে ও অবস্থাক্রমেই তা তারা হয়ে থাকে। উপরের বিবৃতিটী যদি সত্য হয় ত আমরা অপরাধ স্পৃহাকে দিবাস্পৃহা ও রাত্রস্পৃহা

এই দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি। আমার মতে বিবৃতিটী সত্য বলেই মনে হয়, কারণ আমরা এখনও পর্য্যন্ত এমন একটীও প্রকৃত বা পেশাদার চোর পাই নি, যে কিনা দিন এবং রাত্রি এই উভয় সময়েই চুরি করেছে, বরং দিনের চোরদের রাত্রে এবং রাত্রের চোরদের দিনে এখনও চুরি করতে দেখা যায় নি। চোরদের সম্বন্ধে এই কথাটী বিশেষরূপে বলা চলে। তবে এমন কতকগুলি চোর থাকলেও থাকতে পারে যারা কিনা রাত্রি এবং দিন এই উভয়কালেই চুরি করতে সক্ষম। যদি এরূপ কোনও চোরদলের অস্তিত্ব থাকে তা তারা উপরোক্ত দিন ও রাত্রি চোর হ'তে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন প্রকৃতিরই অপরাধী হবে, অন্ততঃ আমি এরূপ মনে করি। এখন প্রকৃতপক্ষে দিন ও রাত্রি চোরদের এই "দিন ও রাত্রি স্বভাব" অভ্যাসগত ভাবে আসে, প্রকৃতিগত ভাবে আসে, কিংবা বিভিন্ন রকম অপস্পৃহার জন্যে তারা ঐরূপ হয় তা বলা বড় শক্ত। এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

দৈব-অপরাধীদের ন্যায় দৈব-বেশ্যাও দেখা যায়। দৈব-বেশ্যাদের মধ্যে অনেকেই আবার অবস্থা বিপর্য্যয়ে অভ্যাস-বেশ্যা হয়ে উঠে। তবে তা তারা একদিনে হয় না, ধীরে ধীরে হয়। অনেকে সাধারণ রূপ-জীবিনীর পর্য্যায়ে নেমে আসে বাধ্য হয়ে। ভিন্নরূপ অবস্থায় যারা সৎ ও সতী হ'তে পারত, তারাই অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্যে অসৎ ও অসতী হয়। নিম্নের স্বীকারোক্তিটী প্রণিধান যোগ্য।

"আমার বাস ছিল বাঙ্গালার এক দূর গ্রামে। তের বছর বয়সে এক আটান্ন বছর বয়স্ক লোকের সঙ্গে আমার সাদি হয়। চোদ্দ বছর বয়সে আমি ঘরে আসি। আমার দেবরের বয়স তখন ষোল। বর্ষীয়ান গুরুজনদের সান্নিধ্য এড়িয়ে, সমবয়স্ক বিধায়, আমার দেবরের সঙ্গই আমি কামনা করতাম, আমাদের দুজনের মধ্যে একটা নিষ্পাপ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে।

একদিন এক চাঁদনি রাতে শানের ঘাটের বকুল গাছটার তলায় ছু'জনে বসে ছিলাম। হঠাৎ আমার দেবর আমাকে তার বুকের কাছে টেনে নিল, প্রতিবাদ করে উঠে দাঁড়ালাম, পিছন ফিরে দেখি আমার সোয়ামী। চুলে ধরে তিনি আমাকে পদাঘাত করলেন, কত অনুনয় করলাম, কাঁদলাম, কিন্তু বাড়ী ঢুকতে পেলাম না। বাড়ী বাড়ী ঘুরলাম, কিন্তু কেউ আশ্রয় দিল না, গুণধর দেবরেরও দেখা মিলল না। 'গাঁয়ে-ঠেলা' মানদা মাসী কখনও কখনও গাঁয়ের শেষ সীমানায় এসে থাকত। এইদিন কলকাতা হ'তে সে বুড়ী ঝিমাকে দেখতে এসেছিল। আদর করে সে আমাকে কলকাতায় নিয়ে আসে। আত্মরক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। বাপ মাকে চিঠি লিখলাম, উত্তর পেলাম না। প্রথম প্রথম বাড়ীওয়ালীর পেটেই আমার আয় যেত। শেষে চালাক হলাম, লোক চিনতেও শিখলাম, কিন্তু তদ্দিনে আমি সব হারিয়ে ফেলেছি। সমাজ আমার আশ্রয় দেয় নি। যাকে আশ্রয় করে একনিষ্ঠ হ'তে চেয়েছি, সেই আমাকে ঠকিয়ে সরে গেছে, সমাজ তাকে কেড়ে নিয়েছে, আমাকে অবহেলা করে; আমার সর্ব্বনাশকদের সুযোগ দিয়েছে, কিন্তু আমাকে দেয় নি। তাই সমাজের ভাল ভাল ছেলেদের নষ্ট করে আমি আনন্দ পাই। তাদের দেখলেই আমার প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠে। এইভাবে আমি সমাজের উপর প্রতিশোধ নি। নেকাপড়াও শিখেছি, এতে আমার ব্যবসার সুবিধে হয়।"

আমার বিশ্বাস সুযোগ ও সুবিধা দ্বারা এই দৈব ও অভ্যাস অপরাধী ও বেশ্যাদের আবার সমাজের মধ্যে ফিরিয়ে আনা খুবই সহজ। কিন্তু স্বভাব-অপরাধী ও স্বভাব-বেশ্যাদের সম্বন্ধে সেই কথা বলা যায় কি? পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের এক জায়গায় বলেছি, ঔষধাদি দ্বারা মানবের এই আদিম-বৃত্তি জাগ্রত করা যায়। তাই যদি হয় ত অন্য কোনও ঔষধাদি দ্বারা তাদের এই স্বভাব-বৃত্তির নিবৃত্তি হয় কিনা—এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান কর

উচিত। পূর্ব্বাপর সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করলে এই অপরাধী ও বেশ্যাদের প্রতি আমাদের ঘৃণা আসে না, আসে সহানুভূতি। তাদের জন্যে আমাদের কি কিছুই ভাববার বা করবার নেই ?

[অপরাধীদের ন্যায় অনেক নিরপরাধী ব্যক্তিকেও উক্তরূপে চারটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যায়। যে সকল ব্যক্তি শ্রেণীগত ভাবে কিংবা স্ব স্ব পেশার খাতিরে সচরাচর অপরাধীদের সংস্পর্শে আসে তাদেরই উক্তরূপে বিভক্ত করা চলে। পুলিশ ও উকিলগণ কার্য্যগতিকে প্রত্যহই অপরাধীদের সংস্পর্শে আসে। এই জন্য আমরা যেমন, স্বভাব, মধ্যম, অভ্যাস ও দৈব উকিল দেখতে পাই, তেমনি আমরা স্বভাব, মধ্যম, অভ্যাস ও দৈব পুলিশও দেখি (?)। স্বভাব-উকিলেরা অপরাধীদের 'ডিফেণ্ড' করার (পক্ষ সমর্থনের) মধ্যে বিশেষ উত্তেজনা ও আনন্দ পেয়ে থাকেন, এমন অনেক স্বভাব-উকিল আছেন, যাঁরা কি'না বিনা পয়সাতেও চোরদের সাহায্য করেন ; আদালতে তাদের মামলাও তাঁরা বিনা পয়সায় লড়েন। অনেক সময় অপরাধীরাও এই সব উকিলদের খুঁজে বার করে তাদের মাসিক মাহিনায় উপদেষ্টা নিযুক্ত করেছে। তাঁদের তখন কাজ হয়, চুরির আগে ও পরে চোরদের পরামর্শ ও উপদেশ দেওয়া। এই ভাবে এঁরা এদের অপস্পৃহার নিষ্কাশন ঘটিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন এবং সেই সঙ্গে নিরপরাধও থেকে যান ; ভাগ্যক্রমে এই সকল উকিলরা অপরাধী না হয়ে উকিল হয়েছেন মাত্র। কোনও এক অফিসারের কাছে শুনেছিলাম, বাড়ীতে চুরি হওয়ার পর ফরিয়াদি থানায় এসে এজাহার না দিয়ে যদি উকিলের খোঁজে বার হন এবং উকিল সঙ্গে করে তবে থানায় আসেন তাহলে বুঝতে হবে যে ফরিয়াদির নালিশটী সর্ব্বৈব মিথ্যা ও সাজান, এই বিশেষ বাক্যটী এই ধরণের উকিলদের উপরেই প্রযোজ্য। সাধারণতঃ

স্বভাব ও মধ্যম উকিলদের আমরা ফৌজদারী কোর্টে, এবং অভ্যাস উকিলদের ফৌজদারী ও দেওয়ানীতে আমরা প্র্যাকটিশ করতে দেখি।

দৈব-উকিলেরা প্রায়ই প্র্যাকটিশ করে না, এঁরা প্র্যাকটিশে অকৃতকার্য্য হয়ে শেষ বরাবর ফার্ম বা ব্যাঙ্কের ম্যানেজারী বা অনুরূপ কোনও চাকরী গ্রহণ করেন। তবে এদেশের অধিকাংশ উকিলই সৎ ও সাধু চরিত্রেরই হয়ে থাকেন। অপরাধীদের সহিত বেশ্যাদের সম্বন্ধ চিরন্তন ও শাশ্বত যুগের। প্রকৃত অপরাধীদের বেশ্যা না হ'লে একদিনও চলে না। অনেক সময় বেশ্যা নারীদের জন্যেই বহুবিধ অপরাধ সংঘটিত হয়। অপকার্য্যের জন্যে বেশ্যাগৃহ থেকে যাত্রা করে তারা লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ বেশ্যাগৃহেই ফিরে আসে এবং সকাল না হওয়া পর্য্যন্ত সেইখানে অপেক্ষা করে। তা ছাড়া বেশ্যা এদের কাছে মাদক দ্রব্যের ন্যায়ই প্রিয়। স্বভাব, অভ্যাস ও দৈব বেশ্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হয়েছে; এই সম্বন্ধে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এই উকিল, পুলিশ ও বেশ্যা ছাড়া আরও কয়েকটী পেশা বা বৃত্তি আছে, যে সকল পেশা ও বৃত্তিতে অপরাধী হবার সুযোগ ও সুবিধা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্যবসায়ী ও সৈনিকদের কথা বলা যায়। যুদ্ধের সময় সৈন্যগণ এবং ব্যবসাক্ষেত্রে ব্যবসায়িগণ লোভ বশতঃ যে কোনও মুহূর্ত্তে অপরাধী হ'তে পারে এবং হয়েও থাকে। এই ব্যবসায়িগণ যেমন স্বভাব, অভ্যাস ও দৈব ব্যবসায়ী হয়, সৈনিকেরাও তেমনি স্বভাব, অভ্যাস ও দৈব সৈনিক হ'লেও হ'তে পারে। এমন অনেক স্বভাব-ব্যবসায়ী আছে, যারা প্রেরণাগত (ইন্‌ষ্টিংট) ভাবে ব্যবসা করে এবং ব্যবসা-ক্ষেত্রের বাইরে অন্য কোনও বিষয়ে তাদের বুদ্ধি একেবারেই খেলে না, এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের নির্ব্বোধের মতই মনে হয়। আদিম-মানুষ, স্বভাব-বেশ্যা ও স্বভাব-সৈন্য অপরাধীদের নিকট আত্মীয়

বলা যেতে পারে। এই কারণে এই ত্রিবিধ ব্যক্তিদেরই আমরা উল্কি ধারণ করতে দেখি। অপরাধী, আদিম-মানব ও সৈন্যগণই সাধারণতঃ উল্কি ধারণ করে। এ সম্বন্ধে অবশ্য জোর করে কোনও কথা বলা চলে না, কেন না অনেকে আবার খেয়াল মত বা সখ মেটাবার জন্য উল্কি ধারণ করেন, কিন্তু পরে এজন্য এঁরা অনুতপ্ত হন, এবং সেই উল্কি উঠানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন, তা ছাড়া এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

এই সকল উকিল এবং ব্যবসায়ীআদির ন্যায় এমন অনেক সাহিত্যিকও আছেন, যাঁরা কি'না চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁদের বাড়তি অপস্পৃহার নিস্ক্রমণ ঘটিয়ে থাকেন এবং এইরূপে কোনও রকমে নিজেদের নিরপরাধী রাখতে সক্ষম হন। এঁরা প্রায়ই এঁদের নায়ক-নায়িকাদের দ্বারা নানারূপ অপরাধমূলক কাজ করিয়ে নিজেদের অপরাধ স্পৃহার উপশম ঘটান। অপরাধ-সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা, আলোচনা, লেখা চিন্তা ও স্বপ্নের মধ্য দিয়ে অনেক অপরাধ-মুখী ও নিরপরাধ ব্যক্তি এরূপে প্রতিদিন নিজেদের বাড়তি অপরাধ স্পৃহার নিষ্কাশন ঘটিয়ে নিজেদের নিরপরাধী রাখতে সক্ষম হন। এইভাবে প্রতিদিন আমরা যে সব অপস্পৃহা, বাক্-প্রয়োগ, কুসঙ্গ, প্রলোভন প্রভৃতি দ্বারা সংগ্রহ করি তা আমরা উপরোক্তভাবে নিষ্কাশিত করে দিয়ে, অপস্পৃহা উপশম ঘটিয়ে, নিরপরাধী থাকি। এই একই কারণে যে সকল পুরাণো চোর পুলিশের "ইনফরমার" হয়, তাদের অনেকেই আর চৌর্য্য কার্য্যে হাত দেয় না। বহুদিন ইনফরমারী করার পর, ইচ্ছা সত্বেও তারা অপরাধ করতে পারে না। এদের অপস্পৃহা উক্তরূপ পৃথক ও ভিন্নরূপ প্রণালী দ্বারা নিষ্কাশিত হয়ে যাওয়ায় তারা নিরপরাধী থাকে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমি সত্যকার, বিশ্বাসী বা সাচ্চা ইনফরমারের কথা

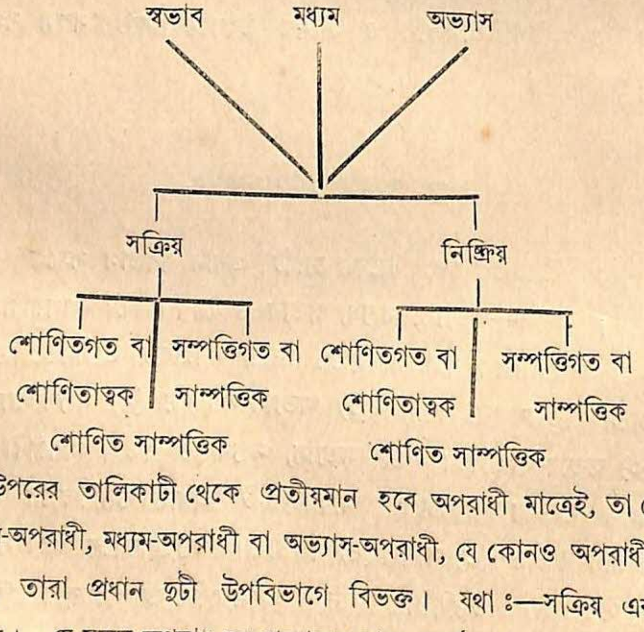
বলছি, যে সকল ইনফরমার দুই দিকে কাটে, তারা সত্যকার ইনফরমার নয়। তারা ইনফরমার (প্রাইভেট গোয়েন্দা) হয়, তাদের অপকর্ম্মের সুবিধার জন্য, একদিক দিয়ে যেমন তারা শত্রুমিত্রকে ধরিয়ে দেয়, তেমনি অপর দিকে তারা নিজেরাই আবার অপকর্ম্ম করে; এদের প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে পুলিশকে কিছুটা খুসী করে নিজেদের অপকর্ম্মের সুবিধে করে নেওয়া। এরা ধরিয়ে দেয় বিপক্ষ-পক্ষীয়দের, দলের কাউকে এরা কখনও ধরায় না। আসলে এদের অপরাধ স্পৃহা চিরাচরিত প্রণালী বা চিন্তার মধ্যেই প্রবাহিত থাকে। কিন্তু এই সকল ইনফরমারদেরও আবার কিছু দিন ইনফরমারি করার পর অপকর্ম্মে বিমুখ ও বীতশ্রদ্ধ হ'তে দেখা গেছে। এই সকল ইনফরমার চোরদের নিরপরাধ হওয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমি বহু পুরাণো চোরকে ইনফরমার বানিয়ে, উপরোক্তভাবে অপরাধীদের নিরপরাধ করা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করি। আমার মতে মধ্যম অপরাধীদের চিকিৎসা উপরোক্তরূপেই করা উচিত। স্বভাব-অপরাধীদের চিকিৎসা করা উচিত স্নায়ুর উপর কার্য্যকরী বিশেষ ঔষধের সাহায্যে, তাছাড়া স্বভাব-অপরাধীদের কোষ্ঠ পরিষ্কার ও ঘুমের ঔষধের প্রয়োজনও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। স্বভাব-অপরাধীদের চিকিৎসা কোনও কোনও বিষয়ে কতকটা পাগলের চিকিৎসারই অনুরূপ হয়। অভ্যাস-অপরাধীদের বিপরীত শিক্ষা দীক্ষা ও পরিবেশের মধ্যে এনে সাজেস্‌সন বা বাক্-প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করা বিশেষ প্রয়োজন; এমনিভাবে (পর-বাক্-প্রয়োগের দ্বারা) তাদের স্ববাক্-প্রয়োগে সক্ষম করে তাদের অতি সহজেই নিরপরাধী করা যায়। অপরাধী রোগীদের চিকিৎসা করা উচিত চিত্ত-বিশ্লেষণের দ্বারা; ঔষধাদির দ্বারাও তাদের চিকিৎসা করা যায়।

অপরাধী মাত্রেরই চিকিৎসার পূর্ব্বে চিকিৎসকের দেখা উচিত, অপরাধী বিশেষের কোন দৈহিক রোগ আছে কিনা, তাদের কোষ্ঠ কিরূপ পরিষ্কার আছে, এবং তাদের চক্ষু কর্ণ নাসিকা ও দন্তের অবস্থাই বা কিরূপ। তাদের এই সকল দৈহিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করার পর মানসিক চিকিৎসায় হাত দিলে তবেই সুফল ফলবে বলে আমি মনে করি। অপরাধীদের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদে এই সকল চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করা যাবে। এ স্থলে অপরাধ-চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছুটা আভাষ দেওয়া হ'ল মাত্র। এইবার অপরাধীদের উপরিভাগগুলি ও তাদের উৎপত্তির কারণ সকল সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্।

অপরাধ-বিভাগ

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে অপরাধীদের চারটি প্রধান বিভাগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। যথা:—অভ্যাস, মধ্যম, স্বভাব ও দৈব। দৈব-অপরাধীদের প্রকৃত অপরাধীরূপে ধরা না হ'লে প্রকৃত অপরাধীরা প্রধানতঃ তিনটী বিভাগে বিভক্ত হয়, যথা:—(১) অভ্যাস-অপরাধী (২) মধ্যম-অপরাধী ও (৩) স্বভাব-অপরাধী। এই অভ্যাস, মধ্যম ও স্বভাব অপরাধী রূপ প্রত্যেক অপরাধ বিভাগকেই আবার দুটি প্রধান উপবিভাগে ভাগ করা যায়, যথা:—(১) সক্রিয় (২) নিষ্ক্রিয়। অনুরূপভাবে এই সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়রূপ উপবিভাগ দুটীর প্রত্যেকটিকেই আবার তিনটী করিয়া উপবিভাগে ভাগ করা যায়, যথা:—(১) শোণিতাত্মক (২) শোনিত সাম্পত্তিক ও (৩) সাম্পত্তিক। অপরাধীদের মূল বা প্রাথমিক বিভাগগুলি করা হয়েছে মাত্রানুযায়ী অর্থাৎ অপস্পৃহার ছাত্রানুযায়ী

কাউকে বলা হয়েছে অভ্যাস-অপরাধী, কাউকে বলা হয়েছে মধ্যম-অপরাধী, কাউকে বা বলা হয়েছে স্বভাব-অপরাধী। অন্যদিকে তাদের উপবিভাগগুলি সৃষ্ট হয়েছে গুণানুযায়ী অর্থাৎ গুণানুসারে, কাউকে বলা হয়েছে সক্রিয়, কাউকে বা বলা হয়েছে নিষ্ক্রিয়। এই সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় অপরাধীরাও আবার তাদের বিশেষ বিশেষ স্পৃহা বা প্রবৃত্তি অনুযায়ী (১) শোণিতাত্বক (২) শোনিতসাম্পত্তিক (৩) ও সাম্পত্তিক আদি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। তালিকাটি থেকে বিষয়টী ভালরূপে প্রতীয়মান হবে।

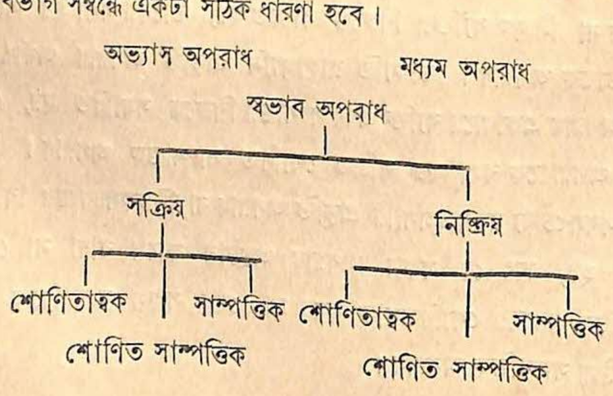


উপরের তালিকাটী থেকে প্রতীয়মান হবে অপরাধী মাত্রেই, তা সে স্বভাব-অপরাধী, মধ্যম-অপরাধী বা অভ্যাস-অপরাধী, যে কোনও অপরাধীই হোক, তারা প্রধান দুটী উপবিভাগে বিভক্ত। যথা :—সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়। যে সকল অপরাধ বল-প্রয়োগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল অপরাধ সক্রিয় অপরাধ। যেমন রাহাজানি, খুন, জখম, বলাৎকার, ডাকাতি প্রভৃতি। যে সকল অপরাধ দরজা ভেঙ্গে, সিঁদ কেটে বা

বল-প্রয়োগের দ্বারা সমাধিত হয়, সেই সকল অপরাধও সক্রিয় অপরাধের পর্য্যায়ভুক্ত। এই কারণে সবল চৌর্য্য অপরাধও সক্রিয় অপরাধ। এক কথায় যে সকল অপরাধের জন্য কম বেশী দৈহিক বলের প্রয়োজন হয়, সেই সকল অপরাধ সক্রিয় অপরাধ। প্রথম ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করা হয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করা হয় বস্তুর বিরুদ্ধে—উভয় ক্ষেত্রেই বল প্রয়োগ করা হয়, এই জন্য উভয় অপরাধকেই বলা হয় সক্রিয় অপরাধ। অন্য দিকে সহজ-চৌর্য্য বা হাউস থেপ্ট, শঠতা, 'পিক-পকেট' প্রভৃতি, সবল-চৌর্য্য, বিষপ্রয়োগ, অগ্নিপ্রদান, ব্যভিচার প্রভৃতি দুষ্কার্য্য, যা ব্যক্তি বা বস্তুর বিরুদ্ধে গোপনে এবং বিনা বলপ্রয়োগে সাধিত হয় সেই সকল অপরাধকে আমরা নিষ্ক্রিয় অপরাধ বলি।

এই সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উভয়বিধ অপরাধীরাও আবার তিনটী করে উপবিভাগে বিভক্ত। যথা :—সক্রিয় শোণিতাত্বক, সক্রিয় শোণিত সাম্পত্তিক, সক্রিয় সাম্পত্তিক। এবং নিষ্ক্রিয় শোণিতাত্বক, নিষ্ক্রিয় শোণিত সাম্পত্তিক ও নিষ্ক্রিয় সাম্পত্তিক। প্রথমে সক্রিয় অপরাধের উপরোক্ত উপবিভাগত্রয় সম্বন্ধে বলা যাক। খুন, জখম, বলাৎকার প্রভৃতি অপরাধ যা নিছক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাধিত হয়, তাদের বলা হয় সক্রিয় শোণিতাত্বক অপরাধ। ডাকাতি রাহাজানি প্রভৃতি অপরাধ অর্থাৎ যে সকল অপরাধ একাধারে ব্যক্তি এবং সম্পত্তির বিরুদ্ধে সমাধিত হয়, সেই সকল অপরাধকে বলা হয় সক্রিয় শোণিত সাম্পত্তিক অপরাধ। অন্য দিকে সবল-চৌর্য্য বা বার্‌গলারি প্রভৃতি অপরাধ যা নিছকসম্পত্তির বিরুদ্ধে সাধিত হয়, এবং যে সকল অপরাধ অনুষ্ঠান কালে বাধা না পেলে অপরাধীরা অপরের শোণিতপাত করে না, সেই সকল অপরাধকে বলা হয় সক্রিয় সাম্পত্তিক অপরাধ।

সক্রিয় অপরাধীদের উপবিভাগ সম্বন্ধে বলা হ'ল। এখন নিষ্ক্রিয় অপরাধীদের উপবিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। নিষ্ক্রিয় অপরাধীরাও যে অনুরূপভাবে তিন ভাগে বিভক্ত তা পূর্ব্বেই বলেছি :—যথা নিষ্ক্রিয় শোনিতাত্বক অপরাধ, নিষ্ক্রিয় শোণিত সাম্পত্তিক অপরাধ এবং নিষ্ক্রিয় সাম্পত্তিক অপরাধ। বিষপ্রয়োগ, গৃহদাহ প্রভৃতি অপরাধকে আমরা পুস্তকের ৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত কারণে নিষ্ক্রিয় শোণিতাত্বক অপরাধ বলি। বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের ৯৫ পৃষ্ঠায় শোণিতাত্বক শব্দের প্রকৃত অর্থ দেখুন। নিষ্ক্রিয় রাহাজানি বা ড্রাগিং কেস প্রভৃতি যাতে অপরাধীরা মানুষকে বিষপ্রয়োগ দ্বারা হত্যা বা অবচেতন করে সম্পত্তি অপহরণ করে, সেই সকল অপরাধকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় শোণিত সাম্পত্তিক অপরাধ। এই বিশেষ ক্ষেত্রে দৈহিক বলের প্রয়োগ হয় না—অর্থাৎ কি'না বল প্রয়োগ না করেও মানুষের মৃত্যু ঘটান যায়। অন্যদিকে সরল-চৌর্য্য বা পিক-পকেট এবং সহজ-চৌর্য্য বা হাউস থেপ্ট প্রভৃতিকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় সাম্পত্তিক অপরাধ। এরা কখনও বল প্রকাশ করে না বাধা পেলেও না। শোণিতপানেচ্ছা (প্রবন্ধের শেষাংশ দেখুন) এদের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে সুপ্ত থাকে। এইবার পরবর্ত্তী তালিকাটী দেখলে, অপরাধীদের উপবিভাগ সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা হবে।



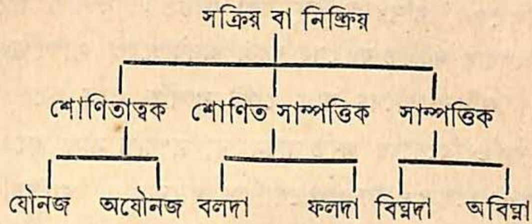
এই শেষোক্ত উপবিভাগগুলির অর্থাৎ সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়—শোণিতাত্বক, শোণিত সাম্পত্তিক এবং সাম্পত্তিক অপরাধীরাও আবার দুটী করে উপবিভাগে বিভক্ত জলে মনে হয়। যেমন সক্রিয় শোণিতাত্বক অপরাধীদের দুটী ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা:—যৌনজ ও অযৌনজ। যারা খুন জখম করে তাদের সক্রিয় অযৌনজ শোণিতাত্বক অপরাধী এবং যারা বলাৎকার (রেপ্) প্রভৃতি করে থাকে তাদের সক্রিয় যৌনজ শোণিতাত্বক অপরাধী বলা যেতে পারে। ডাকাতি প্রভৃতি যে সকল শোণিত সাম্পত্তিক অপরাধ পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে দেখা যায়, কোনও কোনও অপরাধী কেবলমাত্র আঘাত হানে, কেউ কেউ এক সঙ্গে আঘাত হানে ও সম্পত্তি আহরণ করে; কেউ কেবলমাত্র সম্পত্তি আহরণ করে, কেউ আবার নারীর উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়। যারা নারীর উপর অত্যাচার করে, তাদের প্রায় সম্পত্তির দিকে ঝোঁক থাকে না। হিংসাবৃত্তি, চৌর্য্যবৃত্তি ও কামবৃত্তি প্রায়ই একসঙ্গে আসে না। চার পাঁচ প্রকার অপরাধী ডাকাতদের দলের মধ্যে দেখা যায়। অনুরূপভাবে নিষ্ক্রিয় শোণিতাত্বক অপরাধীদেরও আবার দুটী ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:—যৌনজ ও অযৌনজ। যারা বিষপ্রয়োগ, গৃহদাহ প্রভৃতি করে, তাদের বলা যেতে পারে নিষ্ক্রিয় শোণিতাত্বক অযৌনজ অপরাধী, এবং যারা ব্যভিচার প্রভৃতিতে লিপ্ত হয়, তাদের বলা যেতে পারে যৌনজ নিষ্ক্রিয় শোণিতাত্বক অপরাধী।

সক্রিয় শোণিত সাম্পত্তিক অপরাধীদেরও দুটী ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা:—বলদা এবং ফলদা। যে সকল অপরাধীরা রাহাজানি ডাকাতি প্রভৃতির সময়ে বিনা প্রয়োজনে বলপ্রকাশ করে; তাদের সক্রিয় শোণিতাত্বক বলদা অপরাধী এবং যারা মাত্র প্রয়োজনে

সেই কাজের জন্য বলপ্রয়োগ করে, তাদের সক্রিয় শোণিতাত্মক ফলদা অপরাধী বলা যেতে পারে। অনুরূপভাবে নিষ্ক্রিয় শোণিত সাম্পত্তিক অপরাধীকেও দুটী ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা :—ফলদা এবং বলদা। যে সকল অপরাধীরা সম্পত্তি আহরণের সময়ে বিনা প্রয়োজনে বিষপ্রয়োগ করে, তাদের নিষ্ক্রিয় শোণিতাত্মক বলদা অপরাধী এবং যারা সেই কাজের জন্য মাত্র প্রায়াজনে বিষপ্রয়োগ করে, তাদের নিষ্ক্রিয় শোণিত সাম্পত্তিক ফলদা অপরাধী বলা যেতে পারে।

সক্রিয় সাম্পত্তিক অপরাধীদেরও দুটী উপবিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা :—বিঘ্নদা এবং অবিঘ্না। যে সকল সবল-চৌর্য্যের সময় সবল চোরেরা (বার্গলার) মাত্র দেওয়াল ও তালা প্রভৃতি ভাঙ্গে, কিন্তু মানুষের উপর কখন আঘাত হানে না, তাদের বলা যেতে পারে সক্রিয় "অবিঘ্না" অপরাধী এবং যে সকল চোরেরা প্রয়োজন হলে, তবে আঘাত হানে তাদের বলা যেতে পারে সক্রিয় "বিঘ্নদা" অপরাধী। অনুরূপ নিষ্ক্রিয় সাম্পত্তিক অপরাধীরাও দুইটী ভাগে বিভক্ত হতে পারে। যথা :—বিঘ্নদা এবং অবিঘ্না। যে সকল সহজ (হাউস থীফ) ও সরল (পিক্-পকেট) চোরেরা কোনরূপ বিঘ্নের সৃষ্টি করে না, এমন কি, ধরা পড়লেও যারা আঘাত হানে না, তাদের বলা যেতে পারে নিষ্ক্রিয় সাম্পত্তিক অবিঘ্না অপরাধী। এবং যে সকল চোরেরা আঘাত হানে না বটে, কিন্তু দুয়ারের শিকল টেনে বা দোরের কড়া দড়ি দিয়ে বাঁধে, অর্থাৎ কি না ধরা না পড়ার জন্য নিষ্ক্রিয়ভাবে বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাদের বলা যেতে পারে, নিষ্ক্রিয় সাম্পত্তিক বিঘ্নদা অপরাধী। আমি একজন পিক্-পকেটকে জানতাম যে পালাবার সময় পশ্চাৎ ধাবিত লোকেদের প্রতিরোধ করার জন্য ডাষ্টবিন্ প্রভৃতি উল্টে দিয়ে পথরোধ করত। অবশ্য এই সকল উপবিভাগ এবং সেই

উপবিভাগীয় অপরাধীদের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমি এখনও অনুসন্ধান করছি। এবং সত্য-নিরুপণার্থে আরও সাক্ষ্য প্রমাণ ও তথ্যাদির প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। এইবার নিম্নের তালিকাটী অনুধাবন করলে বিষয়টী সম্যকরূপে উপলব্ধি হবে।



এইবার এই "শোণিতাত্বক" শব্দটীর প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে কিছু বুঝিয়ে বলা যাক। মানুষের স্বভাবগত শোণিত পানেচ্ছা থেকেই খুন জখম প্রভৃতি সক্রিয় এবং বিষ-প্রয়োগ আদি নিষ্ক্রিয় অপরাধের স্পৃহা মানুষের মধ্যে আসে। মনস্তত্বের দিক থেকে, শোণিত দর্শন শোণিত পানের প্রকারভেদ মাত্র। এই শোণিত পান জীব জগতের আদিম স্পৃহা। অধুনাকালে শোণিত পানেচ্ছা, শোণিত দর্শন ইচ্ছায় পরিণত হয়েছে। নিষ্ক্রিয়-অপরাধীদের মধ্যে বিষপ্রয়োগ বা গৃহদাহ শোণিতাত্বক অপরাধ। বিষ-প্রয়োগের দ্বারা হত্যা করলে সব সময় রক্ত ক্ষয় হয় না। এক্ষেত্রে অপরাধী-কল্পনায় শোণিত দর্শন বা পান করে। এই সব কল্পনা, দর্শন বা পান অবচেতন মনের সাথী। খুন করার পর অনেক সময় খুনি-বিশেষের চিত্ত-বিহ্বল ঘটে। তখন সেই খুনি, খুনের পরও ঘটনাস্থলে বিপদ বরণ করেও কখনও কখনও উপস্থিত হয়। সুপ্ত শোণিত পান ইচ্ছাই তাদের এরূপ ব্যবহারের কারণ। বলাৎকারও শোণিতাত্বক অপরাধ। এই জন্য এই

সকল অপরাধের সঙ্গে দংশন, আঘাত প্রভৃতি অপরাধও সংঘটিত হয়। প্রায় দেখা যায় ডাকাতি ও খুনের ন্যায় বলাৎকার ও খুনও এক সঙ্গে সাধিত হয়। গৃহদাহ দ্বারা সকল সময় ব্যক্তির প্রাণনাশ হয় না। সম্পত্তিই অধিকাংশ স্থলে বিনষ্ট হয়। কিন্তু তবুও গৃহদাহকে শোণিতাত্মক অপরাধ বলি কেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। সম্পত্তি লাভের জন্য যে সকল অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় সেই সকল অপরাধকেই সাম্পত্তিক অপরাধ বলা হয়। অগ্নি-সংযোগের দ্বারা কেউ সম্পত্তি লাভ করে না। এ দ্বারা সে ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি সাধন বা সম্পত্তি নাশ করে। এরূপ ক্ষতি সাধনের মধ্যেও থাকে সুপ্ত শোণিত পানেচ্ছা। ব্যভিচার সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যায়। এজন্য গোপনে গৃহদাহ, বিষপ্রয়োগ, ব্যভিচার প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় অপরাধকেও শোণিতাত্মক অপরাধ বলা হয়। সুপ্ত শোণিত পান বা দর্শন ইচ্ছার জন্যই মানুষ এই সব দুষ্কার্য্য করে থাকে। এজন্য অপরাধ বিশেষের মধ্যে কোনও যুক্তি পরিলক্ষিত হয় না। এ বিষয়ে কয়েকটী ভারতীয় উদাহরণ দিতেছি। "আলিগড়ে এক সৎ-মা তার সতীন-পুত্রকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে। কারণ সে তার বিরক্তি উৎপাদন করেছিল। ঝাঁসীর এক ব্যক্তি তার এক কন্যাকে হত্যা করে। কারণ মেয়েটী সম্বন্ধে পড়শীরা অ-কথা কু-কথা বলত। তার বিশ্বাস ছিল এরদ্বারা কন্যার রক্ত পড়শীদের মস্তকে নিক্ষিপ্ত হবে (১৮৮৫)। একজন ধাত্রী দুটী পালিত শিশুকে দেশলাই বাক্সের ফস্‌ফরাস খাইয়ে হত্যা করে। উদ্দেশ্য, ডাক্তারের কাছে ঘটনাটী বর্ণনা করার আনন্দ লাভ।" এটা একটী নিষ্ক্রিয় হত্যার দৃষ্টান্ত।

যদি দুই ব্যক্তিতে রাস্তার উপর মারামারি করতে দেখা যায় ত সেই মারামারি দেখার জন্যে বহু লোকেই সেখানে ভিড় করে। মুখে যে যাই বলুক, মনে মনে সকলেই এক অভূতপূর্ব্ব পুলক ও শিহরণ অনুভব করে।

মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শোণিত পান বা দর্শনের ইচ্ছাই যে এর কারণ তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। অনুরূপ ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকরাও প্রথম এক "ভলি" গুলি ছোড়ার পরই ঘুনের নেশায় বিভোর হয়ে উঠে, তখন আর তাদের জ্ঞান থাকে না। যে মুহূর্ত্তে তারা জানতে পারে যে তাদের বর্ষিত গুলি রক্ত দর্শন করেছে সেই মুহূর্ত্ত থেকে তারা রক্ত-পিয়াসী পশু হয়ে উঠে। তাদের ভয়, বিবেক বা মায়া, কোনও কিছুই আর তখন থাকে না, যুদ্ধক্ষেত্র প্রত্যাগত সৈনিকমাত্রই এই কথা বলে থাকেন। এ সম্বন্ধে উদাহরণ স্বরূপ একটী বিশেষ বিবৃতিও নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। বিবৃতিটী নিষ্ক্রিয় শোণিত পান স্পৃহার একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

"আমার কাছে কোনও একটী যুবক ইনফরমারের কাজ করতে আসে। দুই একটী ছোট ছোট কেসের খবর দেওয়ার পর সে একদিন বলে, 'স্যার, একটী লোক তার বাড়ীতে বহু সহস্র টাকা মূল্যের বে-আইনি দ্রব্য রেখেছে।' আমি উৎসাহিত হয়ে তাকে বলি 'তাই নাকি, বেশ বেশ, দাও তাকে ধরিয়ে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে যুবকটী উত্তর দেয়, 'না স্যার, থাকগে। ছেলেটা আমার ছোটবেলাকার বন্ধু। তার মাকে আমি মা বলি, একসঙ্গে খেয়েছি বেড়িয়েওছি—তারা সকলেই আমাকে বিশ্বাস করে, ভালবাসে,—না, স্যার থাক্। আপনাকে আমি এর চেয়েও অনেক ভাল কেস দেব।' উত্তরে আমি বলি, 'দেখ, আমরা উভয়েই ত শাক্ত বংশোদ্ভুত, বলিদানে আমাদের নিঃস্পৃহ থাকা উচিত নয়, দাও লোকটাকে বলি দিয়ে। চোর বধের মধ্যে পূণ্য আছে, পাপ নেই।' আমি এ সম্বন্ধে ছেলেটীকে অনেক বোঝাই, অনেক অনুরোধ করি, কিন্তু সে আমার কোন কথাই শুনে না, এর পর ছেলেটী আরও অনেক ছোট বড় কেস দেয়। শেষে একদিন তার সাহায্যে আমরা মস্ত বড় একটা ষড়যন্ত্রকারীর দলকে ধরে ফেলি। এই বড় কেসটা

ধরাণোর পর তাকে কি রকম একটা ধরার আনন্দ ও নেশায় পেয়ে বসল। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সে বলে উঠল, 'স্তার, আপনারা পারিশ্রমিক দিন বা না দিন, ক্ষতি নেই, আমি আরও অনেক কেস ধরাব। আমার মাথায় যেন কেমন খুন চাপছে। কুছ্ পরোয়া নেই স্তার, চলুন আমার সেই বন্ধুটীকেই ধরিয়ে দি। আজ আমি বাপকেও ধরিয়ে দিতে পারি, ভাইকেও। চলুন, চলুন স্তার, আজই তাকে ধরিয়ে দি।' ছেলেটীর কথায় ও ভাবে আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি। বেশ বুঝতে পারি, তাকে নিষ্ক্রিয় খুনের নেশায় পেয়ে বসেছে। আমি ভয় পেয়ে বলে উঠি—"থাক থাক, আজ থাক, আর একদিন হবে।"

এই বিশেষ স্পৃহার আরও প্রমাণ স্বরূপ বিশেষ বিশেষ কয়েকটী হত্যাকাণ্ডের কথাও বলা যেতে পারে। এই সকল হত্যাকাণ্ডের নায়কগণ হত্যার পর বিপদ বরণ করেও বার বার ঘটনাস্থলে ফিরে এসেছে; অন্তর্নিহিত শোণিত পান স্পৃহাই এর একমাত্র কারণ। এমন অনেক হত্যাকাণ্ড দেখা গেছে, যে হত্যাকাণ্ডে হত্যাকারীকে বিনা কারণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিষ্ঠুর হ'তে দেখা গেছে। অনেক সময় এই সব হত্যাকারীরা নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করেও তৃপ্ত হয় না, তারা অকারণে তাদের অঙ্গচ্ছেদ করে, এমন কি তাদের যৌনদেশও কর্ত্তিত করে দেয়। কলিকাতার "পাগলা হত্যাকাণ্ড" এই মতবাদের একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হত্যাকারী খাঁদা প্রথমে পাগলার বক্ষে ছুরিকাবিদ্ধ ক'রে তাকে হত্যা করে, পরে তার মুণ্ডুটা পর্য্যন্ত কেটে নিয়ে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে। কিন্তু এত করেও সে তৃপ্ত হয় না, সে পুনরায় অকুস্থলে ফিরে আসে, এবং পাগলার গোড়ালির উপরকার শিরা দুটীও কেটে দিয়ে যায়। এ ছাড়া এমন অপরাধীরও কথা শুনা গেছে যে কি'না নারী-বিশেষকে সত্ত সত্ত হত্যা করে তার দেহ উষ্ণ থাকতে থাকতে তার দেহের উপর বলাৎকার করেছে।

এটী একটী অত্যুৎকট সক্রিয় শোনিতাত্বক যৌনজ অপরাধের দৃষ্টান্ত। এই সব ঘটনা বিশেষ থেকে, যৌনজ এবং অযৌনজ, এই উভয় অপরাধীই যে শোণিতাত্বক অপরাধী তা বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। এমন অনেক যৌন-রোগীও দেখা যায়, যারা প্রথমে বেত্রাঘাত দ্বারা উপভোগ্যা নারীর গাত্র হ'তে রক্ত নির্গত করে—এবং এইভাবে রক্ত দর্শন না করলে তাদের মধ্যে যৌনস্পৃহা আদপেই আসে না। ধর্ষণের সহিত নারীর উপর মধ্যযুগীয় উৎপীড়ন ও নির্য্যাতনও মানুষের অন্তর্নিহিত যৌনজ ও অযৌনজ শোণিতাত্বক স্পৃহার একত্র অবস্থিতির অন্য আর এক প্রমাণ। এ ছাড়া মানুষের যৌনসারও তাদের রক্তেরই পরিবর্ত্তিত রূপমাত্র। মানুষের এই শোণিত স্পৃহার অর্থ যে শুধু শোণিত পান তা নয়, শোণিত পাত বা দানও বটে। একটু বুঝিয়ে বলা যাক। রেশ ও জুয়া প্রভৃতিতে লোক সব সময় অর্থলাভের জন্য লিপ্ত হয় নি। একটী বিরাট উত্তেজনা ও নেশাও তাকে পেয়ে বসে, সেই জন্যেই তারা রেশে যায় ও জুয়া খেলে। এই বিশেষ উত্তেজনা ও নেশার মধ্যেও থাকে সুপ্ত শোণিত স্পৃহা, আদিমকালে শোণিত দান ও পানজনিত মানুষ যে উত্তেজনা ও আনন্দ লাভ করত সেই উত্তেজনা ও আনন্দই, বিকৃত ও সুপ্তরূপে, রেশ খেলোয়াড় ও জুয়াড়ীরা লাভ করে থাকে। জুয়াতে যারা জেতে তারা শোণিত পান করে এবং যারা হারে তারা শোণিত দান করে। যুদ্ধে সৈনিকরা যায় শোণিত পান ও সেই সঙ্গে শোণিত দান করতে—এই উভয়বিধ শোণিত স্পৃহাই তাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে। তবে এই সৈনিক ও জুয়াড়ীদের মধ্যে শোণিত পাত বা পানের স্পৃহাই থাকে বেশী। এদের সকলেই চায় জয় করতে বা জিততে, এদের কেউই হারতে চায় না, জুয়াড়ীদের এই শোণিত পান বা দান অত্যধিক নিষ্ক্রিয় ভাবে এবং এই শোণিত সৈনিকদের দান বা পান অত্যধিক সক্রিয়

ভাবে হয়ে থাকে। ব্যভিচার দ্বারা মেয়েরা সল্পাধিক নিষ্ক্রিয় ভাবে শোণিত দান করে। এবং এর দ্বারা পুরুষেরা নিষ্ক্রিয়ভাবে শোণিত পান করে। অনুরূপ ভাবে আত্মহন্তারকরা শোণিত দান করে সক্রিয়ভাবে। যে সকল আত্মহন্তারক ছুরিকা বা পিস্তল দ্বারা আত্মহত্যা করে তা তারা করে এ্যাকৃটিভ্ ভাবে, এবং যে সকল আত্মহন্তারক প্রায়োপবেশন দ্বারা তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করে, তা তারা করে প্যাসিভ্ ভাবে।

এই সহজাত ও স্বাভাবিক শোণিত স্পৃহা মানুষের মধ্যে নানা ভাবে ও নানা উপায়েই বর্ত্তিয়ে থাকে। ধরপাকড় করা এবং অপরাধীদের সাজা দেওয়া শান্তিরক্ষক মাত্রেরই অবশ্যরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু এ সম্বন্ধেও কিছু বলবার আছে। এই ধরপাকড়-জনিত উত্তেজনার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ কোনও কোনও শান্তিরক্ষকদের (পুলিশ-অফিসার) মধ্যে এই শোণিত পান স্পৃহার ক্রমাবির্ভাব ঘটে থাকে। ফলে অফিসার বিশেষ কয়েদি বা আসামীর উপর অকারণে ও অহেতুক ভাবে "ভিন্‌ডিক্‌টিভ্' ক্রুদ্ধ এবং জীঘাংসু হয়ে উঠেন। ফরিয়াদি আসামীকে ধরে এনেছে—উভয়ের কেউই তদন্তকারী অফিসারের শত্রু বা মিত্র নয়, কিন্তু তবুও অফিসার বিশেষকে আসামীর প্রতি অকারণে ক্রুদ্ধ হ'তে দেখা যায়। মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শোণিত স্পৃহার বহির্বিকাশই এর কারণ, উত্তেজনার কারণে এরূপ বহির্বিকাশ ঘটে থাকে। এসব অফিসারদের উচিত স্ববাক্-প্রয়োগ, (বা অটো-সাজেস্‌সন) ও মনো-বিশ্লেষণ দ্বারা তাদের এই স্বভাবজাত স্পৃহাকে সংযত রাখা। সৌভাগ্যক্রমে ভারতীয় পুলিশ স্ববাক্-প্রয়োগ, আত্ম-বিশ্লেষণ ও চিত্ত-প্রস্তুতির দ্বারা, নিজেদের এই স্বাভাবিক শোণিত পান স্পৃহার বহির্বিকাশ সর্ব্বদাই দমন ক'রে তদন্ত-সাপেক্ষ আসামীদের প্রতি সুবিচার করে থাকে এবং ভারতীয় ঊর্দ্ধতন

কর্ম্মচারীরাও পর-বাক্-প্রয়োগ (বা আউটসাইড সাজেস্‌সন) উপদেশ আদি ও বিষয় বস্তুর সবিশেষ পরিদর্শন দ্বারা অধস্তন অফিসারদের এই অবশ্যম্ভাবী শোণিত পান স্পৃহার বহির্বিকাশ প্রারম্ভেই দমন করেন এবং সেই সঙ্গে আত্ম-বিশ্লেষণ ও স্ববাক্-প্রয়োগ দ্বারা নিজেদের সহজাত শোণিত স্পৃহার বিলোপ ঘটান। এই বিশেষ শোণিত পান স্পৃহা পূর্ব্ব বর্ণিত কারণে শান্তিরক্ষকদের অজ্ঞাতেই শান্তিরক্ষকদের মধ্যে বাসা বাঁধে বা বাঁধতে পারে। এই কারণে প্রত্যেক শান্তিরক্ষকদের উচিত প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠে বা শয়নকালে, আত্ম-বিশ্লেষণ দ্বারা নিজেদের ভুল ক্রটীগুলি শুধরে নেওয়া। যে মুহূর্ত্তে তাঁরা তাঁদের অহেতুক প্রবৃত্তি, ইচ্ছা বা ব্যবহারের মূল কারণ সম্বন্ধে অভিহিত বা সচেতন হবেন, সেই মুহূর্ত্তে তাঁরা তাঁদের সচেতন বিবেচনা ও সুবিচারিতা প্রভৃতি স্পৃহা—এবং সেই সঙ্গে তাদের উত্তেজনা-জাত স্বাভাবিক শোণিত পান স্পৃহার বিরোধী-প্রতিরোধ শক্তি তাঁরা ফিরে পাবেন বলেই আমি মনে করি। অনেক সময় মানুষের কর্ম্মগত উন্নতির ইচ্ছা ও অর্থ লাভের আকাঙ্ক্ষাও মানুষের মনের এই সুপ্ত শোণিত পান স্পৃহার বহির্বিকাশ ঘটায়, এ সম্বন্ধে নিরপরাধী ও ভদ্র মানুষমাত্রেই সচেতন থাকা উচিত। যে সকল কারণে মানুষের মধ্যে মূল অপরাধ স্পৃহার আবির্ভাব ঘটে, সেই সকল কারণেই মানুষের অপরাধ স্পৃহার অংশ বা রূপ বিশেষে—এই শোণিত এবং দ্রব্য স্পৃহারও বিকাশ ঘটে থাকে। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদগুলিতে অপরাধ স্পৃহা সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচিত হয়েছে। এ স্থলে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন—নিছক বা উৎকট শোণিতাত্বক অপরাধীদের মধ্যে এই শোণিত পান স্পৃহা অত্যাধিক পরিমাণে থাকে এবং তাদের মধ্যে দ্রব্য বা সাম্পতিক স্পৃহা স্বল্প থাকে বা থাকে না বললেই চলে। শোণিত সাম্পত্তিক অপরাধীদের মধ্যে

প্রায় অর্দ্ধেক থাকে শোণিত স্পৃহা এবং অর্দ্ধেক থাকে দ্রব্য স্পৃহা, এবং সাম্পত্তিক অপরাধীদের মধ্যে অত্যধিকরূপে দ্রব্য স্পৃহা বর্ত্তমান থাকে কিন্তু সেই সঙ্গে অত্যল্প শোণিত স্পৃহাও সুপ্তভাবে থেকে যায়। কারণ দ্রব্য অপহরণের মধ্যে দ্রব্যের অধিকারীর যে ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতি সম্বন্ধেও অপহরণকারীরা সচেতন থাকে। রেশে বা জুয়োয় যারা জেতে তারা যেমন অপরের ক্ষতি করে তেমনি নিজেদের জন্য কিছু অর্থও লাভ করে, এ ক্ষেত্রে এই রেশ খেলোয়াড় ও জুয়াড়ীরা কতকটা শোণিত সাম্পত্তিক স্পৃহার দ্বারা প্ররোচিত হয় কিনা সে সম্বন্ধেও ভেবে দেখা উচিত। এ ছাড়া এমনও হ'তে পরে যে, শোণিতাত্মক অপরাধীদের মধ্যে শোণিত স্পৃহা থাকে ডমিনেণ্ট বা জাগ্রত অবস্থায় এবং দ্রব্য বা সম্পত্তি স্পৃহা তাদের মধ্যে থাকে রিসেসিভ বা সুপ্ত অবস্থায়। অনুরূপ ভাবে শোণিত সাম্পত্তিক অপরাধীদের মধ্যে শোণিতাত্বক এবং সাম্পত্তিক, এই উভয় স্পৃহাই হয়ত জাগ্রত অবস্থায় থাকে বা একই সঙ্গে জাগ্রত হয়, এবং নিছক সাম্পত্তিক অপরাধীদের মধ্যে হয়তো সাম্পতিক স্পৃহা থাকে ডমিনেণ্ট বা জাগ্রত এবং শোণিত স্পৃহা থাকে সব সময়ই রিসেসিভ বা সুপ্ত। মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি অভ্যাস এবং শক্তি অনুযায়ী একটী স্পৃহা সুপ্ত ও একটী স্পৃহা জাগ্রত কিংবা উভয় স্পৃহাই একই সঙ্গে জাগ্রত বা সুপ্ত হয় কি না, এ সম্বন্ধেও ভেবে দেখা উচিত। একই অপরাধ স্পৃহা কোনও সময়ে শোণিত স্পৃহার এবং কোনও সময়ে বা দ্রব্য স্পৃহায় আত্মপ্রকাশ করে কি না তাও বিবেচনার বিষয়। এ সম্বন্ধে বংশানুক্রম বা হেরিডিটি সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে পরে আমরা আলোচনা করব। এর প্রকৃত এবং মূল কারণ সম্বন্ধে অবহিত হ'তে হ'লে আরও তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। তবে শিক্ষা ও অভ্যাসজনিত কোনও অপরাধীরা বরাবরই শোণিতাত্বক

অপরাধী, কোনও অপরাধীরা বরাবরই শোণিত সাম্পত্তিক এবং কোনও অপরাধীরা বরাবরই সাম্পত্তিক রূপেই থেকে যায় বা যেতে পারে, এরূপ আমি মনে করি। শোণিতাত্বক প্রভৃতি শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে বলা হল। এইভাবে আমরা দেখতে পাই, মানুষের অন্তর্নিহিত শোণিত স্পৃহা, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই উভয় প্রকার অপরাধীদের মধ্যেই কমবেশী বর্ত্তমান। সক্রিয় অপরাধীদের মধ্যে সেটা বেশী মাত্রায় এবং জাগ্রত অবস্থায় থাকে এবং নিষ্ক্রিয় অপরাধীদের মধ্যে সেটা কম মাত্রায় এবং সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এই সব কারণে যারা খুনে, তারা ক্বচিৎ কদাচিৎ ডাকাতি বা রাহাজানি প্রভৃতি অপরাধ করলেও করতে পারে, কিন্তু তাদের দ্বারা কখনও বিষ প্রয়োগাদি নিষ্ক্রিয় রাহাজানি বা পিক্‌-পকেট আদি নিষ্ক্রিয় সাম্পত্তিক অপরাধ সকল সংঘটিত হবে না। অন্যদিকে পকেটমার, কিংবা সরল চোরেরা কখনও কোনও প্রকার সক্রিয় শোণিতাত্বক বা সক্রিয় সাম্পত্তিক অপকার্য্যে সংশ্লিষ্ট থাকে না বা থাকতে পারে না। যাদের পকেটমার বলে জানা আছে, তাদের কারুর বিরুদ্ধে যদি রাহাজানি অপরাধের নালিশ আসে তাহ'লে তদন্তকারী অফিসারদের উচিত সেই নালিশ সম্বন্ধে সন্ধিহান হয়ে সবিশেষ তদন্ত দ্বারা তাদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করা।

সাধারণ ভাবে আমরা দেখে এসেছি, পকেটমার, ছিঁচকে চোর প্রভৃতি অপরাধীরা ধৃত হওয়ার কালীন কাকেও কখনও আঘাত হানে নি, কারণ তারা নিষ্ক্রিয় সাম্পত্তিক অপরাধী ; শোণিতপাতে তারা স্বভাবতঃই অনভ্যস্ত। কিন্তু অধুনাকালে কোনও কোনও ক্ষেত্রে পকেটমারদের আত্মরক্ষার্থে ছুরিকাঘাতের কথা শুনা গেছে। এর কারণ সম্বন্ধে এরূপ বলা যেতে পারে, আসলে এই সকল অপরাধীরা থাকে শোণিত সাম্পত্তিক অপরাধী। জনবহুল সহরে সুবিধার জন্যে

এরা পিক্‌-পকেটদের কার্য্যপদ্ধতির অনুসরণ করে, কিন্তু অনভ্যাসের কারণে তারা ধরা পড়ে, এবং ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই, এদের আসল স্বরূপ প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। এরা তখন আত্মরক্ষার্থে ছুরিকা ব্যবহার করে। আসলে এরা পিক্‌-পকেট করে না, এরা করে সক্রিয় রাহাজানি বা রবারি। আজকালকার পিক্‌-পকেটরা সেফটি রেজারের ব্লেড ব্যবহার করে, এরা কখনও ছুরিকা ব্যবহার করে না, এমন কি এরা ছুরিকা সঙ্গেও রাখে না। এ ছাড়া বড় বড় সহরে চণ্ডুখানা, জুয়ার আড্ডা প্রভৃতি স্থান অপরাধীদের ক্লাবঘর বা আড্ডাখানার কাজ করে। এই সব আড্ডায় এবং বেশ্যার গৃহে নিষ্ক্রিয় অপরাধীদের সঙ্গে সক্রিয় অপরাধীদের মেলামেশার সুযোগ ঘটে। একটী বোমারু বা বোমাবর্ষী বিমানকে যেমন বহু পাহারাদার বা ফাইটার প্লেন ঘিরে নিয়ে চলে। তেমনি বন্ধুত্ব বশতঃ একজন নিষ্ক্রিয় পিক্‌-পকেটকে তার দল হ'তে ভাঙিয়ে নিয়ে একজন সক্রিয় অপরাধীর অপকর্ম্মে বহির্গত হওয়াও অসম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে কথিত সক্রিয় অপরাধটী তার নিষ্ক্রিয় বন্ধু অপরাধীটীর পাহারাদারের কাজ করে। এই স্থলে নিষ্ক্রিয় অপরাধীটী ধরা পড়লে সক্রিয় অপরাধীটীর পক্ষে বন্ধুর উদ্ধারের জন্যে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নয়। তবে এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

এইবার সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় অপরাধের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি বিবৃতিমূলক উদাহরণ তুলে দেওয়া যাক। নিম্নের কাহিনীটী "পাগলা হত্যার মামলা" হ'তে তুলে দেওয়া হয়েছে। এটী একটী সক্রিয় শোণিতাত্বক অপরাধের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৯৩৬ সালে ৫ই সেপ্টেম্বরে ঐ হত্যাকাণ্ডটি সাধিত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে কলিকাতা পুলিশ জার্নেল Vol. I. Part I. দ্রষ্টব্য।

বিচারে মূল হত্যাকারী খাঁদার ফাঁসী হয় এবং তার সহকারী হত্যাকারীদের হয় দ্বীপান্তর। খাঁদা আজ আর নেই। কিছুদিন হ'ল মলিনাও গত হয়েছে। কিন্তু উত্তর কোলকাতার ঘরে ঘরে এদের কাহিনী আজও আলোচিত হয়। যে গলিটায় এই হত্যাকাণ্ড সমাধা হ'য়েছিল, জনসাধারণ তার নাম দিয়েছে, গলাকাটা গ'লি। শোণিতাত্মক অপরাধীদের এই কাহিনীটুকু পাঠকদের উপভোগ্য হবে। নিম্নের বিবৃতিটী পড়ে দেখুন।

"হঠাৎ সেদিন দলের নেতা খাঁদা ওরফে খোকা এসে জানাল, জানিস্ একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। ছোট-খাট কাণ্ড আমাদের গা সওয়া, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু ছিল না। তাই ওস্তাদের এরূপ ব্যবহারের কোনও হদিস্ না পেয়ে শুধোলাম, 'কিসের কাণ্ড, কেউ ধরা পড়ল নাকি।' উত্তরে খাঁদা জানাল, "না না, তা নয়। শোন বলি।—কাল মলিনার ঘরে বসেছিলাম, হঠাৎ দেখি দরজার বাইরে পু'লিশ।' উদ্‌গ্রীব হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম "বলিস্ কি রে, তারপর? খাঁদা উত্তরে বলল, 'তারপর? হাঁ, বলছি শোন, মলিনাকে দরজাটা বন্ধ করতে বলে, এক লাফে জানালা গলে, আমি খড়া ব'য়ে রাস্তায় নামি এবং পিছনের সরু গলিটার ভিতর দিয়ে সট্‌কান দিই। আমি চলে আসার পর মলিনা দরজা খুলে দেয়, পুলিশ ভিতরে এসে, কাউকে না পেয়ে অপ্রস্তুত হয়ে চলে যায়। কিন্তু এ সবই পাগলা বেটার কাণ্ড, সেই পুলিশে খবর দিয়েছে।"

"এই পাগলা ছিল, হুজুর! মলিনা সুন্দরীর শিক্ষক। মলিনাকে সে গান শিখিয়েছে। মাঝে মাঝে মলিনার ঘরে এসে সে তবলাও বাজাত। বেচারা মলিনাকে খুবই ভালবাসত, মলিনাও। কিছুদিন আগে হঠাৎ একদিন বে-টাইমে খাঁদা আর আমি মলিনার ঘরে আসি। আমরা

পাগলাকে মলিনার ঘরে বসে থাকতে দেখে অবাক হই। খাঁদা ক্রুদ্ধ হয়ে চেঁচিয়ে উঠে, 'আমি শা, প্রতি মাসে ৩৫০৲ করে টাকা গুণব, আর তুমি শা, তার ফলভোগ করবে। বের, শা, এখান থেকে।' পাগলা বেরিয়ে যেতে যেতে জানিয়ে যায়, 'বেটা, জেলা খারিজ (এক্সটার্নড) গুণ্ডা, কে না জানে তোকে। দাঁড়া, সব কথা থানায় জানিয়ে দিচ্ছি।"

"হাঁ, হুজুর, এ সত্যি কথা। পরে আমরাও শুনেছি, পাগলা থানায় খবর দেয় নি। সে সাহসও তার ছিল না। পুলিশ নাকি আকস্মিক ভাবে সেদিন মলিনার ঘরে হানা দিয়েছিল। কিন্তু, সে যাই হোক, আমাদের হুজুর, ধারণা হয়েছিল যে পাগলাই আপনাদের ঘরে খবর পাঠিয়েছে। আমরা সকলেই পাগলার উপর প্রতিশোধ গ্রহণে মনস্থ করি। আমাদের নেতা খেঁদা ওরফে খোকাবাবুর মতে মলিনার এতে কোনও দোষ ছিল না, কারণ মলিনা, সব সময়ই মলিনা, ও-ত জানা কথা, ও-ত বিশ্বাসঘাতকতা করবেই, কিন্তু পাগলা সব জেনে শুনে পরের ভাগে ভাগ বসায় কেন? এ ছাড়া খাঁদার মতে, পুলিশে এ জন্য খবর দেওয়াটা ছিল তার পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। হন্যে কুকুরের মত এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় তাড়িয়ে নিয়ে আমাদের অতিষ্ঠ করে তুলবে পুলিশের দল, আমরা না পারব বাঁচতে, না পারব জীবনটা ভোগ করতে। এ আমাদের কাছে অসহ্য। সব দিক বিবেচনা করে, আমাদের জীবনের পথের কাঁটা, এই পাগলাকে "ট্যাপ্" করাই মনস্থ করলাম।

চৌঠা সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যার সময় আমরা দশ জন মিলে পাগলাকে সোনাগাছির ভিতর পাকড়াও করি। সে একজন বন্ধুর সঙ্গে পথ চলছিল। খাঁদা পাগলার গলা ধরে হুঙ্কার দিয়ে উঠে, 'জানিস আমি

কে? আমি আর কেউ নয়, আমি খোকা। আমি তোর নাক কেটে দেব।' উত্তরে পাগলা বলে, 'এবারের মত মাপ কর ভাই, আমি কক্ষণ আর তার ওখানে যাব না।' ইতিমধ্যে পাড়ার মণীন্দ্রবাবু সেখানে এসে উপস্থিত হন। সব কথা শুনে মণীন্দ্রবাবু অনুরোধ জানান, 'যাক্, এবারের মত ওকে যেতে দাও। পাগলাকে যেতে দেওয়া হয়, কিন্তু কিছুদূর সে চলে আসার পরই, আমি খাঁদার আদেশে তাকে পুনরায় চেপে ধরি এবং গো-বাবু একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসে। ব্যাপার দেখে পাগলার বন্ধুটি সরে পড়েছিল। গো-বাবু তাকে চেপে ধরে বলে উঠে, 'যাচ্ছিস্ কোথায় রে শা—' কিন্তু খাঁদা ও-দিনের মত তাকে রেহাই দিতে বলায়, গো-বাবু তাকে ছেড়ে দেয়। এর পর আমরা সকলে মিলে পাগলাকে ট্যাক্সিতে তুলি। ট্যাক্সিখানা গরাণহাটার একটা শিব মন্দিরের পাশ দিয়ে চলছিল, এমন সময় হঠাৎ পাগলা চেঁচিয়ে উঠে. 'ওগো, তোমরা আমায় বাঁচাও, এরা আমাকে মেরে ফেলবে।' পাগলাকে চেঁচাতে শুনে, ড্রাইভার মন্দিরের সামনেই গাড়িটা রুখে দেয়। সত্য গোয়ালা নামে একজন ব্যক্তি সেই সময় মন্দিরে প্রণাম জানাচ্ছিল—'বাবা তারকনাথ!' হঠাৎ ট্যাক্সিখানা থেমে যাওয়ায় ক্যাচ করে একটা আওয়াজ হয়। আওয়াজ শুনে সত্য আমাদের দিকে ফিরে দেখে এবং আমাদের সেখানে দেখে সে ট্যাক্সির কাছে ছুটে আসে, ইতিমধ্যে গোঁসাই নামে অন্য আর একজন পথচারীও অন্যান্য অনেকের সঙ্গে সেখানে এসে ভিড় করে। —এই দুই ব্যক্তিই প্রতিবেশী হওয়ায় আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ছিল। এদের মধ্যে গোঁসাইজী এগিয়ে এসে শুধোয়, 'ব্যাপার কি? পাগলা চেঁচায় কেন?' পাগলাকে ওরা আমাদের তবলচি বলে জানত, সেজন্য কেউ আমাদের অভিসন্ধি সম্বন্ধে কোনওরূপ সন্দেহ করে নি—যদিও তারা আমাদের প্রকৃতি এবং স্বরূপ সম্বন্ধে ভাল রূপেই জানত। পাগলা কিন্তু,

যে কারণেই হোক, এদের নিকট কোনও কিছু নালিশ জানায় নি। তার দুই চোখ দিয়ে তখন জল গড়াচ্ছিল, ঠিক বরষার ধারার মত। নিঃশব্দে সে ট্যাক্সির উপর বসে রইল, মুখ দিয়ে তার একটী রা'ও বার হ'ল না। উত্তর দিল খাঁদা নিজে, হেসে ফেলে সে জানাল, "'আপনারাও যেমন, মদটা খেয়েছি, একটু নেশাও হয়েছে, এখন যাচ্ছি আর এক জায়গায়, খেতে, একটু ফুর্ত্তি করতে, হে হে—। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ট্যাক্সিখানা আমাদের নির্দ্দেশ মত গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়াল। ট্যাক্সিটাকে বিদেয় দিয়ে আমরা আরও কিছুটা মদ খেলাম, পাগলাকেও খাওয়ালাম। শেষ পর্য্যন্ত পাগলার বোধ হয় ধারণা হয়েছিল আমরা তাকে দুই একটা চড় বা চাপড় দিয়েই ছেড়ে দেব। এজন্যই বোধ হয় সে আমাদের সকল কথাই শুনে চলছিল। এর পর আমরা ধীরে ধীরে গঙ্গার ধার দিয়ে অগ্রসর হই। রাত তখন হবে আটটা, ইতিমধ্যে গঙ্গা পার হয়ে আমাদের পরিচিত গৌরী, সেখানে এসে হাজির হ'ল। গৌরিয়া ছিল একজন চোরাই মালের ক্রেতা, চুরি টুরি বা খুন খারাপির মধ্যে সে কখনও থাকে নি। তাকে দেখে খাঁদা বলল, 'একে এনেছি ট্যাপ করব বলে। আসবি আমাদের সঙ্গে।' ট্যাপ্ করার প্রকৃত অর্থ গৌরী জানত। সে আমাদের সঙ্গ নিচ্ছিল চোরাই মালের আশায়। খুন খারাপিকে সে ভয় করে, ট্যাপের কথা শুনে সে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দেই সরে পড়ল। বিনানুমতিতে সরে পড়ায় গৌরীর উপর খাঁদা ভীষণ চটে গেল। খুনের নেশায় তাকে ততক্ষণ পেয়ে বসেছে, ক্ষেপে উঠে খাঁদা জানাল, 'আচ্ছা শা—তোকেও দেখে নেব আমরা।' এরপর খাঁদা পাগলাকে আদেশ করল, যা, নেমে যা গঙ্গায়, স্নান করে আয়। আবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় পাগলা গঙ্গায় নেমে চান করে এল। পাগলা উপরে এলে খাদা জিজ্ঞেস করল, 'কিরে গঙ্গা জল পান করেছিস?' উত্তরে পাগলা জানাল, 'না

ভাই পান করি নি।' ধমকে উঠে খাঁদা আদেশ করল, 'যা শীঘ্রি গঙ্গা জল খেয়ে আয়।' পাগলা পুনরায় জলে নেমে, অঞ্জলি ভরে গঙ্গোদক পান করে এল। শুনেছি পাগলা ভালরূপ সাঁতার জানত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সে একবারও পালাবার চেষ্টা করে নি। এরপর খাঁদার নির্দেশে আমরা তাকে নিকটের এক কাল ভৈরবের মন্দিরে নিয়ে আসি। খাঁদা পূর্ব্বের মত তাকে আদেশ জানায়, 'যা বেটা যা, নমস্কার করে আয়।' ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে ফিরে এলে খাঁদা পাগলাকে শুধোয়, 'চরণামৃত একটু খেয়েছিস ত?' উত্তরে পাগলা বলে, "না ভাই খাই নি ত।' খাঁদা আবার ধমকে উঠে বলে, 'খাস্ নি! যা শীঘ্রি খেয়ে আয়।'

আশ্চর্য্যের বিষয়, পাগলা মন্দিরের পুরোহিতকে বা আর কাউকে তার এই আশু বিপদের সম্বন্ধে কোনও নালিশ জানায় নি, এমন কি মন্দিরের দরজা বন্ধ করে, আত্মরক্ষার চেষ্টাও সে করে নি, চরণামৃত পান করে সুবোধ বালকের মতই সে ফিরে আসে, এরপর আমরা পাগলাকে কুমারটুলির একটা স্থুয়ার্ড ডিচের (মেথর গলি) মধ্যে টেনে আনি। অপরিসর গলির পথ, একমাত্র মেথররাই সেই পথে যাতায়াত করে। চারদিক অন্ধকার—নিঃশব্দ অন্ধকার। হঠাৎ খাঁদা আস্তিনার তলা থেকে হাতির দাঁতে বাঁধান তার সখের ছুরীখানা বার করে সেটা ডান হাতে উঁচিয়ে ধরে, বাম হাতে পাগলার জামার কলারটা চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'বল দিকিনি পাগলা এটা কি?' আসল ব্যাপারটা এতক্ষণে পাগলার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল, সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দিল, 'ওটা ভাই ছুরী! তোরা ত আমাকে মেরেই ফেলবি, আমি কিন্তু ভাই নির্দ্দোষ।' উত্তরে খাঁদা বলল, 'ও সব কথা আর নয়। বিচার হয়ে গেছে এইবার শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও। হাঁ, একটা কথা। তোমার কোনও শেষ ইচ্ছা আছে?' হঠাৎ পাগলার

মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'মলিনাকে একবার দেখব।' পাগলার কথায় আমরা অবাক হয়ে গিছলাম। পাগলা বলে কি, যে মলিনাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই মলিনাকেই সে দেখবে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম খাঁদার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠল। চারিদিকে শুধু অন্ধকার, দেখা যায় শুধু খাঁদার দুটো চোখ, আর তার হাতের ধারাল ছুরীখানা। এরূপ অবস্থায় খাঁদা প্রায়ই হয়ে যেত একটা নির্দ্দয় পশুর মত, এমন কি তার চেহারাও যেত বদলে, এই সময় আমরাও পর্য্যন্ত তাকে ভয় করতাম। হিংস্র পশুর মত এগিয়ে এসে খাঁদা হুকুম করল, 'ধর বেটাকে ভাল করে। আমি আর গো-বাবু, দু'জনে দু'টো হাত জোর করে চেপে ধরি— খাঁদার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করা ছাড়া আমাদেরও গত্যন্তর ছিল না। অন্ধকারের মধ্যেও লক্ষ্য করি, পাগলার চোখ দুটো ভয়ে বুজে গেছে। দেহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে খাঁদার কিছু জ্ঞান ছিল। তার ঘরে আমি এ্যানাটমির কয়েকটা চার্টও টাঙান দেখেছি। হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতির অবস্থিতি তার অজানা ছিল না। হঠাৎ আওয়াজ হ'ল—ফ্যাচ্, ফ্যাচ্, ফ্যাচ্। হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে খাঁদা তিন তিন বার তার ছুরীখানা পাগলার বুকের ভিতর বসিয়ে দিলে। বিনা প্রতিবাদে পাগলার দেহটা রক্তাপ্লুত অবস্থায় মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল। ব্যাপারটা দেখে আমরা একটু ভয় পেয়েছিলাম, হাজার হোক পাগলা আমাদের পরিচিত ছিল, আমাদের মনের এই দুর্ব্বলতা খাঁদার চোখ এড়ায় নি, সে আমাদের সাহস দিয়ে বলে উঠে, 'কি রে ভয় পেয়েছিস, এই কি আমাদের প্রথম কাজ?' এর পর ধীর স্থির মস্তিষ্কে খাঁদা গো-বাবুকে আদেশ জানায়, 'যা তোর ডলিকে নিয়ে হাওড়ার দিকে সরে পড়, আমিও মলিনাকে নিয়ে কোলকাতা ছাড়ব।" গো-বাবু চলে গেলে খাঁদা আমাকে নিয়ে তার কুমারটুলির বাটীতে আসে। সামনের রকটার উপর বসে পাড়ার দেবেন হাওয়া খাচ্ছিল,

আমাদের জামা কাপড়ে রক্তের দাগ দেখে সে শুধাল, 'কিরে তোদের জামা কাপড় রাঙা কেন?' খাঁদা আস্তীনের ভিতর থেকে তার ছুরীখানা বার করে, ইসারায় তাকে চুপ করতে বলে। দেবেন ভয় পেয়ে চুপ করে যায় এবং সেই সুযোগে আমরা বাটীর ভিতর এসে জামা কাপড় ছাড়ি। এর পর খাঁদার কি খেয়াল হয়, কে জানে! সে আমাকে নিয়ে পুনরায় অকুস্থলে ফিরে আসে, আসবার সময় একটা ভোজালিও জোগাড় করে। ভোজালিটা দিয়ে সে পাগলার গোড়ালির শিরা দুটো কেটে দেয় এবং তার পর পাগলার মুণ্ডটাও এক কোপে বিচ্ছিন্ন করে আমাকে একটা বোরা আনবার জন্যে আদেশ জানায়। আমি বোরা নিয়ে ফিরে এসে দেখি খাঁদা মুণ্ড হাতে দাঁড়িয়ে আছে। গর্ব্বভরে খাঁদা জানায়, 'জানিস, ন্যাকড়ায় জড়িয়ে মুণ্ডটা মলিনাকে দেখিয়ে এলাম, আর সেই সঙ্গে জিজ্ঞেস করে এলাম, আর কাউকে সে ভালবাসে, কি'না?' এর পর খাঁদা বোরাটার মধ্যে মুণ্ডটা পুরে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে আসে। ঘাটের উপর খাঁদার পিতার এক বন্ধু একটা পোষা কুকুর নিয়ে বসে ছিল। খাঁদাকে মুণ্ডটা জলে ফেলতে দেখে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করল, 'কি'রে খাঁদা কি ফেল্লি জলে?' খাঁদা উত্তর দেয়, 'ও কিছু নয়, একটা মরা বেড়াল।' সব কাজ ফতে করে, আমরা একটা সরু গলির পথ ধরে ফিরে আসছিলাম, এমন সময় আমরা লক্ষ্য করলাম খাঁদার জুতাদুটো রক্তে ভিজে গেছে। জুতা দুটো খাঁদা একটা গর্ত্তের মধ্যে গুঁজে দিয়ে শুধু পায় চলে আসে। হাঁ হুজুর জুতা দুটো আমি আপনাদের বার করে দেব। এর পর খাঁদার বাটীতে পুনরায় ফিরে এসে আমরা উভয়ে আর একবার জামা কাপড় ছাড়ি। এইজন্যেই আপনারা আমাদের দু'প্রস্থ রক্তমাখা জামা কাপড় পেয়েছিলেন, এর পর খাঁদার কি হয়েছিল জানি না, সে আমাদের নিষেধ সত্বেও অকুস্থলে বার বার ফিরে যেত। যাকে তাকে, নিজের এই বীরত্ব সম্বন্ধেও ফলাও করে গল্প

বলত! ব্যাপার দেখে আমি খাঁদাকে নিয়ে দেওঘরে আসি। সেইখানে খাঁদা 'রাজা অফ্ কুমারটুলী' এই নামে পরিচয় দেয়, এর ফলে আমাকে খাঁদার দেওয়ান সাজতে হয়। আমরা এখানে দান ধ্যান সুরু করি, ভিখিরিদেরও খাওয়াতে থাকি। আমাদের রাজোচিত ব্যবহারে দেওঘর-বাসীরা মুগ্ধ হয়ে উঠে। এই সময় খাঁদার খেয়াল হয় তার রাণীকে— অর্থাৎ কি'না মলিনাকে, সে সেখানে আনবে। আমরা শুনেছিলাম, আপনারা মলিনার বাটীতে পাহারা বসিয়েছেন, হাঁ হুজুর, আপনি ঠিকই জেনেছিলেন, মলিনাকে না দেখে খাঁদা কিছুতেই থাকতে পারে না, মলিনার ওখানে সে আসবেই। আমরা কোলকাতায় ফিরে মলিনার বাটী আসি। খাঁদা খড়া বয়ে উপরে উঠে, জানালা ভেঙে মলিনার ঘরেও ঢোকে। খাঁদা ঘরে ঢুকে মলিনাকে ক্লোরোফর্ম করে, দড়ী বেঁধে নীচে নামিয়ে দেবে এবং আমি নীচে থেকে মলিনাকে লুফে নিয়ে তাকে ট্যাক্সিতে বসিয়ে দেব—এরূপ আমাদের বন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু মলিনা হঠাৎ খাঁদাকে দেখে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠে। চেঁচামেচি শুনে পুলিশ এবং আশপাশের দোকানদারেরা ছুটে আসে, ইতিমধ্যে খাঁদাও নীচে লাফিয়ে পড়ে। পুলিশ এবং রাস্তার লোকেরা আমাদের তাড়া করে, খাঁদা এইবার পকেট থেকে তার গুলিভরা পিস্তলটা বার করে উপর্যুপরি গুলিবর্ষণ সুরু করে। ফলে লোকজনেরা পিছিয়ে পড়ে, এবং আমরাও সরে পড়তে সক্ষম হই। যাই হোক, ঈশ্বরের দয়ায় সে যাত্রা আমরা ধরা পড়ি নি, কিন্তু এ যাত্রায় আমি ধরা পড়লাম, হাঁ, হুজুর, খাঁদার দেওঘরের আস্তানা আপনাকে আমি দেখিয়ে দেব। সে এখনও সেখানেই আছে এবং আমার জন্য সেখানে সে অপেক্ষা করছে। কিন্তু দেখবেন হুজুর, আমার এই স্বীকারোক্তির কথা সে যেন না জানে, জানতে পারলে তার হাতে আমারও মৃত্যু নিশ্চিত। হাঁ, হুজুর,

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, পাগলাকে হত্যা করার পরদিনই খাঁদা আমাকে নিয়ে প্রতিশ্রুতি মত, গৌরীর খোঁজে শেওড়াফুলি যায়, এবং সেখানে তার বন্ধুদের মারপিঠ করে আসে। আসলে খাঁদা কাউকে কখনও ক্ষমা করে নি, আমাকেও সে ক্ষমা কববে না, দেখবেন হুজুর, আমাকেও সে হত্যা করবে। আপনিও খুব সাবধানে থাকবেন হুজুর, দেওঘরের রাস্তায় যদি একবার সে আপনাকে দেখে ত তৎক্ষণাৎ সে আপনাকে গুলি করবে।"

উৎকট শোণিতাত্বক অপরাধীরা যে কিরূপ ভীষণ নিষ্ঠুর এবং ভয়ঙ্কর হ'তে পারে, তা উপরের কাহিনীটি হ'তে বুঝা যায়। ইয়ুরোপে এমন অনেক অপরাধীর কথা শুনা গেছে, যারা কিনা কয়েকজন মানুষ হত্যার পর, পরিশেষে মানুষের অভাবে কয়েকটা গরু বাছুর নিহত করেছিল। হ্যাবলক এলিস সাহেবের "দি ক্রীমিন্যাল" নামক পুস্তকে এই ধরণের কয়েকজন অপরাধীর উল্লেখ আছে। উৎকট ও অত্যধিক শোণিত স্পৃহার অবস্থিতির জন্যই এরূপ হয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে নিম্নের অন্য আর একটি বিবৃতিও প্রণিধানযোগ্য।

"আমার ইনফরমার শিউচরণ ওরফে শিউচরনিয়া এসে জানায়, 'হুজুর, জেলা খারিজ গুণ্ডা খাঁদা কোলকাতায় ফিরে এসেছে।' আমি উৎফুল্ল হয়ে তাকে নিয়ে চীৎপুরের একটা তেতলার ঘরে উপস্থিত হই। ঘরের ভিতর তখন গান বাজনা চলছিল, দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই খাঁদা জানালা গলে লাফিয়ে পড়ে। আমরা তাড়াতাড়ি নীচের "ফুটে" নেমে আসি, কিন্তু খাঁদার কোনও চিহ্নও দেখতে পাই না। ফুটের পাশের দোকানে একটা পানওয়ালা বসেছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করি তার গাল দু'টো লাল এবং তার চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছে। পানওয়ালা নাকি খাঁদাকে ফুটের উপর বার দুই তিন ভল্ট খেয়ে লাফিয়ে পড়তে দেখে।

নীচে নেমে সে তার হাত-পা গুলো টেনে টেনে সোজা করে, তারপর পানওয়ালার গালে ঠাস্ করে একটা চড় কসিয়ে বলে, 'দে শালা একটা সিগারেট দে।' পানওয়ালা তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট বার করে দেয়। খাঁদা তাকে আর একটা চড় দিয়ে হুকুম করে, 'দে শালা, শিগ্‌গির ধরিয়ে দে।' এর পর পানওয়ালা সিগারেটটা ধরিয়ে দেয়। খাঁদাও গুরুগম্ভীর চালে শিস্ দিতে দিতে সরে পড়ে। আমরা পানওয়ালার এই সব কথা বিশ্বাস করি না এবং তাকে খাঁদার কোনও বন্ধু বলে সন্দেহ করি। এর কয়েকদিন পর শিউচরণের নির্দ্দেশমত আমি খাঁদার এক গোপন ডেরায় হাজির হই এবং খাঁদাকে সাইকেল চড়ে বেরিয়ে যেতে দেখি, আমি এবং শিউচরণ তাকে তাড়া করি কিন্তু তাকে আমরা ধরতে সক্ষম হই না। এর দুই দিন পরেই সন্ধ্যার দিকে, খবর আসে শিউচরনিয়া নিহত হয়েছে। যথাসত্বর অকুস্থলে হাজির হয়ে দেখি, শিউচরণের বিগতপ্রাণ দেহ রক্তাপ্লুত অবস্থায় একটা রকের উপর পড়ে রয়েছে। পাগলা হত্যাকাণ্ডের প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে এই শিউচরণ হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছিল।"

ক্যালকাটা পুলিশ জার্ণেল Vol. I. Part I. পুস্তকে সুন্দরী মলিনা, প্রখ্যাত খাঁদা ওরফে খোকাবাবু এবং তাহার সহকারীদ্বয়, গো-বাবু এবং কে-বাবুর প্রতিকৃতি দেওয়া আছে। এদের এই প্রতিকৃতিগুলির মধ্যে সূক্ষ্মভাবে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হ'তে দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি আকৃতিগত নয় তা প্রকৃতিগত এবং সাধারণ দৃষ্টিতে তা নজরে পড়ে না। মানুষের অন্তর্ভাব বাইরেও কিছুটা পরিস্ফুট হ'তে বাধ্য; বিশেষ করে তার দৃষ্টিভঙ্গি, মুখের ভাব এবং চলনের মধ্য দিয়ে। মানুষ তার ইনিষ্টিংট দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের এই সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য সকল জেনে নেয়। একটু বুঝিয়ে বলা যাক্। পুলিশের চোখে এই সকল বৈশিষ্ট্য সহজেই

ধরা পড়ে, এর কারণ, প্রত্যেক প্রফেসনের লোকেরাই স্ব স্ব প্রফেসন বা ব্যবসায় সম্বন্ধীয় ব্যাপারে পৃথক পৃথক ইনষ্টিংট জন্মায়। স্ব স্ব ব্যবসায় ক্ষেত্রে বুদ্ধির চেয়ে অনেক বেশী সাহায্যে আসে এই প্রেরণা। এই প্রেরণার মধ্যে যুক্তি থাকে না, তর্ক থাকে না, থাকে শুধু প্রেরণা। এ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করলে তার একটিমাত্র উত্তর হয়—"জানি না কেন, আমার মন বলছে তাই।" আসলে এই সকল প্রকৃতিগত অতি সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন সকল, অভ্যাসজনিত শান্তিরক্ষক এবং লোকচরিত্র-অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের চক্ষে তাদের অজ্ঞাতেই ধরা দেয়। এই স্বভাবজাত ইনষ্টিংট বা প্রেরণা মেয়েদের এবং শিশুদের মধ্যেও দেখা যায়। অধিকাংশ শিশুকেই একটি চোরের এবং একটি ভাল লোকের ফটো দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তারা বলে দিতে পারে কোনটি চোর এবং কোনটি বা ভাল লোক। এ সম্বন্ধে অবশ্য এ দেশে এরূপ কোনও পরীক্ষা আজও হয় নি। এই প্রেরণা বা ইন্‌ষ্টিংট সম্বন্ধে পরবর্ত্তী এক পরিচ্ছেদে বিশদরূপে আলোচিত হবে। ইয়ুরোপে কোনও এক বালিকা একজন খুনির ফটো দেখে ভয়ে কেঁদে ফেলেছে—পরীক্ষা দ্বারা এমনও দেখা গেছে, অথচ ফটোটি যে একজন খুনির তা তাকে পূর্ব্বে হ'তে বলে দেওয়া হয় নি।

এই সকল বৈশিষ্ট্য কোনও কোনও প্রকৃত অপরাধীর মধ্যে অত্যন্ত উগ্ররূপে প্রকাশ পায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তার আওতায় তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি পর্য্যন্ত চাপা পড়ে যায়। এই কারণে অপরাধী বিশেষ একজন ইতালীয়, জার্ম্মান বা ইংরাজ তা বলা শক্ত হয়। এমন কি একজন ভারতীয় অপরাধীকেও তার গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল হ'লে, একজন ইংরাজ অপরাধী হতে বেচে নেওয়া শক্ত হয়।*

* কেউ কেউ বলে থাকেন যে মানুষ বংশানুক্রমে উচ্চশিক্ষিত এবং অত্যধিক কৃষ্টি সম্পন্ন হলেও নাকি তারা তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য বহুল পরিমা[illegible] [illegible]য়ে [illegible]

[অপরাধ-বিভাগের সাহায্যে অপরাধীবিশেষ কি প্রকারের অপরাধ করবে, তা বলে দেওয়া যায়। কিন্তু তারা তাদের মনোনীত অপরাধটী কিরূপে বা কি উপায়ে সাধিত করবে, তা নির্ভর করে তাদের কার্য্য পদ্ধতির উপরে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শঠতার কথা বলা যাক। শঠতা বা "চিটিঙ্" একটি নিষ্ক্রিয় শোণিতাত্বক অযৌনজ অপরাধ, কিন্তু এই শঠতা বহুবিধ উপায়ে সংঘটিত হয়—অর্থাৎ কিনা এক একজন শঠ এক এক প্রকার কার্য্যপদ্ধতি দ্বারা লোক ঠকায়! অপরাধীদের এই কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে পুস্তকের ২য় খণ্ডে আলোচিত হবে।]

অপরাধ-চরিত্র

অপরাধ-চরিত্র মনোজগতের সর্ব্বাপেক্ষা জটিলতর চরিত্র। অপরাধীদের চরিত্র এবং ব্যবহার নিরপরাধী মানুষ হ'তে বিভিন্নরূপই হয়ে থাকে। অপরাধীদের চরিত্রের মধ্যে প্রধানত আমরা চারটী বিশেষ "অবস্থার" সন্ধান পাই; তাদের যথাক্রমে:—(১) অলসতা বা জড়তা (২) ভাবপ্রবণতা (৩) দাম্ভিকতা এবং (৪) নিষ্ঠুরতা বলা হয়। এই বিশেষ বৃত্তি চতুষ্টয় প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে, তাদের অন্যান্য বৃত্তি সকল অপেক্ষা অত্যধিক উগ্ররূপে বর্ত্তিয়ে থাকে। একটু বুঝিয়ে বলা যাক। অপরাধীদের প্রাথমিক অবস্থায় আমরা তাদের মধ্যে নিরপরাধী মানুষের মতই নানাবিধ সূক্ষ্ম এবং স্থূল বৃত্তি দেখে থাকি, কিন্তু তাদের পরবর্ত্তী বা শেষ অবস্থায় তাদের মধ্যে আমরা অত বেশী "ভাব বা বৃত্তির" সন্ধান পাই না—কারণ তাদের এই বিবিধসূক্ষ্ম বা স্থূল বৃত্তিগুলি একত্রে মিশে গিয়ে স্থূল ভাবে মাত্র বৃত্তি চতুষ্টয়ে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই অবস্থায় এরা কখনও থাকে অত্যন্ত অলস, কখনও হয় অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, কখনও এরা অত্যন্ত দাম্ভিক হয়, কখনও বা এরা

অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়ে উঠে। অলসতা, ভাবপ্রবণতা, দাম্ভিকতা এবং নিষ্ঠুরতা—এই চারটি অত্যুগ্র বৃত্তি ছাড়া আর কোন ভাব বা বৃত্তির সন্ধান প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে অত্যুগ্র রূপে দেখা যায় না।

প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে পরিদৃষ্ট এই বিশেষ পরিবর্ত্তন স্নায়বিক কারণে ঘটে থাকে। অত্যুগ্র অপস্পৃহার অবস্থিতি এবং তার পুনঃ পুনঃ আগমন ও প্রত্যাগমনের কারণেই এই ধরণের পরিবর্ত্তন ঘটে—এরূপ আমাদের বিশ্বাস। অলসতা বা জড়তা, ভাবপ্রবণতা, দাম্ভিকতা এবং নিষ্ঠুরতা - এই বৃত্তি, চতুষ্টয়ের* অনুরূপ আরও কয়েকটী আনুসঙ্গিক বৃত্তি, এই একই কারণে প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে দেখা যায়। তাদের কর্ম্মালসতা, দৈহিক অসাড়তা, নৈতিক অসাড়তা ইত্যাদি বলা হয়। এই সকল মানসিক পরিবর্ত্তনের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বিশদরূপে আলোচিত হবে।

এই সকল পরিবর্ত্তন এবং বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র, প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত বা উৎকট অপরাধীদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। যে সকল অপরাধীরা কাজকর্ম্মে রত থাকে এবং কর্ম্মরত অবস্থায় সুযোগ এবং সুবিধামত অপকর্ম্ম করে, তাদের প্রকৃত অপরাধী বলা হয় না। এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যারা চাকরী বা ব্যবসা করা এবং চাকরী বা ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে, কখন কখনও অপকর্ম্ম করে থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের প্রকৃত অপরাধী বলা হয় না—

---

* আদিম মানুষ এবং বালকদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা অধিক মাত্রায় দেখা যায়, এইজন্যই বোধ হয় এদের মধ্যেও উক্তরূপ বৃত্তিচতুষ্টয়ের সমধিক অবস্থিতি বিশেষ রূপে পরিলক্ষিত হয়। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বালকদের মধ্যে উগ্ররূপে পরিদৃষ্ট এই ভাবপ্রবণতা, দাম্ভিকতা এবং নিষ্ঠুরতা রূপ বৃত্তিত্রয়ের উগ্রতা কমে যায় এবং তারা নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে বিবিধ প্রকার সূক্ষ্ম এবং স্থূল বৃত্তির সৃষ্টি করে। বালকদের চরিত্রের সঙ্গে অপরাধীদের চরিত্রের এই সাদৃশ্য, তাদের পূর্ব্বপুরুষ আদিম মানুষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

কারণ অন্যান্য বিষয়ে এদের স্বভাব চরিত্র বরং নিরপরাধ মানুষের মতই হয়ে থাকে। এমন কি প্রাথমিক অবস্থার অভ্যাস-অপরাধীদেরও প্রকৃত অপরাধী বলা হয় না, কারণ তাদের মধ্যে তখনও পর্য্যন্ত উক্তরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। এই সকল পরিবর্ত্তন তাদের মধ্যে না বর্ত্তান পর্য্যন্ত তাদের ব্যবহার এবং চরিত্র বহুলাংশে নিরপরাধ মানুষের মতই দেখা যায়। এই সকল পরিবর্ত্তন কেবলমাত্র স্বভাব-অপরাধী এবং উৎকটরূপ মধ্যম ও অভ্যাস-অপরাধীদের মধ্যে দেখা যায়। প্রথম অবস্থার মধ্যম ও অভ্যাস-অপরাধীদের মধ্যে এই সব পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ দেখা যায় না। প্রাথমিক অপরাধীরা সভ্যসমাজের সহিত সম্পর্ক রহিত হয় না, বরং এরা সমান ভাবে সভ্যসমাজ এবং অপরাধী সমাজের সহিত মেলামেশা করে; প্রকৃত বা উৎকট অপরাধীরা কিন্তু সভ্যসমাজের সহিত কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্পর্ক রাখে না, তারা পুরাপুরিভাবে অপরাধী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় এদের নেশন উইথ ইন্ নেশন বা "জাতির অন্তর্গত পরগাছা জাতি" রূপে ব্যাখ্যা করা যায়। এই প্রকৃত বা উৎকট অপরাধীরা সাধারণতঃ কর্ম্মালস হয়ে থাকে, তারা কখনও কাজকর্ম্ম করে না। প্রকৃত অপরাধীরা তাদের অপকর্ম্মের জন্য কোনও অবস্থাতেই অনুতপ্ত হয় না, ভয় ভাবনাও থাকে তাদের কম। এরা সাধারণতঃ ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা চালিত হয়, এদের মধ্যে কোনও রূপ আদর্শ বা দলগত স্বার্থ থাকে না। ডাকাত-আদি অপরাধীরা দল বেঁধে কাজ করলেও, তা তারা করে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য। এই কারণে এদের প্রায়ই আমরা হিস্যা বা ভাগের জন্য বিবাদ করতে দেখি। এ ছাড়া এদের মধ্যে কর্ত্তব্য-বোধের অভাব এবং হিংসা বৃত্তির আধিক্যও দেখা যায়। এই কারণে একজন অপরাধী অন্য আর একজন অপরাধীকে প্রায়ই ধরিয়ে দেয়। অপরাধীদের নিষ্ঠুরতা বা নিষ্ঠুরবৃত্তির অন্তর্গত হিংসা,

বৃত্তির জন্যেই এরা এরূপ করে থাকে। এদের এই নিষ্ঠুরতা বা নিষ্ঠুরবৃত্তি —হিংসা, ক্রোধ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি বৃত্তির সংমিশ্রনে তৈয়ারী। বিষয়টী পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বিশদ ভাবে আলোচিত হবে। আসলে এদের স্বভাব চরিত্র থাকে একাচারী আদিম মানুষের ন্যায়। প্রকৃত অপরাধীদের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ শান্তিরক্ষকেরা প্রায়ই নিয়ে থাকে। স্বভাব এবং উৎকটরূপ মধ্যম ও অভ্যাস-অপরাধীদেরই আমরা প্রকৃত অপরাধী বলি, কারণ অপরাধই এদের একমাত্র পেশা। ইংরাজীতে এদের বলে "প্রফেসন্যাল ক্রীমিন্যাল" বা পেশাদারী অপরাধী। এই সব অপরাধীদের মধ্যেই স্নায়বিক কারণে এরূপ পরিবর্ত্তন সব দেখা দেয় এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে উক্তরূপ মূল চরিত্রগত প্রভেদ বা বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়।

অলসতা বা জড়তা

অত্যধিক অপস্পৃহার অবস্থিতি এবং তার আগমন ও প্রত্যাগমন প্রকৃত বা উৎকট অপরাধীদের মধ্যে কয়েকটী স্নায়বিক পরিবর্ত্তন ঘটায়, এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে অলসতা বা জড়তা একটী অন্যতম পরিবর্ত্তন। এইখানেই অপস্পৃহার অবস্থিতি এবং "আগমন" এই দু'টী শব্দের প্রভেদ সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। অপস্পৃহার অবস্থিতি অর্থে আমরা অপস্পৃহার "জন্মান বা সৃষ্টি" বুঝি। নিরপরাধ মানুষের মধ্যে এই অপস্পৃহা অল্প পরিমাণে জন্মায়, এই কারণে তারা সহজেই তাদের এই স্বল্পজাত অপস্পৃহা দমন করে থাকে। কিন্তু অপস্পৃহা অত্যধিক রূপে জন্মালে, তার বাড়তি অংশ মনের পথে উপচে পড়ে অপরাধীকে অপকর্ম্ম করতে বাধ্য করে। কিন্তু এই উপচে পড়া অপস্পৃহা বা অপস্পৃহার বাড়তি অংশ বেশীক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হয় না, এরূপ অবস্থায়

একে আমরা অপস্পৃহার প্রত্যাগমন বলি। অপস্পৃহার উপচে পড়া এই বাড়তি অংশ নিঃশেষ হওয়ার পর পুনরায় বাড়তি অপস্পৃহার সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত কার্য্যকরী অপস্পৃহার আগমন হয় না। স্বভাব এবং অভ্যাসগত উৎকট অপরাধীদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে এই বাড়তি অপস্পৃহা সৃষ্টি হয় এবং থেকে থেকে তার বাড়তি অংশ এই ভাবে বেরিয়ে এসে অপরাধীদের দ্বারা অপকর্ম্ম করায়। অপস্পৃহার এই বাড়তি অংশকে আমরা "অতিরিক্ত অপস্পৃহা" নামে অভিহিত করি। এই অতিরিক্ত অপস্পৃহা সাধারণ ভাবে প্রাথমিক অপরাধীদের মধ্যে, অন্তরের প্রেরণায় কিংবা বাইরের প্রলোভনে, সময় সময় জন্মায় বটে, কিন্তু তা তাদের চরিত্রের মধ্যে কোনও প্রকার মূল পরিবর্ত্তন ঘটায় না। অপর দিকে এই অতিরিক্ত অপস্পৃহা (মাত্রাধিক্যের কারণে) প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে, অন্তরের প্রেরণায় কিংবা বাইরের প্রলোভনে অতি সহজেই জন্মে থাকে এবং শেষের দিকে প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে, তার অবস্থিতি এবং পুনঃ পুনঃ আগমন এবং প্রত্যাগমন, কতকগুলি স্নায়বিক পরিবর্ত্তনও ঘটায়। এই সকল পরিবর্ত্তনগুলিকে যথাক্রমে কর্ম্মালসতা, নৈতিক অসাড়তা প্রভৃতি বলা হয়। এই অবস্থায় এই ধরণের অপরাধিদের বলা হয় প্রকৃত বা উৎকট অপরাধী। প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট এই অলসতা একপ্রকার রোগ। এই অলসতার কারণে অপস্পৃহা আগত হওয়া সত্ত্বেও অপরাধীরা সকল সময় কর্ম্মতৎপর হ'তে পারে না। এমন কি অপরাধীদের এই স্বভাবজাত অলসতা সময় সময় সমধিক অপস্পৃহার আগমনের প্রতিবন্ধকও হয়ে থাকে। এইরূপ অবস্থায় অপরাধীরা পুনঃ পুনঃ চিন্তা এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টা দ্বারা অপস্পৃহা নিজেদের মধ্যে অত্যধিক রূপে সৃষ্টি করে উহার বহির্গমনের পথ সুগম করে দেয়, বাইরের প্রলোভনও অবশ্য এই বিষয়ে এদের সাহায্য করে থাকে। এই

"অতিরিক্ত অপস্পৃহা" অত্যধিক মাত্রায় নির্গত হ'লে অপরাধীদের সকল অলসতা বিদুরিত হয়, তারা তখন ভীষণ ভাবে কর্ম্মতৎপর হয়ে উঠে। সাধারণ ভাবে উৎকট অপরাধীদের এই অন্তর্নিহিত অলসতা, তাদের অপস্পৃহাকে কার্যকরী হ'তে দেয় না, এমন কি তাদের এই অলসতা তাদের জীবনধারণ পর্য্যন্ত অসম্ভব করে তুলে। এই কারণে অপরাধীরা মদ্যপান, জুয়া, হুল্লোড় প্রভৃতির দ্বারা উত্তেজনা এনে সাময়িক ভাবে তাদের এই অলসতা বা জড়তা দূর করে "অপস্পৃহা"র আগমন পথ সুগম করে দেয়। বেশ্যা, মদ এবং জুয়ার প্রতি প্রকৃত অপরাধীদের এই কারণেই অত্যধিক রূপে আমরা আসক্ত হ'তে দেখি। এইখানেও প্রাথমিক অপরাধী এবং উৎকট অপরাধীদের মধ্যে আমরা একটী বিশেষ প্রভেদ পরিলক্ষ্য করি। প্রাথমিক অপরাধীরা, এই বেশ্যা, মদ এবং জুয়ার কারণে অপরাধ করে, কিন্তু উৎকট অপরাধীরা এই তিনটী বিষয়ে আসক্ত হয়, অপরাধ করার কারণে। প্রকৃত অপরাধীরা তাদের অন্তর্নিহিত এই অলসতার কারণে, সাধারণতঃ কর্ম্মালস হয়ে থাকে এবং পরগাছার ন্যায় জীবন যাপন করে। এরা বেশীক্ষণ এবং একটানা কাজ করতে অক্ষম থাকে। অপকার্য্যের উদ্দেশ্যে চাকুরী গ্রহণ করলেও এরা বেশী দিন পর্য্যন্ত কাজ করতে পারে না। সুযোগের অভাবে চুরি করতে অক্ষম হ'লে, এরা চুরি না করেই পালিয়ে যায়— এদের স্বভাবগত অধৈর্য্যতা এবং কর্ম্মালসতাই এজন্য দায়ী। এদের সব সময়ই আমরা কর্ম্মবিমুখ দেখে থাকি। কাজ কর্ম্মে এদের কখনও মন বসে না। সাধারণ ভাবে এরা অলস জীবনই যাপন করে। এই অলসতা বা জড়তা রূপ রোগ থেকে মুক্ত হওয়া মাত্র, কিন্তু এরা অত্যধিক রূপে কর্ম্মতৎপর হ'য়ে উঠে, শুধু তাই নয় তখন তারা বিস্ময়কররূপে অসাধ্য সাধনও করে থাকে। কিন্তু এদের এই কর্ম্মতৎপরতা বেশীক্ষণ

পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় না। তুবড়ীর ফোয়ারার ন্যায়, তা সামান্যক্ষণের জন্য উগ্রভাবে জেগে থেকে পরে আপনা হ'তেই তা নিভে যায়। উপচে পড়া বাড়তি অপস্পৃহা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার জন্যেই এরূপ হয়ে থাকে। এই কারণে শ্রমিক বা শিল্পীদের ন্যায় তারা একটানা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কাজ করতে পারে না। যে তেজ বা শক্তির সহায়তায়, শ্রমিক কাঠুরেরা সারাদিন ব্যাপী কাঠ কাটে এবং ছুতার মিস্ত্রীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা রেঁদা ঘষে, উৎকট বা প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে সেরূপ শক্তি বা ধৈর্য্যের অভাব দেখা যায়। ভয় ভাবনা, শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতি, স্বল্পাধিক অপস্পৃহার বহির্বিকাশ এবং "অতিরিক্ত অপস্পৃহা"র স্বষ্টির প্রতিবন্ধক হয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কিন্তু এই ভয় ভাবনা প্রভৃতির অভাবে বা অন্য কোনও অনুকূল কারণে, অপরাধীদের মধ্যে উক্তরূপ বাড়তি অপস্পৃহা জন্মালেও এই অলসতার জন্য সেটা সবসময় মনের পথে উপচে পড়ে না—কিংবা পড়লেও অলসতার কারণে তা কার্য্যকরী হয় না। কিন্তু কোনওরূপে যদি এই "বাড়তি অপস্পৃহা" একবার নির্গত বা কার্য্যকরী হ'তে পারে, তা হ'লে উহা তাদের সকল অলসতা দূর করে অপরাধী-বিশেষকে দুর্দ্দমনীয় এবং অত্যন্তরূপ কর্ম্মতৎপর করে দেয়—কিন্তু তা হ'লে কি হয়, এই বাড়তি অপস্পৃহা নিঃশেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অপরাধীরা পুনরায় অলস বা জড় হয়ে যায়, এবং তা পুনরায় জাত ও আগত না হওয়া পর্য্যন্ত তারা কর্ম্মালস থাকে, অপকর্ম্মেও অক্ষম হয়। এই কারণে কোনওরূপ প্রতিবন্ধক না ঘটলেও, সারা রাত বা সারা দিন ব্যাপী অপরাধীরা কখনও অপকর্ম্ম করে না। অনেক সময় অপকর্ম্ম-কালীন মধ্য পথেই এদের "বাড়তি অপস্পৃহা" নিঃশেষ হয়ে যায়, এবং তার অভাবে অপরাধীরা পুনরায় অলস হয়ে উঠে, এরূপ অবস্থায় এরা অপকর্ম্ম শেষ হবার পূর্ব্বেই স্থান ত্যাগ করে। কিছুক্ষণ কর্ম্মতৎপর

থাকার পরই এদের মধ্যেই এই অলসতা এমন কি জড়তাও এসে থাকে, কারণ নির্গত "বাড়তি অপস্পৃহা" অল্পক্ষণেই নিঃশেষ হয় এবং তা পুনরায় জাত এবং নির্গত হ'তে সময় লাগে। এ ছাড়া অকুস্থলে অলস হয়ে উঠলে, সেই অলসতা সহসা দূর করাও সম্ভব হয় না। অত্যধিক অলসতাকে জড়তা বলা হয়। অত্যুৎকট স্বভাব অপরাধীরা এরূপ ক্ষেত্রে অলস না হয়ে জড় হয়ে যায়। স্বল্পাধিক অপস্পৃহা অপরাধীদের অলস এবং অত্যধিক অপস্পৃহা তাদের জড় করে। হিষ্ট্রিয়া রোগীরা যেমন তাদের রোগের আগমন বার্ত্তা পূর্ব্বাহ্নেই জ্ঞাত হয়ে সাবধান হয়, প্রকৃত বা অত্যুৎকট অপরাধীরাও তেমনি তাদের এই অলসতা বা জড়তার আগমনের সূচনা অনুভব করা মাত্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে। কোনও কোনও অত্যুৎকট অপরাধীকে কদাচিৎ অকুস্থলেই জড়ে পরিণত হ'তে দেখা গেছে, এরূপ অবস্থায় এরা স্থান পরিত্যাগ করতেও পারে নি। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতি দু'টী প্রণিধান যোগ্য।

"নীচের ভাঁড়ার ঘরে খট্ খট আওয়াজ শুনে আমি জেগে উঠি, বুঝতে পারি নীচের ঘরে চোর ঢুকেছে। আমি হাঁক ডাক করে লোক জোগাড় করি এবং সদলে ভাঁড়ার ঘরে আসি। দরজার দু'টা তালাই ভাঙা দেখা যায়। ঘরে ঢুকে দেখি আলো জ্বলছে। চেয়ে দেখি ভিতরে চোরটা বসে রয়েছে। সে একবারও পালাবার চেষ্টা করে নি। ঘরের তিন তিনটা আলমারী ভেঙে, কাপড় চোপড় বার করে, সেগুলার একটা পুঁটলি বেঁধে, পুঁটলিটা সামনে রেখে সে বসে ছিল। লোহার সিঁদকাঠিটাও তার পাশেই পড়ে আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় সে পালাল ত না-ই, এমন কি আত্মরক্ষারও কোনও চেষ্টা করল না। আমরা তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে উঠে বসে নি।"

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত (৬০ পৃষ্ঠা দেখুন) "অপরাধ-বিরাম" এবং

উৎকট অপরাধীদের এই "জড়তার" মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। অপরাধীদের মধ্য থেকে অপস্পৃহার সাময়িক অন্তর্ধানকে বলা হয় "অপরাধ-বিরাম"। এই সময়ের মধ্যে তাদের মধ্যে অপস্পৃহা সমধিক ভাবে জাত বা নির্গত হয় না। এই বিশেষ সময়টুকুর মধ্যে অপরাধী আর অপরাধী থাকে না, তারা তখন সাধারণ মানুষ হয়ে যায়। এই বিশেষ ক্ষণটুকুর মধ্যে অপকর্ম্মের জন্য তাদের অনুতাপ আসে এবং তাদের কর্ম্মালসতা দূর হয়। তারা তখন সহজ মানুষ হয়ে উঠে এবং সৎকর্ম্মে মন দেয়। মাত্র প্রাথমিক অপরাধীদের মধ্যে এই "অপরাধ-বিরামের" আধিক্য দেখা যায়। অন্য দিকে "জড়" ব্যক্তির মধ্য থেকে অপস্পৃহা অন্তর্হিত হয় না, বরং তা তাদের মধ্যে পুরামাত্রায় জাত হয় এবং জাগ্রত থাকে, কিন্তু অন্তর্নিহিত অলসতা বা জড়তার জন্যে তাদের মধ্যে অপস্পৃহা কার্য্যকরী হ'তে পারে না। এই অলসতা বা জড়তা আপনা হ'তে দূর না হ'লে অপরাধীরা কৃত্রিম উপায়ে তা বিদূরিত করে কর্ম্মতৎপর হয়। কেবলমাত্র অত্যুৎকট অপরাধীদের মধ্যেই এই জড়তা পরিলক্ষিত হয়। জড়তার একটী দৃষ্টান্ত উপরে দেওয়া হয়েছে, নিম্নে "অপরাধ-বিরামের" একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

"দুই এবং তিন নং আসামীর প্ররোচনায় আমি ফরিয়াদিনী স্ত্রীলোকের সহিত দেখা করি। তাঁকে আমি জানাই যে আমার পুত্র ও কন্যার জন্য একজন শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। আমি মহিলাটীকে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে আমার পুত্র কন্যার শিক্ষার ভার নিতে অনুরোধ করি। আমার প্রস্তাবে মহিলাটী সম্মতি জানান এবং পরদিন আমার সঙ্গে আমার গৃহে আসিতেও রাজী হন। পরদিন আমি দুই এবং তিন নং আসামী সমভিব্যাহারে তাঁকে ট্যাক্সিতে তুলে নিই। আমরা লক্ষ্য করি মহিলাটীর গায়ে আশানুরূপ গহনা নাই। মাত্র একগাছা সরু-

চেন হার ছাড়া, তাঁর গায়ে আর কোনও গহনাই ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা পূর্ব্ব সংকল্প পরিত্যাগ করি না। এমনিই, বোধ হয়—অপস্পৃহা একবার জাগ্রত হ'লে, সহজে তার নিবৃত্তি হয় না। ট্যাক্সিখানা তিলজলার নির্জ্জন পোলের উপরে উঠা মাত্র আমি মহিলাটির হাতটা চেপে ধরি এবং বন্ধুদ্বয় ছুরিকা এবং ঝুটা পিস্তল হ'স্তে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু ঠিক এই সময় আমার কি হ'ল জানি না, এই অপকর্ম্মের জন্য আমার ভীষণ অনুতাপ এল। হঠাৎ আমি অন্য মানুষ হয়ে উঠলাম। আমি এক ধাক্কায় বন্ধুদ্বয়কে সরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম—মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'ছিঃ ছিঃ এ কি করছি আমরা!' আমার চীৎকারে লোক জমে গেল এবং আমরা সকলেই ধরা পড়লাম।"

অপরাধীদের মধ্যে, বিশেষ করে প্রাথমিক অভ্যাস-অপরাধীদের মধ্যে এই "অপরাধ-বিরাম" হামেসাই দেখা যায়। এমন অনেক অপরাধী আছে, যারা কিনা কিছুদিন যাবৎ অপরাধী এবং কিছুদিন যাবৎ নিরপরাধ থাকে। একই দিবসের একাংশে অপরাধী এবং অপরাংশে নিরপরাধ থাকার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। অপরাধী বিশেষের দ্বৈত-ব্যক্তিত্বের জন্যও এরূপ ঘটে থাকে। এরূপে নিরপরাধ থাকার সময়টুকুরই অন্য নাম "অপরাধ-বিরাম"—তা সেটা এক ঘণ্টার জন্যেই হোক বা একদিন কিংবা কয়দিনের জন্যেই হোক, নিরপরাধ থাকাকালীন বা অপরাধ-বিরামের সময় এদের অনুতাপ আসে, কিন্তু অপরাধী অবস্থায় এদের অনুতাপ থাকে না। প্রাথমিক অপরাধীদের মধ্যে স্বল্পাধিক অলসতা দেখা গেলেও, জড়তা তাদের মধ্যে কখনও দেখা যায় নি, এমন কি প্রকৃত অপরাধীদেরও মধ্যে এই জড়তা সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না। প্রকৃত অপরাধীদের এই জড়তা শান্তি-রক্ষকদের

নজরেও কদাচিৎ এসে থাকে। আমি কর্ম্মজীবনে মাত্র ছয় বা সাতজন স্বভাব অপরাধীর মধ্যে এই জড়তা লক্ষ্য করেছি। আমার মতে এই জড়তা মাত্র অত্যুৎকট অপরাধীর মধ্যেই বর্ত্তায়। কিছুদিন পূর্ব্বে বড়বাজার অঞ্চলে কোনও এক অপরাধী ছাদ ফুটা করে দড়ীর সাহায্যে নীচে নামে, দ্রব্যাদিও সে সংগ্রহ করে, কিন্তু হঠাৎ তার মধ্যে অলসতা এসে যাওয়ায় সে আর উঠতে পারে নি। সকালে ঘরে ঢুকে গৃহস্বামী দেখে, দড়ী ধরে সে মেঝের উপরই বসে আছে। অত্যধিক কর্ম্মতৎপরতা দেখানর ফলেই সে হঠাৎ জড় হয়ে পড়েছিল, এই জড়তা বা অত্যধিক অলসতার উদাহরণ স্বরূপ আরও একটী বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"সকালে উঠে দেখি গেষ্ট রুমের দরজাটা খোলা, শুধু তাই নয়, দরজাটার 'তালাটাও' উধাও হয়েছে। লোকজন জড় করে ঘরে ঢুকে কিন্তু কাউকে দেখতে পাই না। ঘরের তিনটা আলমারীই আমরা ভাঙ্গা দেখি। দামী পোষাকের বাক্সটা মেঝের উপর নামান রয়েছে। এর পর হঠাৎ আমার লক্ষ্য পড়ে খাটের নীচেটায়। অবাক হয়ে দেখি চোর-মশাই খাটের নীচে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। লোকজন ডাকি, হৈ হাল্লা করি, কিন্তু তা স্বত্বেও সে বেরিয়ে আসে না। পুলিশ আসা পর্য্যন্ত সে সেইখানেই শুয়ে থাকে। আমরা তাকে খোঁচা দিই, সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে, কিন্তু নড়ে না। এর পর তাকে আমরা থানায় নিয়ে চলি। পথের মধ্যে মুমূর্ষ অবস্থায় একজন ভিখারী শুয়ে ছিল। চোরটা ইসারায় তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা লক্ষ্য করি, চোরের চোখ দুটা সহানুভূতিতে ছল ছল করছে। এই সময় পথিমধ্যেই অপরাধ সম্বন্ধে সে একটা স্বীকারোক্তি করে। চোরটার হাবভাব দেখে বোঝা যায় সে অত্যধিক ভাবপ্রবণ হয়ে উঠছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে

পর্য্যন্ত সে অতিকষ্টে পথ চলছিল, এই সময় কিন্তু তাকে বেশ সবল মনে হ'ল। বোঝা গেল তার অলসতা বা জড়তা বিদূরিত হচ্ছে। থানায় এসে অপরাধীটী ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললে। অর্থাৎ কি না তার ভাবপ্রবণতা চরম সীমায় এলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তার এই ভাবপ্রবণতা কেটে যায় এবং সে চোখাচোখা উত্তর দিতে থাকে। নির্ব্বিকার চিত্তে তার পূর্ব্ব স্বীকৃতি সে অস্বীকার করে, এবং আমাদের জানিয়ে দেয়—'কেউ তার কিছু করতে পারবে না, সে মাত্র জল খেতে বাড়ী ঢুকেছিল ইত্যাদি।' সে এই সময় নানারূপ দম্ভোক্তি করতে থাকে। আমরা বুঝতে পারি অপরাধীটীর ভাবপ্রবণতা তাকে পরিত্যাগ করেছে এবং সে এবার রীতিমত দাম্ভিক হয়ে উঠছে। এর পর অপরাধীটীকে হাজতে দেওয়া হয়। হাজতে দেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সে চেঁচামেচি সুরু করে এবং অকথ্য ভাষায় গালি দিতে থাকে। এরও কিছুক্ষণ পরে, হাজতের দরজা ধরে সে নাড়া দিতে থাকে, দরজার গায়ে মাথা খুঁড়ে সে রক্তপাতও করে এবং পরিশেষে সে নিজের চুল নিজেই ছিঁড়তে থাকে। তদন্তকারী অফিসারটী তখন অপরাধীটীর এরূপ ব্যবহারের মধ্যে নিহত বৈজ্ঞানিক তথ্যটী আমাদের বুঝিয়ে দেন। তিনি বলেন, উৎকট অপরাধীমাত্রই চারটী বিশেষ 'অবস্থার' মধ্যে উঠা-নামা করে, তাদের যথাক্রমে বলা হয়ঃ—(১) অলসতা বা জড়তা (২) ভাবপ্রবণতা (৩) দাম্ভিকতা এবং (৪) নিষ্ঠুরতা। তাঁর মতে অপরাধী-দের পক্ষে এরূপ গালিগালাজ করা, কিংবা নিজের দেহে নিজে আঘাত করার কারণ, তার বর্ত্তমান নিষ্ঠুরতা-রূপ অবস্থা, অপরাধীটী এখন পুরাপুরি নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। বাহিরে থাকলে এই অবস্থায় সে পুনরায় অপরাধ করে শাস্তি পেত। সক্রিয় শোণিতাত্বক অপরাধীরা এই অবস্থায় প্রহরীদের আঘাত পর্য্যন্ত করে থাকে। নিষ্ক্রিয় অপরাধীরা

এরূপ অবস্থায় রুদ্ধাক্রোশে ফুলতে থাকে, কেউ কেউ আবার খাওয়া দাওয়া পরিত্যাগ করে। অফিসারটী আরও জানান, শীঘ্রই অপরাধীটী পুনরায় তার দাম্ভিকতা, ভাবপ্রবণতা এবং অলসতার রাজ্যে যথাক্রমে নেমে যেতে পারে। হাজতবাসকালীন অলসতা এলে নাকি অপরাধীদের হাজত থেকে বের করা কঠিন হয়, তাকে উত্তেজিত না করা পর্য্যন্ত সে শুয়ে থাকে এবং বাইরে আসতে চায় না। অফিসারটী আমাদের সাবধানে অপরাধীটীর এই অলসতা, ভাবপ্রবণতা, দাম্ভিকতা এবং নিষ্ঠুরতারূপ বৃত্তি চতুষ্টয়ের উঠা-নামা লক্ষ্য করতে বলেন এবং "অপরাধীটীর তার ভাবরাজ্যে উপস্থিত হওয়ার শুভক্ষণটী" পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবার জন্যে তিনি আমাদের অনুরোধ জানান। অফিসারটী আরও জানান, বন্দীকৃত হওয়ার পর, উত্তেজনা-প্রসূত অপরাধীরা তাদের মনোদেশে এরূপ উঠা-নামা তাড়াতাড়ি করে থাকে। এরূপ অবস্থায় অপরাধীটী তার ভাব রাজ্যে নেমে এলেও, তার ভাবপ্রবণতা বেশীক্ষণ স্থায়ী হবে না। জিজ্ঞাসাবাদ সমাধা হওয়ার পূর্ব্বেই অপরাধীটী পুনরায় অলস হয়ে পড়তে পারে, কিংবা দাম্ভিকতার রাজ্যে উঠে যেতে পারে। কিন্তু দু-একদিন হাজতে থাকার পর অপরাধীরা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং এরূপ অবস্থায় অপরাধীটী একবার তার ভাব-রাজ্যে এসে পড়লে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে ভাবপ্রবণ থেকে যায়। এরূপ অবস্থায় সহানুভূতির সঙ্গে মিষ্টি কথায় জিজ্ঞাসাবাদ করলে, সে সকল সমাচার জানিয়ে দিতে পারে।

পরের দিন বেলা দুটায় এসে দেখি অপরাধীটী আবার কাঁদতে সুরু করে দিয়েছে। তদন্তকারী অফিসারটী তাকে চা খেতে দেন, এই কারণেই নাকি সে কেঁদে উঠে। অফিসারটী তার বাড়ীঘর এবং ছেলেবেলাকার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন, এর কিছুক্ষণ পরেই ধীরে ধীরে অপরাধীটীকে আম রা স্বীকারোক্তি করতে শুনি। বর্ত্তমান অপরাধটী ত সে স্বীকার

করেই, এমন কি তার পূর্ব্ব অপরাধগুলি সম্বন্ধেও সে অনেক কথা বলে ফেলে, কিন্তু এজন্য তাকে কিছুমাত্র অনুতপ্ত দেখা যায় না। এর কিছু পরেই অপরাধীটী হঠাৎ দাম্ভিক হয়ে উঠে এবং গালিগালাজ সুরু করে দেয়। সে অভিযোগ করে অফিসারটী মিছামিছি তাকে ভুলিয়ে তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করেছেন এবং তা তিনি করেছেন কেবলমাত্র ঝুটমুট তাকে ফাঁসিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ইত্যাদি। অপরাধীটী এইজন্যে অফিসারটীকে বেইমান এবং নিজেকে বুড়বাক বলে অভিহিত করে। বেগতিক বুঝে অফিসারটী সেদিনের মত অপরাধীটাকে হাজতে পূরতে আদেশ দেন। অপরাধ-বিজ্ঞানের এই অনাবিষ্কৃত নিগূঢ়তত্ত্বগুলি সেদিন সত্য সত্যই আমাদের চমৎকৃত করেছিল।”

ভাবপ্রবণতা

প্রকৃত অপরাধীদের প্রায়ই অহেতুক ভাবে ভাবপ্রবণ হ'তে দেখা যায়, মানুষের প্রেমপ্রসূত, দয়া, মায়া, সুবিচারিতা প্রভৃতি অতি সূক্ষ্মবৃত্তিগুলির সহিত এর কোনও সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয় না। আমরা সময় সময় এ দেশে অপরাধী বিশেষকে দান ধ্যান করতে দেখি, কিন্তু এই দান ধ্যান তারা তাদের দয়া, মায়া এবং কর্ত্তব্যের জন্যে তারা করে না, এরূপ তারা করে কেবলমাত্র তাদের “ভাবপ্রবণ” অবস্থায় থাকা কালীন। তাদের “ভাবপ্রবণ”রূপ অবস্থা থেকে তারা সরে আসা মাত্র তাদের অন্তর থেকে সকল দয়া মায়া অন্তর্হিত হয়। যে অপরাধী ভাবপ্রবণ অবস্থায় অত্যন্ত দয়ালু থাকে, নিষ্ঠুর অবস্থায় তার সেই দয়ারপাত্রের উপর সে অকথ্য ভাবে নৃশংস হয়ে উঠে। সহজ মানুষ ও প্রাথমিক অপরাধীদের এবং এই উৎকট বা প্রকৃত অপরাধীদের ভাবপ্রবণতার মধ্যে প্রচুর প্রভেদ আছে।

সহজ মানুষদের ভাবপ্রবণতার মধ্যে অনুতাপ থাকে, আর থাকে কিছুটা আদর্শ, কিন্তু প্রকৃত অপরাধীরা তাদের কোনও অবস্থাতেই অনুতপ্ত হয় না এবং এদের এই ভাবপ্রবণতা কোনও প্রকার আদর্শ দ্বারাই পরিচালিত হয় না, এ ছাড়া সহজ মানুষরা তাদের সকল অবস্থাতেই এবং সকল সময়েতেই দয়া মায়া দেখায়, কিন্তু প্রকৃত অপরাধীরা মাত্র তাদের ভাবপ্রবণ অবস্থায় থাকা কালীন দয়া মায়া দেখিয়ে থাকে, তাদের "অলসতা, দাম্ভিকতা এবং নিষ্ঠুরতা" অবস্থার সময় তারা কখনও কাউকে দয়া মায়া করে না। অপরাধীদের মনের পথে তাদের উপরোক্ত অবস্থা চতুষ্টয়ের উঠা নামা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। একজন অপরাধী অন্য অপরাধীর প্রতি অবৈধ ভালবাসার মধ্যেও থাকে এই ভাবপ্রবণতা। এই ভাবপ্রবণতার জন্যে অপরাধীদের আমরা নানাবিধ ভাবপ্রবণতা সূচক "উল্কি" ধারণ করতে দেখি, যেমন—"প্রাণের খেঁদা" "ভালবাসা" "ভুল না" ইত্যাদি। অপরাধী বিশেষ মাঝে মাঝে গান ও কবিতা রচনা করে, এমন কি তাদের কেউ কেউ ছবিও এঁকে থাকে। এই সকল অপরাধ-সাহিত্য, চিত্র এবং শিল্প অপরাধীদের অন্তর্নিহিত ভাবপ্রবণতার জন্যেই সৃষ্ট হয়। অপরাধীদের এই ভাবপ্রবণতা সম্বন্ধে এবার কয়েকটী বিলাতী উদাহরণ দেওয়া যাক। উদাহরণ কয়টী হ্যাভলক এলিস সাহেবের "দি ক্রিমিন্যাল" পুস্তকের ২৮২ পৃঃ হইতে উদ্ধৃত হইল। এই সব উদাহরণ অপরাধীদের অনুতাপ ও আদর্শবিহীন ভাবপ্রবণতার সাক্ষ্য দেয়।

"কোনও এক জার্ম্মান অপরাধী অতীব নিষ্ঠুরতার সহিত তার প্রিয়তমাকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের পর, হঠাৎ অপরাধীটার মনে হয়, তার প্রিয়তমার পাখীটা প্রিয়তমার বাসায় অনাহারে পড়ে

আছে, তাকে খেতে না দিলে সে মরে যাবে। অপরাধীটী তখন বিপদ বরণ করেও প্রিয়তমার কুঠিতে ফিরে এসে, পাখীটাকে খাইয়ে আসে। অপর এক অপরাধী কোনও এক নারীকে নৃশংস ভাবে হত্যা করার পর লক্ষ্য করে নিহত নারীর দুগ্ধপোষ্য শিশুটী ক্ষুধায় কাঁদতে সুরু করেছে। অপরাধীটী এই অবস্থায় শিশুটীকে খাওয়াবার জন্য অকুস্থলে বিপদ বরণ করেও থেকে গিয়েছিল। বিখ্যাত অপরাধী ল্যাসানারি একটি হত্যাকাণ্ড সাধিত করে, সেই দিনই আবার সে একটী বিড়াল শিশুর প্রাণ রক্ষার জন্য নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রেছিল।"

এই সকল অত্যদ্ভুত ব্যবহার প্রকৃত অপরাধীরা তাদের ভাবপ্রবণতা অবস্থাতেই দেখিয়ে থাকে, কিন্তু হঠাৎ ভাবপ্রবণতা থেকে তারা তাদের দাম্ভিকতা বা নিষ্ঠুরতার রাজ্যে ফিরে এলে তাদের কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন হয়ে যায়। অপরাধীরা যখন তাদের কু-কর্ম্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে, তা তারা করে তাদের এই সাময়িক ভাবপ্রবণতার জন্যে। এরূপ দুঃখ প্রকাশের মধ্যে, কোনও প্রকার অনুতাপ থাকে না। অনুরূপ ভাবে অপরাধীরা যখন দান ধ্যানি করে, তা তারা করে মাত্র "ভাবপ্রবণতা" অবস্থায় থাকা-কালীন, এই সব দান ধ্যানের মধ্যে কোন প্রকার আদর্শ থাকে না। 'ভাবপ্রবণতার" আরও প্রমাণস্বরূপ "পাগলা হত্যার মামলা" শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করলাম, কলিকাতা পুলিশ জার্নেল, vol I part I. দ্রষ্টব্য।

"আমরা এর পর খাঁদা ওরফে খোকার ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে কিছুটা অনুসন্ধান করি। অনুসন্ধানে জানা যায়, কোনও এক সময় সে জনৈকা বিধবার অবিবাহিতা কন্যার বিবাহের জন্য ৫০০৲ টাকা দান করে। অন্য আর এক সময় সে কোনও এক স্ত্রীলোককে বাড়ী কিনবার জন্য ১০০০০৲ টাকা দিতে চায়, প্রতিদানে সে স্ত্রীলোকটীকে

কেবলমাত্র তার হাতে উল্কি দ্বারা "প্রাণের খেঁদা" এই কথা দুটি লিখে রাখতে বলে। খাঁদার এই সব সাময়িক ব্যবহার যে ভাবপ্রবণতাপ্রসূত হ'ত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

এ ছাড়া আমরা অপরাধীদের প্রায়ই পশু পক্ষী পুষতে দেখি। অনেক অপরাধী তার পোষা কুকুরকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বেসেছে। মানুষের পৃথিবীতে বাস করেও, তারা মানুষকে না ভালবেসে, ভালবাসে জীবজন্তুকে; তার একমাত্র কারণ তাদের অন্তর্নিহিত স্থূল এবং অহেতুক ভাবপ্রবণতা, যা কি'না সাময়িক ভাবে এবং স্নায়বিক কারণে উৎকট অপরাধীদের মধ্যে এসে থাকে। অনেকে অনুমান করেন, এদের নিঃসঙ্গ জীবনের জন্য এদের কেউ কেউ এরূপ করে থাকে। অপরাধীদের এই সব ব্যবহার জেলে থাকা-কালীন ঘটলে, এরূপ বলা যেতে পারে, কিন্তু বহির্জীবনে তাদের সঙ্গীর অভাব নেই, তবু তারা মাঝে মাঝে—শুধু মাঝে মাঝে, সব সময় নয়, জীবজন্তুকে ভালবাসে কেন? এর কারণ সম্বন্ধে অনেকে অপরাধীদের দ্বৈত ব্যক্তিত্ব বা ডবল পারস্‌নালিটির কথা বলে থাকেন। অর্থাৎ কি'না এই সব অপরাধীরা এক সময় থাকে অপরাধী এবং অন্য সময় তারা থাকে নিরপরাধ। এই ক্ষেত্রে অপরাধীদের এই "নিরপরাধ" থাকার সময়টুকুরই অন্য নাম "অপরাধ-বিরাম" এ কথা বলা বাহুল্য। এই "অপরাধ-বিরাম" অবস্থায় থাকা কালীন অপরাধীরা যে সকল দয়া দাক্ষিণ্য দেখায়, তার মধ্যে থাকে আদর্শ এবং অনুতাপ, এই সকল দয়া দাক্ষিণ্যের সঙ্গে অপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট ভাবপ্রবণতার কোনও সম্পর্ক নেই, কারণ প্রকৃত অপরাধীরা যে সকল দয়া-দাক্ষিণ্য দেখায় তার মধ্যে অনুতাপ বা কোনওরূপ আদর্শ থাকে না, এতদ্ব্যতীত এই ভাবপ্রবণতা মাত্র সাময়িক ভাবে প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে এসে থাকে। এই ধরণের দ্বৈত ব্যক্তিত্ব এ দেশের অনেক ডাকাতদলের মধ্যে দেখা

গেছে। এই সব দলে এমন ব্যক্তিও আছে, যাকে স্বগৃহে থাকা-কালীন একজন আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, এবং আদর্শ নাগরিকের মত দেখা গেছে, এই অবস্থায় সেই অপরাধী দান ধ্যান করে এবং তাদের এই দান ধ্যানের মধ্যে অনুতাপ এবং আদর্শও দেখা যায়। এই সময় তারা তাদের পূর্ব্বকৃত অপরাধ সমূহের জন্য অনুতপ্তও থাকে। কিন্তু গৃহের বাইরে এসে সেই একই ব্যক্তি হয়ে ওঠে অনুতাপ এবং আদর্শ-বিহীন দুর্দ্দান্ত ডাকাত। অর্থাৎ কি'না গৃহে থাকা-কালীন এরা থাকে 'অপরাধ-বিরাম" অবস্থায় সহজ মানুষ রূপে। এদের কেউ কেউ একই দিনের একাংশে থাকে "অপরাধ-বিরাম" অবস্থায় এবং সেই দিনেরই অপরাংশে এরা হয় অপরাধী। গৃহে থাকা কালীন আমরা এদের মধ্যে যে স্নেহ প্রীতি অনুতাপ এবং আদর্শ দেখে থাকি, তা তাদের মধ্যে এরূপ দ্বৈত ব্যক্তিত্বের অপরাধ-বিরাম অবস্থার কারণেই এসে থাকে। এই জন্য অপরাধীদের 'নিরপরাধ' থাকা কালীন 'ভাবপ্রবণতার' সহিত তাদের "অপরাধী" থাকা কালীন "ভাবপ্রবণতার" কোনওরূপ সম্পর্ক নেই। আসলে এই "ভাবপ্রবণতা" প্রকৃত অপরাধীদের "স্নায়বিক কারণে প্রবর্ত্তিত' একটী অবস্থা বিশেষ এবং তাদের এই আদর্শ ও অনুতাপ বিহীন ভাবপ্রবণতা কখনও নিরপরাধী বা সহজ মানুষের মধ্যে বর্ত্তায় না। এক কথায় নিরপরাধীদের ভাবপ্রবণতা সুস্থির যুক্তিপূর্ণ ও বহুক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে, এবং তার মধ্যে আদর্শ এবং অনুতাপ দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃত অপরাধীদের ভাবপ্রবণতার মধ্যে কোনওরূপ আদর্শ বা অনুতাপের চিহ্নমাত্রও থাকে না, থাকে মাত্র একটা খেয়াল, এবং তা স্থূল অহেতুক। এবং ক্ষণস্থায়ীরূপে প্রকাশিত হয়। নিরপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট প্রথমোক্ত ভাবপ্রবণতা কখনও কখনও প্রাথমিক অপরাধীদের মধ্যে দেখা গেলেও, ঐ প্রকার ভাবপ্রবণতা প্রকৃত বা উৎকট অপরাধীদের মধ্যে কদাচ দৃষ্ট

হয় না, প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে মাত্র শেষোক্ত ভাবপ্রবণতাই, তাদের দাম্ভিকতা, নিষ্ঠুরতা, অলসতা প্রভৃতি স্থূল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

দাম্ভিকতা

দাম্ভিকতা বা দম্ভবৃত্তি প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে অত্যধিক মাত্রায় দেখা যায়। এদের এই দাম্ভিকতা নানারূপ দম্ভোক্তির মধ্যে প্রকাশ পেয়ে থাকে। এই স্বভাবগত দাম্ভিকতার জন্য অনেক অপরাধী তার অপকর্ম্মের পরিকল্পনা পূর্ব্বাহ্ণেই জানিয়ে দিয়ে কারাবরণের পথ পরিষ্কার করে। অনেকে অপকর্ম্মের পর তার সেই অপকর্ম্মের কাহিনী ফলাও করে বর্ণনা ক'রে নিজের বিরুদ্ধে নিজেই সাক্ষ্য তৈরী ক'রে থাকে। এই বিশেষ স্বভাব এদের মধ্যে এমনি মজ্জাগত ও দুর্দ্দমনীয় হয়, যে তারা অনেক সময় নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এরূপ দম্ভোক্তি করতে বোধ হয় বাধ্য হয়। এই দাম্ভিকতার কারণে অনেক অপরাধী তার অপকর্ম্মের কাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজেদের "রোজনামচা" বা "ডাইরি বুকে" লিখে রেখেছে, এমনও দেখা গেছে। জন্ উইল্কি বুথ নামে বিখ্যাত খুনে অপরাধী তার ডাইরি বুকে, খুন সম্বন্ধীয় একটী বিবরণ লিখে রেখেছিল, পরে এই ডাইরী বুক পুলিশের হস্তগত হয়, পুলিশ তা খুনের প্রমাণ স্বরূপ আদালতে দাখিল করে খুন প্রমাণিত করে। ডাইরি বইটীতে এরূপ লেখা ছিল, "আমি নির্ভিকচিত্তেই তাকে আঘাত করেছিলাম, এ সম্বন্ধে খবরের কাগজে যা বেরিয়েছে, তা সর্ব্বৈব মিথ্যে। আমি বীর-বিক্রমে তার অগণিত বন্ধুদের বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে আসি। উপর থেকে লাফিয়ে পড়ায় আমার পা ভেঙে যায়। কিন্তু এতে আমি কিছুমাত্র বিচলিত হই না, প্রহরীদের হাত এড়িয়ে

আমি নির্ব্বিঘ্নে পালিয়ে আসি। এবং সেই রাত্রেই আমি প্রায় ৬০ মাইল পথ অশ্বারোহণে অতিক্রম করি। অশ্বের লম্ফনে আমার ভাঙা পা'র হাড় হ'তে মাংস খসে পড়ছিল কিন্তু তাতেও আমি ভগ্নচিত্ত হই নি।" ডাইরির অন্য আর এক জায়গায় লেখা ছিল, "পুলিশের দল আমাকে ঝোঁপঝাড়, বাগিচা ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে। কাল রাত্রে তারা নৌকাযোগে আমাকে তাড়া করে আমাকে পলায়নে বাধ্য করে। আমি নিরাপদ স্থানে ফিরে আসি বটে, কিন্তু ততক্ষণে আমার গা বরফের মত হিম হয়ে গেছে, ক্ষুধায় আমি কাতর, আজ সকল সভ্য মানুষই আমার উপর খড়্গহস্ত, কিন্তু কেন? কি জন্যে? যে কাজের জন্য ব্রটাসকে সম্মানিত করা হয়েছিল, যে কাজের জন্য টেল বীর আখ্যায় ভূষিত, সেরূপ একটা কাজই ত আমি করেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা কেন আমাকে এমন করে খেদিয়ে বেড়াবে।"

সাধারণতঃ শোণিতাত্মক অপরাধীদের এবং এদের পরই শোণিত সাম্পত্তিক অপরাধীদের মধ্যে এই বিশেষ দম্ভবৃত্তি অধিক মাত্রায় দেখা যায়। প্রমাণ স্বরূপ "পাগলা হত্যার মামলা" শীর্ষক প্রবন্ধ হ'তে একটী বিশেষ বিবৃতি তুলে দেওয়া হ'ল। কলিকাতা পুলিশ জার্নেল Vol. I. Part I. দ্রষ্টব্য। নিষ্ক্রিয় অপরাধীদের এই দম্ভবৃত্তি সাধারণতঃ তাদের হাবভাবে প্রকাশ পায়, কখনও কখনও এরা মাত্র অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মীদের নিকট তাদের কুকর্ম্ম সম্বন্ধে দম্ভোক্তি করে, কিন্তু শোণিতাত্মক ও শোণিত সাম্পত্তিক অপরাধীরা তাদের অন্তর্নিহিত দম্ভবৃত্তির কারণে এই সব কুকর্ম্মের কথা বেপরোয়া ভাবে যার তার কাছে বলে না বেড়িয়ে পারে না। নিম্নের বিবৃতিটী প্রণিধানযোগ্য।

"আমি গো-বাবুর রক্ষিতা নারী। সেদিন গো-বাবু রাত্রি প্রায় বারটায় মাতাল অবস্থায় বাড়ী ফিরে। আমি তাকে শুধোই, 'এত দেরী

কেন ?' উত্তরে গো-বাবু ধমকে উঠেন, 'চুপ কর শালী, একটা কাণ্ড হয়েছে কাল খবরের কাগজে পড়বি'খন।' সকালে উঠে আমি গো-বাবুর পরিধেয় বস্ত্রে রক্তের দাগ দেখি, এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে উঠে, 'বুঝছিস এবার কি হয়েছে, যা টপ করে কাপড়টা কেচে আন।' আমি কাপড়টা সাবান দিয়ে কেচে দিই। গো-বাবু ওই দিনেই আমাকে হাওড়ার একটা বাড়ীতে সরিয়ে এনে তাদের বীরত্বের কাহিনীটুকু আমাকে জানিয়ে দেয়। দুই একদিন পর গো-বাবুকে আমি বিশেষ বিচলিত দেখি। সে কোনও এক গণক ঠাকুরের নিকট ভাগ্য গণিয়ে আসে, গণক ঠাকুরের মতে মাস দুই গা ঢাকা দিতে পারলে সে আর ধরা পড়বে না। গণক ঠাকুরের লেখা সেই কাগজটা আমি আমার ট্রাঙ্কে তুলে রেখেছি। লিপিকাটি আমি আপনাদের এনে দিতে পারি।"

ভিডোক সাহেবের মতে, প্রকৃত অপরাধীরা নিজেদের উৎকট অপরাধী রূপে প্রখ্যাত হওয়ার মধ্যে গর্ব্ব অনুভব করে, অপ্রখ্যাত অপরাধীরা অপরাধী সমাজের ঘৃণার বস্তু। এমন কি যে সকল অপরাধীরা মাত্র স্বল্প কালের জন্য কারাবরণ করে, অপরাধী সমাজ তাদেরও ঘৃণার চক্ষে দেখে থাকে। প্রকৃত অপরাধীদের অন্তর্নিহিত দম্ভবৃত্তিই এদের এরূপ মনোবৃত্তির একমাত্র কারণ। "অপরাধ-সমাজ" শীর্ষক পরিচ্ছেদে বিষয়টী সম্যকরূপে আলোচিত হবে। পুরাকালে ডাকাতাদি অপরাধীরা দেহের উন্মুক্ত স্থানে বীরত্বসূচক উল্কি ধারণ করত, কেউ কেউ রাজার ন্যায় বেশভূষায় ভূষিত হ'ত—এরূপ ব্যবহারও এদের মধ্যে অত্যধিক দম্ভবৃত্তির কারণে এসে থাকে। রাশিয়ার কোন এক যুবক একটা গোটা পরিবারের সমুদয় ব্যক্তিকেই নিহত করে এরূপ এক উক্তি করে—এইবার আমার সহপাঠিরা বুঝতে পারবে, "আমি কখনও প্রখ্যাত হব না," তাদের এই ধারণা কিরূপ ভুল। এ ছাড়া অপরাধীদের

মধ্যে আমরা অনেক রকম ব্রাভাডো বা বাহাদুরী দেখে থাকি। এই সব ব্রাভাডো বা বাহাদুরীও দাম্ভিকতা প্রসূত হয়ে থাকে। এই ব্রাভাডো বা বাহাদুরীর জন্যে প্রকৃত অপরাধীদের অনেকে অকারণে বিপদ বরণ করে। উত্তর কোলকাতার প্রখ্যাত খুনে খাঁদা ওরফে খোকাবাবু এরূপ অনেক ব্রাভাডো বা বাহাদুরী দেখিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করত। এ সম্বন্ধে কলিকাতা পুলিশ জার্নেল Vol. I. Part I. ৫৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "পাগলা হত্যাকাণ্ড" শীর্ষক প্রবন্ধ হ'তে কিয়দংশ নিয়ে লিপিবদ্ধ হ'ল।

"এই সময় হ'তে গো-বাবু এবং তাদের ওস্তাদ খাঁদা অতি মাত্রায় বেপরোয়া হয়ে উঠে। তারা প্রায়ই আমাদের থানার আশে পাশে ঘোরাঘুরি স্থুরু করে। মাঝে মাঝে পুলিশের অবর্ত্তমানে, তারা কৃপানাথ লেনে খাঁদার বাড়ীতেও ফিরে আসত। শুধু তাই নয়, সেখানকার সাক্ষীগণকে ভয় দেখিয়ে এবং শাসিয়েও আসত। একদিন অফিসারদের "নাইট রাউণ্ডের" সময় খাঁদা রিক্সাওয়ালা সেজে রিক্সা সমেত থানার সামনে এসে দাঁড়ায়। সৌভাগ্যক্রমে কোন অফিসার সেদিন তার রিক্সায় উঠে নি। জনৈক উকিলবাবু কার্য্যব্যপদেশে থানায় এসেছিলেন। তিনিই সেদিন সেই রিক্সাখানি ভাড়া করেন। খাঁদা বিনা বাক্যব্যয়ে উকিল বাবুকে গৃহে পৌছিয়ে দিয়ে বলে উঠে, 'সৌভাগ্যক্রমে আপনি উঠেছিলেন, পুলিশ অফিসারদের কেউ উঠে নি। যাই হোক, তাঁদের বলবেন, আমি খাঁদা, ভাগ্যক্রমে তাঁরা এ যাত্রা বেঁচে গেলেন।' এর পর গুজব রটে, খাঁদা খড়া বয়ে কোয়ার্টারে উঠে তদন্তকারী অফিসারদের হত্যা করবে। আমরা এ সম্বন্ধে প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করি। এর পর থেকে "রেইডে" বার হবার সময় আমরা কোটের তলায় লোহার বর্ম্ম বা জামা পরতাম, বাম হাতে লোহার ঢাল এবং ডান হাতে পিস্তল নিয়ে এই সব অপরাধীদের সম্ভাব্য ডেরাগুলিতে আমরা হানা দিতাম।"

এই দাম্ভিকতা স্বল্প বা অধিক মাত্রায় আমরা কোনও কোনও সাহিত্যিক, গায়ক ও শিল্পীদের মধ্যেও দেখে থাকি, কিন্তু তাদের এই দাম্ভিকতা এরূপ স্থূলভাবে প্রকাশিত হয় না, তার মধ্যে কিছুটা যুক্তি এবং উদ্দেশ্যও থাকে। তবে এরূপ অহেতুক দাম্ভিকতা সাহিত্যিক এবং শিল্পীদের মধ্যে দেখা গেলে বুঝতে হবে, তাদের মধ্যে কিছুটা অপস্পৃহা স্থান পেয়েছে এবং তাদের এই বাড়তি অপস্পৃহা তাঁরা এভাবে দাম্ভিকতার পথে নিষ্কাশিত করে দিতে চান। এর কারণ সম্বন্ধে পুস্তকের ৮৭ পৃঃ-য় ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই ধরণের দাম্ভিকতা কারও মধ্যে দেখা গেলে বুঝতে হবে তার মধ্যে নৈতিক অবনতি সুরু হয়েছে। এই ধরণের দাম্ভিকতা কেবলমাত্র প্রকৃত বা উৎকট অপরাধীদের মধ্যেই দেখা যায়, সহজ মানুষ বা প্রাথমিক অপরাধীদের মধ্যে দেখা যায় না।

নিষ্ঠুরতা বা নিষ্ঠুরবৃত্তি

নিষ্ঠুরতা বা নিষ্ঠুরবৃত্তি প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে অত্যন্ত প্রকটরূপে দেখা যায়। এই নিষ্ঠুরতা বা নিষ্ঠুরবৃত্তি অপরাধীদের মধ্যে উদয় হওয়া মাত্র তারা অপকর্ম্ম করে থাকে, অপস্পৃহা অপরাধীদের নিষ্ঠুরতার রাজ্যে এলে তবে সেটা কার্য্যকরী হয়ে উঠে এরূপও বলা যেতে পারে। প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে এই নিষ্ঠুরবৃত্তি প্যাসিভ এবং এ্যাকটিভ্, এই উভয়রূপেই প্রকাশ পায়। মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত বা জাগ্রত শোণিত স্পৃহাই এই বিশেষ অবস্থার জন্য দায়ী। সক্রিয় শোণিতাত্বক অপরাধীদের এই নিষ্ঠুরবৃত্তি, সকল সময়েই এ্যাকটিভ্রূপে প্রকাশ পায়। এই শোণিতাত্বক অপরাধীরা কতদূর পর্য্যন্ত নিষ্ঠুর হ'তে পারে, তা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে "পাগলা

হত্যাকাণ্ড" শীর্ষক কাহিনীতে বলা হয়েছে। বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া যাক। নিম্নোক্ত কাহিনীগুলি প্রণিধানযোগ্য।

"কোনও এক স্পেনীয় জলদস্যু সর্দ্দার আমেরিকার একস্থানে হানা দিয়ে, বিপক্ষ দলের এক নেতার বক্ষে আমূল ছুরিকা বসিয়ে দেয়। কিন্তু তাতেও সে ক্ষান্ত না হয়ে, ছুরিকাবিদ্ধ ছিদ্রপথে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়ে হৃৎপিণ্ডটা মুচড়ে ছিঁড়ে বাইরে টেনে এনে সেটা মুখে পুরে কচকচিয়ে চিবিয়ে খেয়েছিল।" "বুনোস্ অয়ারে কোনও এক অপরাধী দ্রব্যাপহরণের উদ্দেশ্যে আপন পিতাকে নিহত করে, কিন্তু এই হত্যার পর প্রয়োজনীয় অর্থাদি না পেয়ে, সে মাতাকে পীড়ন করার উদ্দেশ্যে, তার পা দুইটা জ্বলন্ত উনানের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য, মাতার নিকট হ'তে স্বীকারোক্তি আদায় করা।" "মধ্যযুগে কোনও এক দস্যু-জাহাজ দিশেহারা হয়ে অকূল সমুদ্রে পথ হারায়। কিছুকাল অনাহারে থাকার পর, বলবান নাবিকগণ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল নাবিকদের নিহত করে না'কি তাদের মাংস ভক্ষণ করেছিল।" রোমি সাহেব বালক অপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে কিছুটা অনুসন্ধান করেন। তিনি এমন একজন অপরাধীর খোঁজ পান, যে কি'না বাল্যকালে পক্ষীশাবকদের ধরে, তাদের পালক উপড়ে ফেলে, জীবন্ত পুড়িয়ে মারত। অন্য আর এক অপরাধী তার বাল্যকালে, পিতা কর্ত্তৃক প্রহৃত হ'লে অসহায় জন্তুদের উপর অত্যাচার করে পিতার উপর প্রতিশোধ নিতো।"

সক্রিয় নিষ্ঠুরতার কথা বলা হল, এবার নিষ্ক্রিয় নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্। সক্রিয় নিষ্ঠুরতার ন্যায় নিষ্ক্রিয় নিষ্ঠুরতাও দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গোপনে "চুরি করার" কথা বলা যায়। গোপনে চুরি করলে গৃহস্থের ক্ষতি সাধন হয়—এই ক্ষতি সাধনের স্পৃহার মধ্যে থাকে নিষ্ক্রিয়

নিষ্ঠুরতা। অপরাধ স্পৃহা যে পরিমাণে বর্ত্তিয়ে থাকে, অপরাধীরাও সেই পরিমাণে নিষ্ঠুর হয়। এই কারণে স্বভাব অপরাধীদের আমরা অত্যধিকরূপে নিষ্ঠুর হ'তে দেখি। অপরাধীদের মনের পথে—অলসতা, ভাবপ্রবণতা, দাম্ভিকতা এবং নিষ্ঠুরতা, যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং শেষ ধাপ। অপস্পৃহা যথাক্রমে এই ধাপ কয়টীতে উঠা নামা করে। এই অপস্পৃহা ভাবরাজ্যে এলে অপরাধীরা হয় অত্যধিক ভাবপ্রবণ, দম্ভের রাজ্যে এলে তারা হয় অত্যন্ত দাম্ভিক এবং সেটা তাদের নিষ্ঠুর রাজ্যে এলে অপরাধীরা হয়ে উঠে অত্যন্ত নিষ্ঠুর। অপস্পৃহার ক্রমাবির্ভাব দ্বারা অপরাধীরা নিষ্ঠুর হওয়া মাত্র, তারা অপকর্ম্ম সুরু ক'রে তাদের বাড়তি অপস্পৃহার নিষ্কাশন ঘটিয়ে তৃপ্ত হয়। বন্দীকৃত অবস্থায় এরূপ "নিষ্ঠুরতা" উদয় হ'লে, অপরাধীরা বন্দীদশার জন্যে অপকর্ম্মে অক্ষম থাকে। ফলে অপকর্ম্মের দ্বারা তারা তাদের মধ্যে জাত বাড়তি অপস্পৃহার নিষ্কাশন ঘটাতে পারে না। এবং তার অবশ্যম্ভাবি ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে চিত্তবিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় তারা দুর্দ্দমনীয় বেগে পলায়নের চেষ্টা করে, অপারক হ'লে তারা গাল দেয়, মাথা খুঁড়ে রক্তপাত করে, মাথার চুল ছেঁড়ে, মেঝের উপর গড়াগড়ি দেয়, অনেকে রেগে আহারও বন্ধ করে। শান্তিরক্ষক মাত্রেই অবগত আছেন, অপরাধীরা কিরূপ ভাবে সময় সময়, সহসা দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠে প্রচণ্ড শক্তিতে শান্তিরক্ষকদের হেপাজত হ'তে পলায়ন করে। অপরাধ স্পৃহা, অপরাধীদের মনের পথের শেষ ধাপ এই "নিষ্ঠুরতার দেশে" এসে সহসা প্রতিরুদ্ধ হওয়ার জন্যেই এই চিত্তোবিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অপকর্ম্মের অব্যবহিত পরে ধরা পড়লে প্রকৃত অপরাধীরা পলায়নের চেষ্টা করে না বরং সেটা তারা তাদের এক স্বাভাবিক পরিণতি মনে করে। এই সময় তারা প্রায়ই তাদের অলসতা, ভাবপ্রবণতা কিংবা দাম্ভিকতার রাজ্যে থাকে, এই জন্য

এই সময় তাদের শান্ত এবং নিশ্চেষ্ট দেখা যায়—অপস্পৃহার সাময়িক নিবৃত্তি হওয়ার জন্যই প্রকৃত অপরাধীরা এই সময় সুবিধা সত্বেও পালায় না। কিন্তু দুই তিনদিন বা দুই তিনঘণ্টা হাজত বাসের পর, হঠাৎ কোনও এক সময় অপরাধী বিশেষের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কারণে "চিত্ত-বিক্ষোভের" সৃষ্টি হ'তে পারে। এরূপ অবস্থায়, সুবিধা পাওয়া মাত্র তারা বেগে পলায়নপর হয়, সুবিধা না পেলে তারা ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যবহার করে। অপকর্ম্মের দুই বা তিনদিন পর; পুলিশ-হেপাজতী আসামীদের তদন্ত ব্যপদেশে, বাইরে নেবার সময় তদন্তকারী অফিসারদের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ কোন অশুভ মুহূর্ত্তে তাঁর সেই শান্ত-শিষ্ট অপরাধীটী "চিত্ত-বিক্ষোভ" জনিত কিরূপ দুর্দ্ধর্ষ, হিংস্র ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠবে তা কেউ বলতে পারে না। এই চিত্ত-বিক্ষোভ রোগে অপরাধীরা জেলে আবদ্ধ থাকাকালীন অধিক ভোগে। মি এইচ্ মেহিড'র মতে, কোনও কোনও অপরাধী নিজেরাই জানিয়ে দেয়, তাদের এই রোগ আসছে এবং রক্ষকদের এই সময়ের জন্য তাদের প্রস্তর-নির্ম্মিত কক্ষে নিক্ষেপ করবার জন্যে নিজেরাই অনুরোধ জানায়, ইয়ুরোপীয় অপরাধীরা তাদের এই চিত্ত-বিক্ষোভকে ব্রেকিং আউট, ভাঙন বা চম্পট বলে থাকে, রজঃস্বলা অবস্থায় মেয়ে অপরাধীদের মধ্যেও এরূপ চিত্ত-বিক্ষোভ দেখা গেছে। মিস্ মেরি কারপেনটার তাঁর "ফিমেল লাইফ ইন্ প্রিসিন্স" নামক পুস্তকে কোনও এক কয়েদীর সহিত এই সম্বন্ধে তাঁর কথোপকথনের এক চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়েছেন। প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ হল।

"হাঁ, মিস্‌জী, আজকেই আমি ভেঙে পালাচ্ছি। হাঁ গো হাঁ, সত্যি বলছি। দেখো তুমি—'

'কেন? তোমাকে কি কেউ বকেছে? তোমাকে কেউ বকে নি; দুঃখও দেয় নি; রাগায়ও নি কেউ, অথচ—'

'না না, কেউ কোনও দোষ বা অবিচার আমার উপর করে নি, কিন্তু তবুও আমি ভাঙব আজই রাত্রে, জেলজীবন আমার অসহ্য হয়েছে। আমি আর পাচ্ছি না।'

'তা হ'লে তোমাকে অন্ধকূপে (ডার্ক সেল) নিক্ষেপ করা হবে, বুঝলে—'

'বেশ ত। আমি অন্ধকূপেই (ডার্ক সেল) যাব।'

প্রতিজ্ঞামত কয়েদীটী সেই রাত্রেই ভাঙতে চেষ্টা করে। জানালার কাঁচ সে ভেঙে চূরমার করে দেয়। জিনিসপত্র সে তছ্‌নছ্‌ করে। রক্ষীগণ ছুটে আসে, শেষে রীতিমত একটা লড়াই বেধে যায়। কয়েদীটী রক্ষীদের দেহের স্থানে স্থানে আঁচড়ে ও কামড়ে দেয়, তাকে আয়ত্তে আনতে রক্ষীদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে।"

এ চিত্ত-বিক্ষোভের সঙ্গে কতকটা হিষ্ট্রিয়ার তুলনা কর চলে। ইংরেজীতে একে বলে "ইমোসনেল ইনস্‌ষ্টেবেলিটী" অসভ্য মানুষ, শিশু বালক, নির্ব্বোধ এবং জড় ব্যক্তিদের মধ্যে এরূপ চিত্ত-বিক্ষোভ আমরা অধিক দেখে থাকি। অপরাধীরা যে আদিম মানুষের উত্তরাধিকারী তা ইহা হ'তে প্রমাণিত হয়। অপরাধী তার নিষ্ঠুরতার রাজ্যে এসে অপ কর্ম্মে অক্ষম হ'লে এ চিত্ত-বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অপস্পৃহা প্রতিরুদ্ধ হওয়ার জন্যেই এরূপ হয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে হ্যাভল্যক এলিস সাহেবের "দি ক্রিমিন্যাল" নামক পুস্তকের ১৮০ পৃষ্ঠায় একটী উল্লেখযোগ্য বর্ণনা আছে। বর্ণনাটী নিম্নে লিপিবদ্ধ হল। অপস্পৃহার অবস্থিতির এটা একটী বিশেষ প্রমাণ।

"মানসিক পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্যে অনেকগুলি উৎকট অপরাধীকে আমি আমার হেপাজতে রাখি। এদের মধ্যে একজনকে আমি হঠাৎ পাগলের মত হ'তে দেখি। তাকে অবিরত চিন্তারত দেখা যায়, তা ছাড়া

দুবার সে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। আমি তার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান ও আহারের পরিবর্ত্তন ঘটাই, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ভাল হয় না, এ সম্বন্ধে তার সঙ্গে বাদানুবাদ করলে সে এরূপ বলে—"পূর্ব্বে আমার এরূপ অবস্থা হ'লে, আমি অপরাধ করতাম এবং এরূপে আমি নিরাময়ও হ'তাম, আজ আমি অপকর্ম্ম করতে অক্ষম, তাই আমার মনে হয় আমি পাগল হয়ে যাব।"

অপরাধীটীর এ উক্তিটী হ'তে, "নিষ্ঠুরতার রাজ্যই" যে অপস্পৃহার শেষ অবস্থিতি বা শেষ ধাপ এবং তা প্রতিরুদ্ধ হ'লে যে "চিত্ত-বিক্ষোভের" উপস্থিতি বা সৃষ্টি হয় তা প্রমাণিত করে।

নৈতিক অসাড়তা

অসাড়তা দুই প্রকার, নৈতিক এবং দৈহিক। প্রথমে নৈতিক অসাড়তা বা মর‍্যাল ইনসেনসিবিলিটীর কথা বলা যাক। এ নৈতিক অসাড়তা বা নীতি-জ্ঞানহীনতা প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে বিশেষরূপে দেখা যায়। অপস্পৃহার অবস্থিতি বা আগমন হেতু, স্নায়বিক পরিবর্ত্তনের জন্যে, এ নৈতিক অসাড়তা মানুষের মনে স্থান পায়। এ নৈতিক এবং দৈহিক অসাড়তার জন্যে প্রকৃত অপরাধীরা কখনও লজ্জিত বা ব্রীড়ানম্র (ব্লাস) হয় না। পৃথিবীর যা কিছু অমঙ্গল তা মানুষের এই নৈতিক অসাড়তার মধ্যে নিহিত থাকে, এরূপ নৈতিক অসাড়তার জন্যে আমরা মা ও মেয়েকে একত্রে বেশ্যাবৃত্তি ক'রতে দেখি ; এই অসাড়তার জন্যেই, ব্যক্তিবিশেষ তার আপন স্ত্রীরও দেহবিক্রয় করে, শ্বশুর পুত্রবধূর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, ভাই বোনকে ধনী বন্ধুর (?)

কাছে এগিয়ে দেয়, আপন স্ত্রী এবং বেশ্যাকে একত্রে নিয়ে মানুষ প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করে। অপরাধীদের এ নৈতিক অসাড়তা দূরদৃষ্টি-হীনতা, অনুতাপবিহীন ভাব এবং অহেতুক আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও সংপ্রীতি সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হয়েছে। এ নৈতিক অসাড়তার জন্যেই আমরা প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে অনুতাপের অভাব দেখি। অধিক অপকর্ম্মে অক্ষম হ'লে, কিংবা বুদ্ধির দোষে ধরা পড়লে, অপরাধীরা দুঃখ প্রকাশ করে বটে কিন্তু এরূপ দুঃখ প্রকাশকে অনুতাপ নামে অবিহিত করা চলে না। জেলের মধ্যে যদি কোনও অপরাধীকে অনুতাপ করতে দেখা যায়, তাহ'লে অনুসন্ধানে জানা যাবে অপরাধীর অপকর্ম্ম ক্রোধবশতঃ কিংবা দৈব দুর্ব্বিপাকে সংঘটিত হয়েছে। এই নৈতিক অসাড়তার জন্যে অপরাধীদের মধ্যে আমরা অনুতাপবিহীন দানবীয় নিষ্ঠুরতা দেখে থাকি। এ নৈতিক অসাড়তাকে নিষ্ঠুরতার প্রকার ভেদ বলা যায়। "দাম্ভিকতা" অপরাধীদের "নিষ্ঠুরতার" প্রথম বা পূর্ব্ব ধাপ, এজন্য অপরাধীদের দম্ভোক্তির মধ্যেও আমরা নৈতিক অসাড়তার সন্ধান পাই। এ সম্বন্ধে হ্যাভল্যক এলিস সাহেবের "দি ক্রিমিন্যাল" নামক পুস্তকের ১৪৫ পৃঃ হ'তে কয়েকটী চিত্তাকর্ষক উক্তি তুলে দেওয়া হ'ল।

"বল কি, তোমার অপকর্ম্ম পূর্ব্বকল্পিত ছিল?" জজ জিজ্ঞাসা করলেন। 'হাঁ, তাই বটে, আমি গত আট মাস ধরে একথা ভেবেছি—"বল কি এঁ্যা! এ যে সর্ব্বনেশে কথা।"—'অপরাধটা আমার এপ্রেলেই শেষ করা উচিত ছিল, কিন্তু হাতে পয়সা না থাকায় আমি তা জানুয়ারীতে শেষ করি।' কোনও এক খুনেকে ফাঁসীর জন্য বধ্য স্থানে নেওয়া হচ্ছিল। পথিমধ্যে তার এক বন্ধুকে দেখে সে উচ্চহাস্যে চেঁচিয়ে উঠে, 'আরে, ও, ও ভাই, শুনেচ আমার ফাঁসীর হুকুম হয়েছে।' কোনও এক আলবেনিয়ান হত্যাকারী হত্যাকাণ্ডের পর এরূপ উক্তি করে—'হায় রে আমার গুলির

দামও উঠল না, বেটার পকেটে মাত্র এই কটী মুদ্রা, ছিঃ!' জজ বলিল, 'কিন্তু তুমি ত আত্মহত্যা করতে গিছলে, তোমার ব্যবহার কি অনুতাপ নির্দ্দেশক নয়?'—'না, না, মোটেই তা নয়, পুলিশের হাত এড়াবার জন্যেই শুধু আমি ঐরূপ চেষ্টা করি।"

অপরাধীদের এই অনুতাপবিহীন ভাবপ্রবণতা, স্থূল দাম্ভিকতা, নিষ্ঠুরতা এবং নৈতিক অসাড়তা, উৎকট অপরাধীদের মধ্যে বিকারহীন ধৈর্য্য ও সাহস আনে—এই সাহসিকতা প্রভৃতির মধ্যে কোনও প্রকার উদ্দেশ্য বা আদর্শ থাকে না, থাকে শুধু অর্থহীন অভিব্যক্তি। উত্তর কলিকাতার প্রখ্যাত খুনে খাঁদা গুণ্ডা সম্বন্ধে এরূপ লেখা আছে, কলিকাতা পুলিশ জার্নেল ৬৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য—কাহিনীটী উপরোক্ত সত্য প্রমাণিত করে। "৩১এ জুলাই ১৯৩৭, ফাঁসীর দিন, সকাল ছটায় উঠে, খাঁদা এক শিশি সুগন্ধি চায় এবং কিছু ফুলও। তার শেষ ইচ্ছা-স্বরূপ এগুলি তাকে দেওয়া হয়। সে তখন দাড়ী কামিয়ে সিল্কের পাঞ্জাবী ও ফুলের মালা পরে উত্তর করে, 'চলুন, এবার আমি প্রস্তুত।' আমরা শুনেছি সে নির্ভিক-চিত্তে এবং হাসিমুখেই ফাঁসী-মঞ্চে উঠে দাঁড়ায়।"

এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটী দেশী উদাহরণ দেওয়া যাক। কোনও এক বণিক ভদ্রলোককে অনুরোধ করা হয়, পাড়ার বেশ্যাবাড়ী কয়টী যাতে উঠে যায় তার জন্যে তিনি যেন একটু চেষ্টা করেন, অনুরোধটী শুনবামাত্র ভদ্রলোকটী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠেন, "আরে রাম রাম, এমন কাজ কক্ষন করবেন না। বাড়ীর ছেলেপুলে হারিয়ে গেলে, তাড়াতাড়ি খুঁজে পাওয়া যায়। ওদের উঠিয়ে দিয়ে শেষে ছেলেদের খুঁজতে, দূরে ভিন্ পাড়ায় যাই আর কি!" এই ধরণের উক্তি প্রাথমিক অপরাধীরাও করে থাকে। প্রকৃত অপরাধীদের উক্তির মধ্যে নৈতিক অসাড়তার পরিমাণ আরও অধিক থাকে; প্রকৃত অপরাধীদের উক্তিগুলি হয়

এরূপ। কোনও এক পিক-পকেট জনৈক ভদ্রলোকের পকেট কেটে কিছু না পেয়ে, বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠে, "যেত শালা ভিক মাঙনে-ওয়ালা আছে, পকেটে সে কুচ্ছু রাখে না"—"কি মশই অত কথা কি বলছেন, পকেটে ত মশই আপনার কুচ্ছু নেই।" কোনও এক অপরাধীকে চাকরী করতে বলায় সে এরূপ উক্তি করে, "চাকরী করবি তু শালারা, হামি লোক শেয়ানা আছি হামি লোক চাকরী করবে?" কোনও এক অপরাধীকে তার অবৈধ শিশু সন্তানটীকে এরূপভাবে আদর করতে শুনা যায়—"এ শালে বড় হবে ত হাম্‌সে ভি বড়ো চোর হবে, এ শালে বেদাগী চোর হবে।" এই নৈতিক অসাড়তার প্রমাণস্বরূপ এদেশীয় একটী ভদ্র সন্তানের এক চিত্তাকর্ষক উক্তি তুলে দিলাম। নিম্নের বিবৃতিটী পড়ে দেখুন।

"কোনও একটী বাটীর দ্বিতলে একজন যুবক এবং তার ত্রিতলে একজন বিপত্নীক বাস করতেন, এঁরা উভয়েই নাকি রাত্রিযোগে স্ব স্ব ফ্ল্যাটে স্ত্রীলোক আমদানী করতেন, ব্যাপারটী পাড়ায় প্রকাশ পেলে, পড়শীরা ঈর্ষান্বিত ও ক্রোধান্বিত হয়ে পুলিশে নালিশ জানায়। এই সম্বন্ধে দ্বিতলের ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি কেঁদে ফেলে উত্তর করেন—'ছিঃ ছিঃ, এ কি কথা, আমি পান সিগারেট এমন কি চা'ও ব্যবহার করি না, স্ত্রীলোক ত দূরের কথা, আমার স্ত্রী জানতে পারলে আত্মহত্যা করবেন! পিতা এ কথা শুনলে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন।' কিন্তু এ সম্বন্ধে ত্রিতলের ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি এরূপ বলেন, 'তাই নাকি, বেশ বেশ আপনি মশাই দয়া করে এ সব কথা যদি কাগজে ছাপিয়ে দেন!' অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করি, 'তার মানে?' —'তার মানে, আমাকে তা হ'লে আর কষ্ট করে ওদের সংগ্রহ করে আনতে হয় না, তারা বিনাপ্রচেষ্টাতেই আমার কাছে এসে যায়।"

ভদ্রলোক উত্তর দেন। এই উক্তি থেকে আমি বুঝতে পারি, দ্বিতলের ভদ্রলোকটীর মধ্যে নৈতিক অসাড়তা তখনও পর্য্যন্ত আসে নি, কিন্তু ত্রিতলের ভদ্রলোকটীর মধ্যে নৈতিক অসাড়তা পুরামাত্রায় এসে গেছে, যদিও কিনা জানা গিয়েছিল যে, উভয় ভদ্রলোকই একই পথের পথিক।

এই সম্পর্কে অপর এক চিত্তাকর্ষক ঘটনা নিয়ে উদ্ধৃত করা হ'ল।

"কোনও এক অসৎ শ্রমিক ক্লাকমেইলিঙএর উদ্দেশ্যে কোনও এক ফ্যাক্টারীর ছোট লেবার অফিসারের নামে মিথ্যা করে অভিযোগ এনেছিল এই ব'লে যে, সে তার স্ত্রী ও ভগ্নীকে তার কোয়ার্টারে তিন দিন নিয়ে গিয়েছিল, একটী চাকুরী পাবার আশায়। এবং ঐ ছোট লেবার অফিসার তার পত্নী ও ভগ্নীকে তিন দিন উপভোগ করেছে, কিন্তু তা স্বত্বেও সে তাকে কোনও চাকুরী দেয় নি। এই অভিযোগ অবগত হওয়া মাত্র ঐ ছোট লেবার অফিসার ভয়ে লজ্জায় ও অপমানে দিশেহারা হয়ে হতমান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ ফ্যাক্টারীর বড় লেবার অফিসার এই সকল কাহিনী শুনে তদন্তকারী অফিসারকে নিঃসঙ্কোচে বলেছিলেন, 'আজ্ঞে আপনারা ভুল করেছেন। অপকর্ম্মটী উনি করেন নি, অপকর্ম্মটী করেছি আমি। কিন্তু ঐ লোকটীর বিরুদ্ধে আমারও এক পাল্টা অভিযোগ আছে। আমার নিকট হতে দুই শত টাকা গ্রহণ করে ঐ লোকটী তার স্ত্রী ও ভগ্নীকে আমার গৃহে একমাস আনবে বলেছিল, কিন্তু মাত্র তিন দিন তাদের এনে আর উনি তাদের আনেন নি।"

নৈতিক অসাড়তা দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—যৌনজ এবং অযৌনজ। যৌনজ নৈতিক অসাড়তা সম্বন্ধে উপরে বলা হয়েছে এইবার অযৌনজ অপকর্ম্ম সম্বন্ধে বলবো। নিম্নের উদাহরণ কয়টী। এই সম্পর্কে প্রণিধান যোগ্য।

"অষ্ট্রেলিয়ার কোনও এক কয়েদখানায় জনৈক অপরাধী তার সাথী অপরাধীটীর কাছ থেকে তাম্বুল চায়। সাথী অপরাধীটী তাকে তাম্বুল দিতে অস্বীকার করায় অন্য অপরাধীটী অকুস্থলেই তাকে হত্যা করে তার মুখ হ'তে তাম্বুল নির্গত করে নিয়ে, তা সে নিজের মুখে পুরে চিবতে থাকে।" নিষ্ঠুরতা, হিংসা, আত্মসর্ব্বস্বতা, নৈতিক অসাড়তা প্রভৃতি অপরাধীদের অন্তর্নিহিত অত্যধিক শোণিত স্পৃহার এক একটী অভিব্যক্তি মাত্র। পূর্ব্বকথিত নিষ্ঠুরবৃত্তি বা নিষ্ঠুরতা অপরাধীদের মনের পথের শেষ ধাপ, একথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এই নিষ্ঠুর বৃত্তি বা নিষ্ঠুরতা উপরের অতগুলি ভাব বা বৃত্তির একত্র সংমিশ্রণে তৈরী, এই জন্যে অপরাধীরা তাদের মনোদেশের অন্তর্গত নিষ্ঠুরতা রাজ্যে আসামাত্র যে কোনওরূপ অপকর্ম্মে সক্ষম হয় বা হ'তে পারে। এই নৈতিক অসাড়তা সম্বন্ধে অন্য আর একটী বিদেশী উদাহরণ দেওয়া যাক। কোনও এক অসভ্য মাওয়ারি নেতা এরূপ উক্তি করে, "আমি যদি পথিমধ্যে কোনও এক ব্যক্তিকে বর্শাবিদ্ধ করি, তাহলে আমার এই কার্য্যকে বলা হবে 'হত্যা,' কিন্তু আমি যদি ঐ ব্যক্তিকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করে নিহত করি তাহলে ঐরূপ কার্য্যকে বলা হবে অপকার্য্য বা খুন। এই বিশেষ ক্ষেত্রে মাওয়ারী নেতাটীর মধ্যে নৈতিক অসাড়তা কম মাত্রায় দেখা যায়, কারণ এইরূপ উক্তির মধ্যে কিছুটা যুক্তি ও আদর্শ আছে। আদিম সমাজ হ'তে অর্দ্ধ সভ্য সমাজ এবং অর্দ্ধ সমাজ হ'তে সভ্য সমাজের উঠতি পথে মানুষ এরূপভাবে চিন্তা করে। অনুরূপভাবে যুদ্ধের সময় পরদেশ লুণ্ঠন এবং পরদেশীয়দের নিহত করার মধ্যে আধুনিক সভ্য জাতিরা কোনওরূপ অন্যায় দেখে না, কারণ সাময়িকভাবে তখন এদের মধ্যে কথঞ্চিৎ নৈতিক অসাড়তা স্থান পায়। এই ভাবে এই নৈতিক অসাড়তার সঙ্কোচন বা প্রসারণ দ্বারা অসভ্য জাতি হ'তে সভ্য

জাতিতে এবং সভ্য জাতি হ'তে পুনরায় অসভ্য জাতির সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

যে কোনও অন্যায় কার্য্যের মধ্যে যদি আদর্শ মিশ্রিত থাকে, তা হ'লে আদর্শ মিশ্রিত উৎকট দোষও গুণ রূপে খ্যাতিলাভ করে থাকে। এই কারণে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উহাকে দোষ না বলে 'ভুল' আখ্যা দিয়ে থাকেন। কয়েকটী রাজনৈতিক কার্য্য সম্পর্কে ইহা বিশেষরূপে প্রযোজ্য। নৈতিক অসাড়তা সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। কোনও কোনও নৈতিক অসাড়তার মধ্যে কিছুটা আদর্শও দেখা গিয়েছে। বড় বড় যুদ্ধের সময় বহু স্বদেশ-প্রেমিকা সৎ নারী বিপক্ষ পক্ষীয় সেনাপতিদের সহিত প্রেমাভিনয় করে দেহদান করে বা স্থায়ী ভাবে তাদের উপপত্নীত্ব স্বীকার করে বহু গোপন সংবাদ স্বদেশীয় বাহিনীর হিতার্থে সংগ্রহ করেছেন। এইরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্রই তাঁদের এইরূপ স্বদেশ প্রেমিকতার সুখ্যাতি করেছেন; কিন্তু কোনও চোর স্বামীর স্ত্রী যদি স্বামীর আদেশে কোনও ধনী ব্যক্তির বাটীতে ঝি রূপে প্রবেশ করে ঐ ধনী ব্যক্তির পুত্রের সহিত ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়, স্বামীর অপকার্য্যের সহায়তার কারণে সুড়ুক সন্ধান বা গোপন তথ্য সংগ্রহ করবার জন্যে, তা'হলে তার এই কার্য্যের জন্য কোনও নাগরিকই তাকে সুখ্যাতি করবে না।

বহু ক্ষেত্রে সৎ প্রেরণা ধীরে ধীরে অপকার্য্যের মধ্যে সংপ্রসারিত হয়ে উহাকে পুরাপুরি গ্রাস করে ফেলতেও দেখা গিয়েছে। এমন বহু ডাকাত দলের কাহিনী শুনা গিয়েছে তারা তাদের অপহরণের বাড়তি ধন দান ধ্যানে ব্যয় করতো। পরবর্ত্তীকালে এদের কেউ কেউ প্রজাপালক জমীদার বা রাজা রূপে সুনাম অর্জ্জনও করে গিয়েছেন

নিম্নের কাহিনীটী হ'তে বক্তব্য বিষয়টী সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"পাগলা মার্ডার কেসের বিচারের সময় বিপক্ষ পক্ষীয় উকীল অমুক বাবুকে জেরা করে বসলেন, 'আচ্ছা! অমুক অফিসার (অর্থাৎ আমি) যখন ঐ বেশ্যা নারীর গৃহে এসে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল, তখন সে সকল বিষয় অস্বীকার করেছিল, কিন্তু আপনি যখন তার ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন সে অকপটে সকল কথা স্বীকার করলো। এখন আমি যদি বলি যে পরবর্ত্তীকালে প্রয়োজন বিধায় আপনি এই সকল মিথ্যা কথা তার মুখ দিয়ে বলিয়ে দিয়েছেন তা'হলে এর কোনও সদুত্তর আপনি দিতে পারবেন? প্রবীন অফিসার অমুক বাবু বুঝে নিলেন যে তার এই প্রশ্নের উত্তরের উপর সমুদয় মামলাটীর ভবিষ্যৎ বহুল পরিমাণে নির্ভর করছে। জুরী মহোদয়গণ এবং জজ-সাহেবের মনে এই সম্পর্কে কোনও সন্দেহের অবকাশ না দিয়ে তিনি প্রকাশ্য আদালতে নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিয়েছিলেন, "অমুক বাবু অমুক নারীর গৃহে গিয়েছিলেন, পুলিশ অফিসার রূপে, কিন্তু আমি তার নিকট গিয়েছিলাম তার উপপতি রূপে, ছদ্মবেশে। এবং এই কারণে ঐ নারী আমার নিকট নিঃসঙ্কোচে সত্য কথা প্রকাশ করে দিয়েছিল।"

দৈহিক অসাড়তা

নৈতিক অসাড়তার ন্যায় এই দৈহিক অসাড়তাও প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে অত্যধিকরূপে স্থান পায়। এবং এর দ্বারা মনের সঙ্গে দেহের নিকট সম্বন্ধ প্রমাণিত হয়। এই দৈহিক অসাড়তার জন্যে প্রকৃত অপরাধীদের কষ্টবোধ কম থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৈহিক অসাড়তা দেখা যায়, স্বভাব-অপরাধীদের মধ্যে, অভ্যাস-অপরাধীদের মধ্যে এই দৈহিক

অসাড়তা কম পরিমাণে বর্ত্তায়। প্রাথমিক অপরাধীরা প্রায়শঃ নিরপরাধ মানুষের মতই হয়ে থাকে। এজন্য এদের মধ্যে দৈহিক অসাড়তা দেখা যায় না। এজন্যে যেরূপ দৈহিক পীড়ন প্রাথমিক অপরাধীদের উতলা করে, সেরূপ দৈহিক পীড়ন স্বভাব-অপরাধীদের পক্ষে আনন্দদায়ক হয়। অন্যদিকে স্বভাব-অপরাধীরা ধাপ্পায় এবং দৈব ও অভ্যাস-অপরাধীরা মিষ্ট কথাতে ভুলে যায়। আশার বাণী দৈব এবং প্রাথমিক অপরাধীদের উপর কার্য্যকরী হয়, কিন্তু স্বভাব-অপরাধীদের আশার বাণী শুনান বা না শুনান সমান কথা। অত্যধিক দৈহিক অসাড়তার জন্যে স্বভাব-অপরাধী এবং স্বভাব-বেশ্যারা হুল্লোড় বা অর্‌জ্যারি ভালবাসে। প্রতিটী চিমটি, প্রতিটী দংশন এবং খিমচানি হ'তে স্বভাব-বেশ্যারা অভূত-পূর্ব্ব আনন্দ লাভ করে—কারণ স্বভাব-চোরদের মত এদেরও মধ্যে কষ্ট বোধ থাকে অনেক কম। এজন্যে স্বভাব-অপরাধীদের আমরা মাঠকোঠা বা খোলার বস্তিতে সন্ধান পাই, কারণ স্বভাব-বেশ্যারা এই সব জায়গায় বাস করে, এরা উভয়েই পাতালপুরি বা আণ্ডার-ওয়ার্লড পছন্দ করে। অন্যদিকে অভ্যাস-অপরাধীদের আমরা অভ্যাস-বেশ্যাদের সঙ্গে কোঠা-বাড়ীগুলিতে রাত কাটাতে দেখি। স্বভাব-চোরেরা স্বভাব-বেশ্যাদের এবং অভ্যাস-চোরেরা অভ্যাস বেশ্যাদের সহজেই চিনে নেয়। কাকেও যদি স্বভাব-অপরাধীরূপে জানা থাকে তাহলে তার খোঁজে শান্তিরক্ষকদের উচিত সহরের পঙ্কিল এবং নিরালা বস্তিগুলিতে হানা দেওয়া। এই কষ্ট-বোধ-হীনতার জন্যে স্বভাব-অপরাধীরা তাদের যৌনদেশেও উল্কিচিত্র অঙ্কনে সমর্থ হয়। এই সব উল্কিচিত্র হ'তেও একজন অপরাধী—স্বভাব, মধ্যম বা অভ্যাস অপরাধী তা জানা যায়। সক্রিয় অপরাধীরা এই সব উল্কি চিত্র দেহের প্রকাশ্য স্থানে ধারণ করে, নিজেদের ভীষণাকৃতি দেখানর জন্যেই এরা এরূপ করে থাকে, নিষ্ক্রিয়

অপরাধীরা কিন্তু দেহের প্রকাশ্য স্থানে উল্কি ধারণ করে না, কারণ তাদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে আত্ম-গোপন। এই সব বিষয় হ'তে একজন অপরাধী স্বভাব, অভ্যাস, কিংবা দৈব তা জেনে নিয়ে, শান্তিরক্ষকেরা তাদের সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, এ ছাড়া সূচি-যন্ত্র সাহায্যে বা হাল্কা বিদ্যুত প্রবাহের দ্বারা পরীক্ষা করেও অপরাধী বিশেষ একজন * স্বভাব, মধ্যম বা অভ্যাস অপরাধী তা'ও জানা যায়। ঠগীদের কষ্ট-বোধ খুনে এবং চোরের অপেক্ষা অনেক কম থাকে, কারণ ঠগী বা "চীট্" এরা সাধারণতঃ অভ্যাস-অপরাধী হয়, স্বভাব অপরাধী হয় না —এই শঠতা-অপরাধ সভ্য এবং অসভ্য সমাজের প্রত্যক্ষ সংঘাতের একটী বিশেষ ফল, এবং তা পরবর্ত্তীকালে সভ্যতার বিকাশের পর সৃষ্টি হয়েছে; আদিমমানুষদের মধ্যে এই শঠতা বা প্রবঞ্চনা অপরাধ কদাচিৎ দেখা যায়। এই কষ্ট-বোধহীনতা আদিম-মানুষ, নির্ব্বোধ এবং জড়-ব্যক্তিদের মধ্যেও অধিক দেখা যায়। আফ্রিকার কোনও এক আদিম মানুষ ইয়ুরোপীয় বুট পরবার জন্য পায়ের দুইটা আঙ্গুল কেটে ফেলতেও দ্বিধা করে নি। এই দৈহিক অসাড়তার জন্যে অপরাধী বিশেষে মিথ্যা নালিশ দ্বারা অন্যেকে ফাসাবার জন্যে, নিজের দেহ সহজেই ক্ষত বিক্ষত করতে পারে। এমন

---

* দেহের কোনও একটী অংশের এক ইঞ্চি স্কোয়ার পরিমিত একটী স্থান বেছে নিয়ে সেই স্থানটীর মধ্যে কতগুলি স্পর্শকেন্দ্র, কতগুলি উষ্ণ বা শৈত্যকেন্দ্র, কতগুলি বা কষ্টবোধ-কেন্দ্র আছে তা স্পর্শবিদ্, উষ্ণবিদ্, শৈত্যবিদ্ এবং কষ্টবোধবিদ্ যন্ত্র দ্বারা জানা যায়। ইয়ুনিভারসিটীর এক্সপেরিমেণ্ট সাইকোলজী ডিপার্টমেণ্টে এরূপ পরীক্ষার ব্যাবস্থা আছে। প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে পেন এবং হিট্স্পট্ কম দেখা যায়, বিশেষ করে স্বভাব অপরাধীদের মধ্যে তারা অত্যন্ত কম সংখ্যায় থাকে। প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে কোল্ড্ এবং টাচ্ স্পট বোধ হয় এত কম থাকে না—কারণ বরফ জল দ্বারা আমি অপরাধীদের কাবু হ'তে দেখেছি।

অনেক অপরাধী আছে ঘুমন্ত অবস্থায় যাদের পা অগ্নি দগ্ধ হ'লেও তারা তা জানতে পারে না। এই কষ্ট-বোধহীনতার জন্যে অপরাধী বিশেষ নির্ভিক চিত্তে বেত্রাঘাত সহ্য করে, এবং বেত্রাঘাতের খবরে কখনও বিচলিত হয় না। এই দৈহিক ও নৈতিক অসাড়তার জন্যে প্রকৃত অপরাধীরা নিজে হ'তেই হাতকড়া পরার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেয়, শুধু তাই নয়, অবিচলিত চিত্তে তারা ফাঁসীর দণ্ডাদেশও শুনে থাকে। এই দৈহিক অসাড়তার জন্যে অপরাধী-বিশেষ সাংঘাতিকভাবে জখম হওয়া সত্ত্বেও বিশ ত্রিশ মাইল হেঁটে যেতে পারে। দৈহিক অসাড়তার জন্যে উৎকট অপরাধীরা নিজেদের দৈহিক ব্যাধি সম্বন্ধে অবগত থাকে না, এজন্যে এরা ব্যাধি সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বনেও অক্ষম হয়, ফলে প্রায়ই এরা সহসা চেতনালুপ্ত হয়ে মারা যায়, শবব্যবচ্ছেদের দ্বারা পরে জানা যায় যে এরা অনেক দিন পর্য্যন্ত রোগে ভুগে এসেছে, কিন্তু তা তারা জানতে পারে নি। এই বিষয়ে স্বভাব-অপরাধীদের চরিত্র জীবজন্তু এবং আদিম মানুষেরই অনুরূপ হয়। সামান্য সামান্য কারণে এরা অভিযোগ মুখর হ'লেও, নিজেদের ব্যাধি আদি সম্বন্ধে এরা কদাচিৎ অভিযোগ জানায়। উৎকট অপরাধীদের জখম বা ক্ষত আদি আমরা অতি সত্বর নিরাময় হ'তে দেখি, নিরপরাধী ব্যক্তিদের ক্ষত আদি এত সত্বর নিরাময় হয় না; প্রকৃত অপরাধীদের কষ্ট-বোধহীনতাই কি এর কারণ? দৈহিক অসাড়তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমরা অপরাধীদের মধ্যে দৃষ্টি-শক্তি বিশেষ প্রখর দেখি। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মাত্রেই একমত। অন্য দিকে এদের শ্রবণশক্তি কিন্তু এত প্রখর হয় না। ঘ্রাণ, স্বাদ এবং স্পর্শ গুণও এদের মধ্যে থাকে কম। অনেকে খাদ্য বিশেষ ঝাল বা টক্ এও বলতে অক্ষম হয়। মস্তিষ্কের স্থান বিশেষের ক্ষয় ক্ষতিই কি এটার কারণ? আশৈশব নেশা ভাঙ করলেও এরূপ হতে পারে।

এ ছাড়া অপরাধীদের আবহাওয়া সম্বন্ধেও সচেতন দেখা যায়। * দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার আগমন এদের কেউ কেউ পূর্ব্বাহ্নেই বলে দিতে পারে, এ বিষয়েও এদের সঙ্গে জীবজন্তুর প্রভৃতির কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়।

[এই দৈহিক এবং নৈতিক অসাড়তা একত্রে পাশাপাশি প্যারালাল ভাবে উঠা নামা করে কিংবা তারা পৃথক পৃথক ভাবে, একে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেই আগত হয় বা হ'তে পারে কিনা তা এখনও পর্য্যন্ত বিবেচনার বিষয় হয়ে রয়েছে। জেমস্ সাহেবের মতে দেহ এবং মনের সম্বন্ধ নিবিড়তম এবং অবিচ্ছেদ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেছেন যে মানুষের ভয় ক্রোধ হর্ষ এবং কাম প্রভৃতি মানসিক বৃত্তির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের অভ্যন্তরেও নানারূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়ে থাকে। এবং এই সব দৈহিক পরিবর্ত্তন মানসিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাধিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ কি'না মানুষের ঐ মানসিক পরিবর্ত্তন সমূহের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি রূপেই তার দৈহিক পরিবর্ত্তন সকল সাধিত হয়। মানুষ যখন ভয় পায়, তখন তার সেই ভয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের মধ্যে কতকগুলি স্নায়বিক পরিবর্ত্তন সাধিত হ'তে থাকে। এই অবস্থায় তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুততর হয়। জিহ্বা ও তালু শুষ্ক হয়ে ওঠে, বুক দুরু দুরু করে কাঁপতে থাকে, হাত পা অবশ বা শিথিল হয়ে যায়। ধমনীতে রক্ত চলাচল দ্রুতগতিতে সুরু হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস গাঢ় হয়ে পরে বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়, ইত্যাদি। কিন্তু এই ভয়ের কারণ অপসারিত হওয়ার পরই মানুষের দেহ পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে যাবে। জেমস সাহেবের মতে কোনও এক প্রকার স্নায়বিক রোগের জন্যে যদি

* বর্ষাকালে চুরি করার সুবিধে। বৃষ্টি হবে তা পূর্ব্বাহ্নেই জেনে তারা অপকর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হয়।

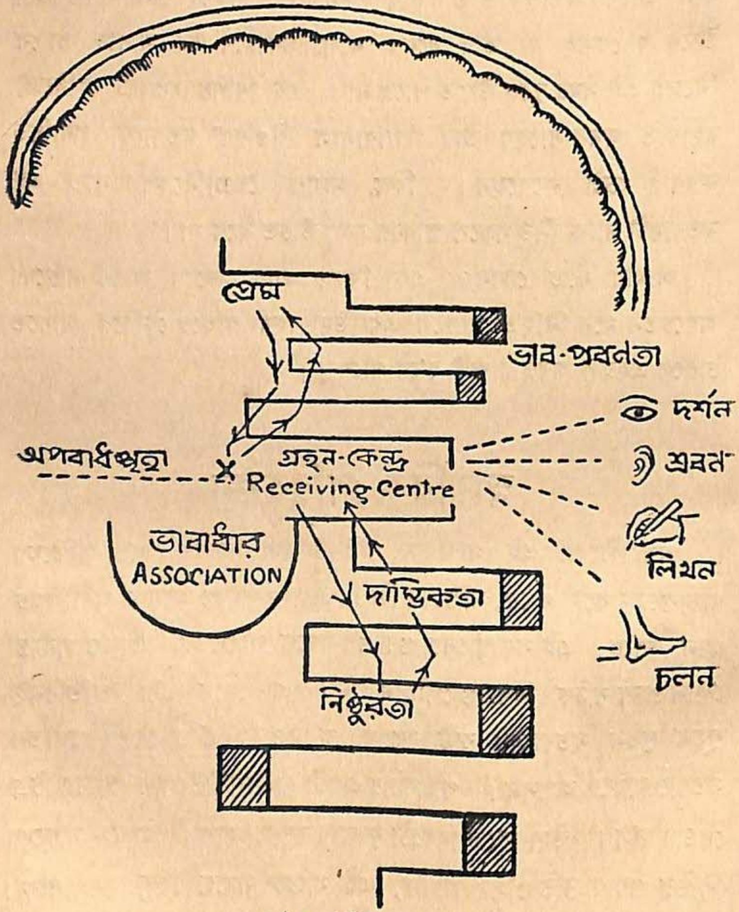
কোনও এক মানুষের দেহে ঐরূপ চাঞ্চল্য বা পরিবর্ত্তন সাধিত হ'তে থাকে, তা হ'লে কোনও রূপ ভয়ের কারণ না থাকা সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তি মনে প্রাণে অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠবে। সে যে কেন ভীত হয়ে উঠছে বা কেনই বা তার মনের মধ্যে অকারণে ভয় আসছে তা সে নিজেই এই সময় বুঝে উঠতে পারে না। এই বিশিষ্ট দৃষ্টান্তটি দেখিয়েই মহামতি জেমস সাহেব তাঁর "প্যারালাল থিওরির" মতবাদটী প্রমাণিত করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের মতে এই মতবাদটী নাকি নির্ভুলরূপে স্বীকার করা উচিত হবে না।

আমার মতে কোনও এক বিস্মৃত প্রায় ভয়ের কারণ মানুষের অবচেতন মনে নিহিত থাকলে এবং উহা সহসা বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইলে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হ'য়ে থাকে।]

স্নায়বিক পরিবর্ত্তন

অপরাধীদের এই স্নায়বিক পরিবর্ত্তনাদি বিশেষ করে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরেই ঘটে থাকে, মস্তিষ্কের ভিতর এখনও পর্য্যন্ত অনেক অনাবিষ্কৃত স্থান আছে; এই সব স্থানের গুণাগুণ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা এখনও পর্য্যন্ত কোনওরূপ সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছান নি। এ সম্বন্ধে এঁরা প্রতিদিনই নূতন নূতন মতবাদের সৃষ্টি করেন, কখনও বা এঁরা এঁদের পুরাতন মতবাদে ফিরে আসেন। পর পৃষ্ঠায় একটী হাইপ্যাথিটিক্যাল ব্রেণের চিত্র দেওয়া হ'ল। উহা হ'তে বিষয়টী বুঝবার সুবিধা হবে। প্রথমে মানুষের বিভিন্ন গুন বা বৃত্তিগুলির আধার, এই মস্তিষ্ক সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। মানুষের মধ্যে প্রধানতঃ দুই প্রকারের গুণ বা বৃত্তি আছে, তাদের যথাক্রমে সূক্ষ্ম ও স্থুল বৃত্তি বলা হয়। মানুষের অন্তর্নিহিত সুবিবেচনা, দয়া মায়া

কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রভৃতিকে সূক্ষ্ম বৃত্তি এবং তাদের দাম্ভিকতা, আত্মসর্ব্বস্বতা নিষ্ঠুরতা প্রভৃতিকে বলা হয় স্থুল বৃত্তি। সাধারণ ভাবে এই সূক্ষ্ম বৃত্তি-



হাইপ্যাথিটিক্যাল ব্রেণ

গুলি স্থুল বৃত্তিগুলি অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয় এবং উহা নিম্নের স্থুল

বৃত্তিগুলিকে দাবিয়ে রাখে, এই সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি মস্তিষ্কের উপরিভাগে এবং স্থূলবৃত্তিগুলি উহার নিম্নাংশে সাজান আছে। মস্তিষ্কের মধ্যাংশে থাকে গ্রহণ-কেন্দ্র বা রিসিভিং সেণ্টার, ভাবাধার বা এরিয়া অব এসোসিয়েসন। বুদ্ধি প্রেরণার স্থানও এখানে থাকে বলে মনে হয়—উহারা অভিজ্ঞতা প্রসূত হয়ে থাকে। ১৬০ পৃষ্ঠার চিত্রটী দেখুন, নিরপরাধী মানুষের মস্তিষ্কের গঠন এরূপই হয়ে থাকে। নিরপরাধী মানুষের কথা বলা হল, এবার অপরাধী মানুষের কথা বলা যাক। স্বল্পাধিক অপস্পৃহা মানুষের এই সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলিকে দুর্ব্বল এবং স্থূল বৃত্তিগুলিকে প্রবল করে দেয়, এরূপ অবস্থায় এই সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি মানুষের স্থূল বৃত্তিগুলিকে আর দাবিয়ে রাখতে পারে না—মানুষ তখন তার স্থূল বৃত্তিগুলির অন্তর্গত নিষ্ঠুরবৃত্তির সাহায্যে নানারূপ অপকর্ম্ম সুরু করে। প্রাথমিক অপরাধীদের মস্তিষ্কের গঠন এই রূপ হয়ে থাকে। নিরপরাধীদের সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি থাকে প্রবল এবং স্থূল বৃত্তিগুলি থাকে দুর্ব্বল, অপরাধীদের সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি থাকে দুর্ব্বল এবং স্থূল বৃত্তিগুলি থাকে প্রবল। মস্তিষ্কের গ্রহণকেন্দ্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা বোধ-সকলকে মানুষের প্রবল বৃত্তিগুলির দিকেই ঠেলে দেয়। একটু বুঝিয়ে বলা যাক, মস্তিষ্কের চিত্রটী (১৬০ পৃষ্ঠায়) ভালরূপে দেখুন। কোনও একটী সুন্দরী কন্যা যদি সামনে আসে ত কারুর মনে জাগে কামনা, কেউ আবার তাকে দেখে কবিতা রচনা করে। চক্ষু সুন্দরীর রূপটা (চিত্র দেখুন) প্রথমে এনে দেয় গ্রহণকেন্দ্রে। নিরপরাধী বা কবিদের গ্রহণকেন্দ্র সুন্দরীর রূপমাধুর্য্যকে পাঠিয়ে দেয় মস্তিষ্কের উপরিভাবে, যেখানে সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি অবস্থান করে। অন্য দিকে অপরাধী বা দুর্ব্বৃত্তের গ্রহণ-কেন্দ্র নারীর এই রূপকে পাঠায় মস্তিষ্কের নিম্নভাগে স্থূল বৃত্তিগুলির দিকে, এই জন্যে একই নারী এবং তার রূপ দুর্ব্বৃত্তদের করে দেয় ক্ষিপ্ত এবং

কবিদের করে দেয় মুগ্ধ। কবিদের চক্ষু, গ্রহণকেন্দ্র মারফৎ দর্শনবস্তুটীকে মস্তিষ্কের উপরি অংশে পাঠিয়ে দেয়, ফলে সৃষ্ট হয় কবিতা, এর পর সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি কবিতাকে গ্রহণকেন্দ্র মারফৎ পাঠিয়ে দেয় হস্তে, এবং হস্ত লিখন কার্য্য সুরু করে দেয়। অপর দিকে দুর্ব্বৃত্তদের চক্ষু দর্শন বস্তুটীকে গ্রহণকেন্দ্র মারফৎ পাঠিয়ে দেয় মস্তিষ্কের নিম্নাংশে স্থূল বৃত্তিগুলির দিকে, ফলে সৃষ্ট হয় কামনা। নিম্নের স্থূল বৃত্তিগুলি এই কামনাকে পাঠিয়ে দেয় পদে (চিত্র দেখুন), দুর্ব্বৃত্ত তখন ধর্ষণার্থে সুন্দরীর দিকে ধাবিত হয়। অপস্পৃহা দুর্ব্বৃত্তদের স্থূল বৃত্তিগুলিকে তাদের সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি অপেক্ষা প্রবল করে দেয়, এজন্যই এরূপ ঘটে থাকে। এই অপরাধ স্পৃহা ছাড়া সময় সময় স্নায়বিক রোগও মানুষের এই স্থূল বৃত্তিগুলিকে তাদের সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি অপেক্ষা প্রবল ও সতেজ করে তুলে। এরূপ অবস্থায় মানুষকে বলা হয় অপরাধ-রোগী। ক্রোধ প্রভৃতি সাময়িক রোগেও এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে বা করতে পারে, তবে ইহা কদাচিৎ ঘটে থাকে, সাধারণতঃ অপস্পৃহার আগমন প্রত্যাগমনই অপরাধীদের স্থূল বৃত্তিগুলিকে সতেজ এবং তাদের সূক্ষ্ম বৃত্তিকে সদাসর্ব্বদা নিস্তেজ রাখে। ফলে বাইরের সামান্যমাত্র প্রলোভনও অপরাধীদের বাড়তি অপস্পৃহার নিষ্কাশন ঘটিয়ে এদের দ্বারা অপকর্ম্ম করায়। বাইরের প্রলোভনের ন্যায় অন্তরের প্রয়োজনও এদের বাড়তি অপস্পৃহার নিষ্কাশন ঘটিয়ে থাকে। আসলে এই বাড়তি অপস্পৃহাই, সৎপ্রেরণাকে দূরে ঠেলে দিয়ে অপরাধীদের স্থূল বৃত্তিগুলিকে প্রবল হ'তে প্রবলতর করে তাদের দ্বারা নানাবিধ অপকর্ম্ম করিয়ে থাকে। প্রাথমিক অপরাধীদের স্বল্পাধিক অপস্পৃহা তাদের মস্তিষ্কের এই সূক্ষ্ম বৃত্তিকে দুর্ব্বল এবং স্থূল বৃত্তিগুলিকে প্রবল করে মাত্র, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনওরূপ মূল স্নায়বিক বা মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটায় না। প্রকৃত বা উৎকট

অপরাধীদের মস্তিষ্কে কিন্তু বহুকাল স্থায়ী অত্যধিক অপস্পৃহার জন্যে কতকগুলি মূল স্নায়বিক পরিবর্ত্তন ঘটে। প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে

১ নং	'ইত্যাদি— দেশপ্রেম আত্মোৎসর্গ সুবিচারিতা লোকহিতৈষিতা অমায়িকতা	—প্রেম বৃত্তি বা প্রেম প্রসূত বৃত্তি
	'ইত্যাদি— স্নেহ প্রীতি দয়া মায়া দরদ বাৎসল্য	—ভাব বৃত্তি বা ভাব প্রবণতা প্রসূত বৃত্তি
	গ্রহণ কেন্দ্র	
	'ইত্যাদি— আত্মম্ভরিতা ঘৃণা নীচতা অহঙ্কার অবজ্ঞা	—দম্ভোবৃত্তি বা দাম্ভিকতা প্রসূত বৃত্তি
	'ইত্যাদি জিঘাংসা ক্রূরতা আত্মসর্ব্বস্বতা অত্যাচারিতা	—নিষ্ঠুর বৃত্তি বা নিষ্ঠুরতা প্রসূত বৃত্তি

দৃষ্ট এই মূল পরিবর্তনগুলি সম্বন্ধে এবার বলা যাক। একটু বুঝিয়ে

বলার প্রয়োজন আছে। পরপৃষ্ঠায় প্রাথমিক অপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট বিবিধ সূক্ষ্ম এবং স্থূল বৃত্তিগুলির একটা মামুলী তালিকা দেওয়া হ'ল। এই বিশেষ তালিকাটী নিরপরাধী মানুষ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। নিরপরাধী এবং প্রাথমিক অপরাধীর এই সূক্ষ্ম এবং স্থূল বৃত্তিগুলির মধ্যে যা কিছু প্রভেদ তা শক্তির, সংখ্যার নয়। সংখ্যাগুলি উভয়ের মধ্যে সমান রূপেই বর্ত্তায়। তালিকাটী অনুধাবন করুন। প্রকৃত বা উৎকট অপরাধীদের মধ্যে কিন্তু এতগুলি সূক্ষ্ম বা স্থূল বৃত্তি থাকে না। তারা ধীরে ধীরে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে শেষে বরাবর দুইটী সূক্ষ্ম এই দুইটী স্থূল বৃত্তিতে পরিণত হয়। তবে তা তারা একদিনে হয় না। এরূপ পরিবর্ত্তন সময় সাপেক্ষ। প্রথমে তারা ঘন সন্নিবেশিত বা ঘন সংলগ্ন হয়, পরে তারা হয় সংবদ্ধ বা ইণ্টারলক্ড। এর পর তারা পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর সম্পূর্ণরূপে মিশে বা সংমিশ্রিত হয়ে উক্তরূপ চারিটী মূল বৃত্তিতে পরিণত হয়। তাদের যথাক্রমে বলা হয়, প্রেমবৃত্তি, ভাববৃত্তি, দম্ভোবৃত্তি এবং নিষ্ঠুরবৃত্তি। শেষের দিকে অত্যন্ত অধিক অপস্পৃহার জন্যে কোনও কোনও উৎকট অপরাধীর এই প্রেমবৃত্তিটীও বিনষ্ট হয়ে যায়, বাকি থাকে শুধু ভাববৃত্তি, দম্ভোবৃত্তি এবং নিষ্ঠুরবৃত্তি। নিম্নের তালিকাটী একবার দেখুন, এর সঙ্গে পূর্ব্বের তালিকাটী তুলনা করলেই বিষয়টী বুঝা যাবে। প্রকৃত বা অত্যুৎকট অপরাধীদের মস্তিষ্কের, তথা মনের গঠন এইরূপ হয়ে থাকে। আদিম মানুষের মনের গঠনও এরূপই ছিল। পশু বা পশ্বব জীবদের মস্তিষ্কে এই চারিটী বৃত্তিও দেখা যায় না, তাদের মধ্যে মাত্র দুইটী বৃত্তি দেখা যায়, তাদের যথাক্রমে ভাববৃত্তি এবং নিষ্ঠুরবৃত্তি বলা হয়। সম্যক বিবেচনা দ্বারা এরূপ প্রতীতি হয় যে এই দুইটী বৃত্তি হ'তে চারিটী বৃত্তি এবং এই চারিটী বৃত্তি হ'তে কতকগুলি সূক্ষ্ম ও স্থূল বৃত্তি জীবজগতে সৃষ্টি হয়েছে। একটু বুঝিয়ে বলা যাক্, আমরা পশ্বব

জীবদিগের মধ্যে দুইটী বৃত্তি দেখতে পাই, যথা,—ভাববৃত্তি, ও নিষ্ঠুরবৃত্তি, কিন্তু আদিম মানুষের মধ্যে আমরা দেখতে পাই চারিটী বৃত্তি, যথা ঃ— (১) প্রেমবৃত্তি (২) ভাববৃত্তি (৩) দম্ভোবৃত্তি এবং (৪) নিষ্ঠুরবৃত্তি। এই জন্যে মনে হয়, যে ভাববৃত্তি হ'তে প্রেমবৃত্তির এবং নিষ্ঠুরবৃত্তি হ'তে দম্ভোবৃত্তির সৃষ্টি হয়েছে, প্রেমবৃত্তিকে ভাববৃত্তির এবং দম্ভোবৃত্তিকে নিষ্ঠুর বৃত্তির তরলাকৃত বর্দ্ধন বা এক্সটেনসন্ বলা যেতে পারে, জীব যতই উন্নত হয়, তার মস্তিষ্কের খুলিটীও ততই বর্দ্ধিত হতে থাকে।

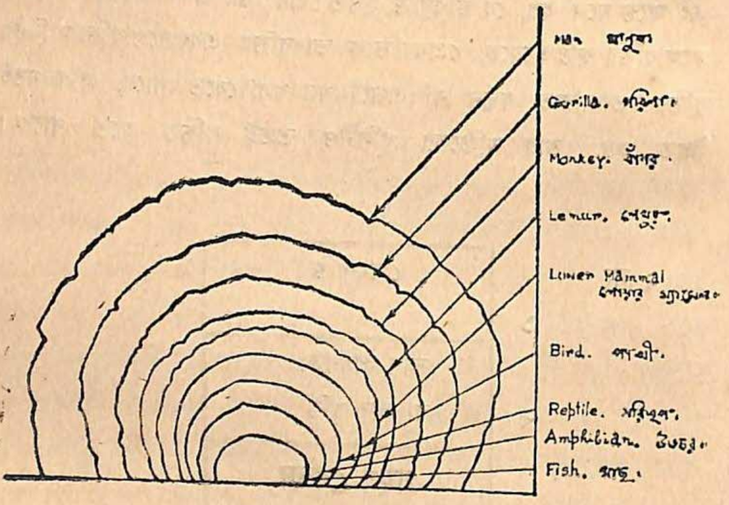
২ নং

১	প্রেম-বৃত্তি
২	ভাব প্রবণতা বা ভাব বৃত্তি
	গ্রহণ কেন্দ্র
৩	দাম্ভিকতা বা দম্ভ বৃত্তি
8	নিষ্ঠুরতা বা নিষ্ঠুর বৃত্তি

ক্রমবর্দ্ধমান মস্তিষ্কের স্থান সঙ্কুলনের জন্যেই এরূপ ঘটে থাকে। দেহের মত মনেরও ক্রমবিকাশ ঘটে। নিম্নের চিত্রটী হ'তে বিষয়টী বুঝা যায়।

[সাধারণতঃ পণ্ডিতগণ বলে থাকেন যে মস্তিষ্কের ক্রমোন্নতির সহিত

জীবগণের বুদ্ধির সৃষ্টি ও উন্নতি হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন হিন্দু ঋষিগণের মতে বুদ্ধিমত্তার ক্রমাবির্ভাবের কারণে উহার আধার স্বরূপ মস্তিষ্কও উন্নত হয়েছে।]



অসভ্য অবস্থায় মানুষ মাত্র কয়েকটী শব্দ দ্বারা কথোপকথন বা ভাবপ্রকাশের কাজ চালাত, কিন্তু পূর্ব্বের সেই কয়েকটী মাত্র শব্দ হ'তে বহুবিধ শব্দেরই সৃষ্টি হয়েছে, অনুরূপ ভাবে আদিম মানুষ—এই প্রেম, ভাব, দম্ভো ও নিষ্ঠুররূপ, চারিটী প্রধান বৃত্তি দ্বারা জীবনযাপন করত, পরে সভ্যতা ও অভ্যাসের জন্যে এই চারিটী মাত্র বৃত্তি বিচ্ছিন্ন বা স্প্লিট্আপ (Split up) হয়ে, বহুবিধ নূতন নূতন বৃত্তির সৃষ্টি করে। ১নং তালিকাটী অনুধাবন করুন। সভ্যতা ও অভ্যাসের সহিত মানুষ সৎ-প্রেরণা লাভ করে—এই সৎ-প্রেরণাই মানুষের মূল বৃত্তি চারিটীকে বহুধা বিচ্ছিন্ন করে অধুনাদৃষ্ট নানাবিধ ভাব বা বৃত্তির সৃষ্টি করেছে। এর দ্বারা

সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলির সূক্ষ্মতা বেড়ে গেছে, এবং স্থুল বৃত্তিগুলির স্থূলতা গেছে কমে, ফলে মানুষ হয়েছে আধুনিক সভ্য মানুষ। মনে রাখতে হবে দেহের ন্যায় মনেরও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। সৎ-প্রেরণাই উহার কারণ, অত্যধিক সৎ-প্রেরণা সভ্য মানুষ হ'তে অতি-মানুষেরও জন্ম দিতে পারে। মহামানবদের মধ্যে প্রায়ই কতকগুলি অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্য (সাধারণ ইন্দ্রিয়ের বহির্ভূত) অতি সূক্ষ্ম বোধ বা বৃত্তির সন্ধান মিলে—এরূপ শোনা গেছে। মনুষ্য দেহে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় স্বরূপ কোনও ইন্দ্রিয় নেই, আসলে সেটা আগাগোড়াই মস্তিষ্কের ব্যাপার। সৎ-প্রেরণা অতিমাত্রায় জাত হ'লে, সেটা হয়ত মানুষের স্থুল বৃত্তিগুলির স্থূলতা কমিয়ে এবং সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলির সূক্ষ্মতা আরও বাড়িয়ে, আরও অধিক সূক্ষ্ম বৃত্তির সৃষ্টি করে পরিশেষে প্রেমবৃত্তিরও বাইরে আরও একটী অতি সূক্ষ্ম বৃত্তির সৃষ্টি করলেও করতে পারে। মহামানবদের মধ্যে যে সব বোধ, জ্ঞান বা বৃত্তির কথা আমরা সচরাচর শুনে থাকি তা যদি সত্য হয় ত উপরোক্ত কারণেই তা হয়ে থাকে বা হ'তে পারে।

এই ভাবে আমরা দেখতে পাই, সৎ-প্রেরণা মানুষের বিভিন্ন স্থুল ও সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলিকে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন করে তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়, অন্যদিকে অপস্পৃহা এই সব বিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম এবং স্থুল বৃত্তিগুলিকে সংবদ্ধ করে, ধীরে ধীরে এদের সংখ্যা কমিয়ে এনে পূর্ব্বের ন্যায় তাদের পুনরায় চারিটি, তিনটী বা দুইটী বৃত্তিতে পরিণত করে দেয়। মানুষের মন এই সৎ-প্রেরণা এবং অপস্পৃহার অনন্ত দ্বন্দ্বস্থল মাত্র। এই সৎ-প্রেরণা মানুষের শিক্ষা দীক্ষা, সংস্কার ও ভয়ভাবনার সাহায্যে অপস্পৃহাকে যথাসাধ্য প্রতিরোধ করে। কিন্তু অপস্পৃহা যদি কোনও প্রকারে লোভ, অভাব প্রভৃতির সাহায্যে এই সৎ-প্রেরাণকে পরাজিত করে এগিয়ে আসে তাহলে উহা সুসভ্য মানুষকে মনের দিক হ'তে, পুনরায় আদিম মানুষে

রূপান্তরিত করে দেয় বা দিতে পারে—যা কি'না আমরা প্রকৃত বা উৎকট অপরাধীদের মধ্যে দেখে থাকি। প্রমাণ স্বরূপ নিয়ে একটী বিশেষ বিবৃতি তুলে দেওয়া হ'ল।

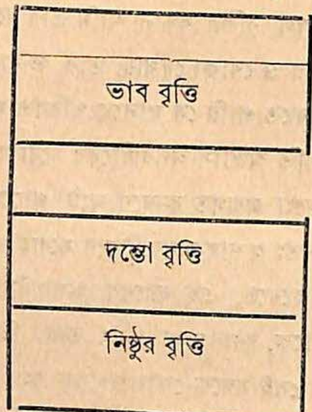
"প্রায় এগার বৎসর পূর্ব্বে একজন ভদ্র ছোকরা অপরাধীকে আমার কাছে ধরে আনা হয়। বলা বাহুল্য ছেলেটি একজন দৈব-অপরাধী ছিল। তার অপকর্ম্মের কৈফিয়ৎ স্বরূপ সে এরূপ একটী বিবৃতি দেয়—'কি করব বলুন, হঠাৎ সেদিন স্ত্রী বলে উঠল, 'লজ্জা করে না তোর, না দিয়েছিস দু'টা গহনা, না দিতে পারিস ভাল করে খেতে, এর উপর আবার কথা।' ঐ দিনই আবার সে পিতার নিকট হতে একটি পত্র পায়। পত্রটিতে এরূপ লেখা ছিল, 'তুমি আমার এক কুসন্তান, আজ পর্য্যন্ত দশটী টাকাও পাঠালে না, তোমার মরাই ভাল,' ইত্যাদি। পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাকে পাগল করে তুলে, আমি তহবিল তছরূপ করে বসি।" ছেলেটীর প্রতি আমার মন সহানুভূতিতে ভরে উঠে। আমি তার সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করি। সুসভ্য মানুষের মধ্যে দৃষ্ট প্রত্যেকটী সূক্ষ্ম ও স্থূল বৃত্তিরই সন্ধান তার ভিতর আমি পাই। দয়া মায়া স্বদেশপ্রেম, জনহিতৈষণা কোনও কিছুরই তার মধ্যে অভাব দেখি না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তার কোনও সাহায্যে আসি নি। এই ঘটনার প্রায় চার বৎসর পর পুনরায় লোকটীর সঙ্গে আমার দেখা হয়, ইতিমধ্যে সে আরও চারবার জেল খেটেছে, সে আমাকে দেখে কাঁদতে থাকে, এবং প্রকাশ্যে আমার পা জড়িয়ে ধরে, আমি বুঝতে পারি তার মধ্যে আত্মসম্মান, লজ্জা প্রভৃতি বোধের চিহ্নমাত্রও আর নেই, তার মধ্যে নৈতিক অসাড়তা সুরু হয়েছে, আমি পূর্ব্বের ন্যায় তার সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করতে চাই, কিন্তু আলোচনার বিষয় বস্তুগুলি সে বুঝেও বুঝতে পারে না, কোনও বিষয়েই তাকে আর আগ্রহশীল দেখা

যায় না, বেশ বুঝতে পারি স্বদেশপ্রিয়, লোকহিতৈষণা প্রভৃতি সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি সে হারিয়ে ফেলেছে বা ফেলছে। এর প্রায় পাঁচ বৎসর পর পুনরায় তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। এই সময় সে আমাকে চিনেও চিনতে পারে না। তাকে আমি অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে, দরজার্ গায়ে মাথা খুঁড়তেও দেখি। পূর্ব্বোক্তরূপ ভাববৃত্তির, দম্ভোবৃত্তি এবং নিষ্ঠুরবৃত্তি ছাড়া আর কোনও সূক্ষ্ম বা স্থূল বৃত্তির সন্ধান আমি তার মধ্যে পাই না। তাকে কতকটা অলস প্রকৃতির ও বোকা দেখায়, তার ভাষার মধ্যে কোনওরূপ বাঁধন দেখা যায় না, বুঝতে পারি সে দানবে পরিণত হয়েছে।"

এই বিশেষ পরিণতি অভ্যাস-অপরাধীদের মধ্যে অভ্যাস জনিত, এবং স্বভাব অপরাধীদের মধ্যে জন্মগত কারণে ঘটে থাকে—তবে এই বিশেষ অবস্থা আমরা সাধারণতঃ স্বভাব-অপরাধীদের মধ্যেই অধিক দেখে থাকি। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, এই ধরণের অপরাধীরা কখনও ভাবপ্রবণ, কখনও বা দাম্ভিক থাকে, কখনও বা হঠাৎ তারা নিষ্ঠুর হয়ে উঠে, কিন্তু তারা কেন এরূপ হয় সেই সম্বন্ধে কোনও কিছু বলা হয় নি। তার কারণ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে নিম্নের তালিকা লক্ষ্য করুন। অতি সূক্ষ্ম তার-জাল যেমন অত্যধিক বিদ্যুৎ প্রবাহ সহ্য করতে না পেরে বিনষ্ট হয়, তেমনি অত্যধিক অপস্পৃহার কারণে অতি সূক্ষ্ম প্রেম বৃত্তিটীও একেবারে কিংবা সাময়িক ভাবে নষ্ট বা অকেজো হয়ে যায়, এই জন্যে নিম্নের তালিকাটীতে প্রেম বৃত্তিটীকে আর দেখান হয় নি। তালিকাটী প্রকৃত বা উৎকট অপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট, ভাব, দম্ভ ও নিষ্ঠুররূপ—এই তিনটী মাত্র বৃত্তি দেখান হয়েছে, তালিকাটী পরপৃষ্ঠায় দেখুন।

সাধারণ ভাবে আমরা দেখেছি, সূক্ষ্ম বৃত্তি মাত্রই তাদের সূক্ষ্মতার জন্যে নিম্নের উভয় স্থূল বৃত্তি বা তাদের যে কোন একটীকেও দাবিয়ে রাখতে পারে। এই কারণে অপস্পৃহার অনাবির্ভাবে এই ভাব বৃত্তি

নিম্নের দম্ভো এবং নিষ্ঠুর—এই উভয় স্থূল বৃত্তিকে চেপে রাখে, এই জন্য এই সময় আমরা অপরাধীদের কেবলমাত্র ভাবপ্রবণ দেখি। পূর্ব্বে বলেছি, অপস্পৃহা এই সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি দুর্ব্বল বা নিস্তেজ এবং স্থূল বৃত্তিগুলিকে সবল বা সতেজ করে। বাড়তি অপস্পৃহার আগমন, সূক্ষ্ম বৃত্তির অন্তর্গত ভাব বৃত্তিকে অধিকতর দুর্ব্বল করে দেয়, ফলে নিম্নের স্থূল বৃত্তি দুইটি অত্যুগ্র



হয়ে উঠে, কিন্তু এই সময় অপরাধীদের মাত্র দাম্ভিক থাকতে দেখা যায়, নিষ্ঠুর দেখা যায় না। তার কারণ সম্বন্ধে এরূপ বলা যেতে পারে। দম্ভোবৃত্তি নিষ্ঠুর বৃত্তির তরলাকৃত বা ডাইলিউটেড্ অংশ, এই কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। অর্থাৎ কিনা, উভয়ই স্থূলবৃত্তি হ'লেও, দম্ভোবৃত্তি নিষ্ঠুরবৃত্তি অপেক্ষা কম স্থূল, এক কথায় স্থূলবৃত্তির মধ্যে, দম্ভোবৃত্তির সূক্ষ্মতা নিষ্ঠুরবৃত্তির অপেক্ষা অধিক বেশী। এই জন্যে ভাববৃত্তির অধীনতা হ'তে মুক্ত হওয়া মাত্র এই দম্ভোবৃত্তি, নিম্নের নিষ্ঠুরবৃত্তিকে দাবাতে সুরু করে, এই জন্যে এই সময় অপরাধীদের আমরা কেবলমাত্র দাম্ভিক দেখি। * এর পর অপস্পৃহা

* দৃষ্টান্তস্বরূপ এরূপ বলা যেতে পারে। "সুবিচারতা" একটী প্রেমপ্রসূত বৃত্তি এবং দয়ামায়া ভাবপ্রবণতা প্রসূত বৃত্তি। অভিযুক্ত ব্যক্তির দূরবস্থা দেখে বিচারকের

আরও অধিক মাত্রায় জাত ও নির্গত হয়, ফলে অবস্থা দাঁড়ায় এরূপ ঃ একটু বুঝিয়ে বলা যাক—অপস্পৃহা স্থূলবৃত্তি মাত্রকেই শক্তিশালী করে—যে বৃত্তিটী যত অধিক স্থূল সেই বৃত্তিটীকে সেটা তত অধিক সবল করে, এই জন্যে শেষের দিকে নিষ্ঠুরবৃত্তিটীই অধিক প্রবল হয়, এই অবস্থায় অপরাধীরা নিষ্ঠুর হয়ে উঠে, এবং অপকর্ম্ম সুরু করে। অপকর্ম্মের মধ্যে অপস্পৃহা শীঘ্রই নিঃশেষিত হয়। অপস্পৃহা নিঃশেষিত বা প্রত্যাগত হওয়ার জন্যে ধীরে ধীরে অপরাধীরা যথাক্রমে পুনরায় দাম্ভিক ও পরে ভাবপ্রবণ হয়ে উঠে এবং সর্ব্বশেষে তারা অলস ও জড় হয়ে পড়ে। পুনরায় বাড়তি অপস্পৃহা জাত এবং আগত না হওয়া পর্য্যন্ত তারা অলস বা জড়ই থেকে যায়।

বুদ্ধি-প্রেরণা

কুকাজ বা সৎকাজ, যে কোনও কাজই হোক না কেন, তা সমাধা করতে স্বল্পাধিক বুদ্ধি-প্রেরণার প্রয়োজন হয়। প্রেরণা বা ইন্‌ষ্টিংক্টকে সহজাত বুদ্ধি বলা হয়। অন্য দিকে আসল বুদ্ধি, অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা

দয়া আসতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সুবিচারিতা তাঁকে আসামীর শাস্তি বিধানে বাধ্য করে। অর্থাৎ কিনা প্রেমপ্রসূত বৃত্তি সুবিচারিতা ভাবপ্রবণতা প্রসূত বৃত্তি দয়ামায়াকে চেপে রাখে। এই ত গেল সূক্ষ্ম বৃত্তি দুইটীর কথা, এইবার স্থূল বৃত্তি দুইটীর কথা বলা যাক। ক্রোধ নিষ্ঠুরবৃত্তির অন্তর্গত একটি বৃত্তি। ক্রোধকে চাপতে না পারলে, সেটা নিষ্ঠুরতারূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু এই ক্রোধকে চেপে রাখলে, সেটা নানারূপ দম্ভোক্তির মধ্যে নিষ্কাশিত হয়। "যা যা বেটা, বেঁচে গেলি, আমি তাই অন্য কেউ হলে" ইত্যাদি উক্তি এর পরিচায়ক। এই ভাবে দম্ভোবৃত্তি নিষ্ঠুরবৃত্তিকে চেপে রাখে, কারণ দম্ভোবৃত্তি নিষ্ঠুরবৃত্তির তরলাকৃত সূক্ষ্ম অংশ এবং সূক্ষ্মতা বিধায় সেটা নিষ্ঠুরবৃত্তি অপেক্ষা শক্তিশালী। সাধারণভাবে দম্ভোবৃত্তি নিষ্ঠুরবৃত্তিকে এবং ভাববৃত্তি নিম্নের উভয় বৃত্তিকে এবং প্রেমবৃত্তি নিম্নের সব কয়টী বৃত্তিকেই দাবিয়ে রাখে।

জাত হয়ে থাকে। অপরাধীদের মধ্যে এই বুদ্ধি-প্রেরণার সঙ্গে নির্ব্বুদ্ধিতাও দেখা যায়। এই নির্ব্বুদ্ধিতাও তাদের অন্তর্নিহিত জড়তা বা অলসতার জন্যে এসে থাকে, এই জন্যে অপরাধীরা তাদের অপকর্ম্ম সকলের পরিকল্পনার মধ্যে, যতই কেন বুদ্ধির পরিচয় দিক, তারা তাদের সেই পরিকল্পনার মধ্যে অনেক ফাঁক রেখে যায়, যার জন্যে কি'না তারা সহজেই ধরা পড়ে, অনেক সময় তারা তাদের নিজেদের অজ্ঞাতে অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণও তৈরী করে। তাদের অন্তর্নিহিত অদূরদর্শিতা এবং নির্ব্বুদ্ধিতাই এর কারণ, আশু সাফল্যের সম্ভাবনা, তাদের এমন উত্তেজিত করে যে প্রচুর বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করা সত্ত্বেও কিছুটা নির্ব্বুদ্ধিতাও তারা প্রকাশ করে। অপকর্ম্মে সফল হ'লে তাদের এই উত্তেজনা শেষ সীমায় আসে, এই সময় তারা কোনওরূপ সাবধানতা অবলম্বন করতে অক্ষম হয়। সাধারণভাবে আমরা স্বভাব-অপরাধীদের মধ্যে $\frac{3}{4}$ অংশ প্রেরণা এবং $\frac{1}{4}$ অংশ বুদ্ধি দেখে থাকি, মধ্যম-অপরাধীদের আমরা $\frac{1}{2}$ অংশ বুদ্ধি এবং $\frac{1}{2}$ অংশ প্রেরণা দেখি এবং অভ্যাস-অপরাধীদের মধ্যে আমরা $\frac{3}{4}$ অংশ বুদ্ধি এবং $\frac{1}{4}$ অংশ প্রেরণা দেখে থাকি। নির্ব্বুদ্ধিতা এবং জড়তা বা অলসতা আমরা স্বভাব-অপরাধীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখে থাকি। এরা চালিত হয় প্রধানতঃ ইন্‌ষ্টিংক্ট বা প্রেরণা দ্বারা, এই প্রেরণার বাইরে তাদের বুদ্ধিমত্তা কম প্রকাশ পায়। এমন অনেক অপরাধী আছে যারা কি'না হাতে কটা আঙুল আছে তাও বলতে পারে না, কেউ কেউ আবার ডান হাত হ'তে বাম হাতের প্রভেদ পর্য্যন্ত বুঝে না, কিন্তু তা স্বত্বেও তারা তাদের অন্তর্নিহিত প্রেরণার সাহায্যে নানাবিধ দুঃসাধ্য অপকর্ম্ম করতে সক্ষম হয়। মধ্যম-অপরাধীদের মধ্যে এই নির্ব্বুদ্ধিতা অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়, অভ্যাস-অপরাধীদের এই নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় আমরা আরও কম পাই। এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা বা ষ্টুপিডিটি এবং চতুরতা বা

কানিংনেসের একত্র সমাবেশ আমরা জীব-জন্তু এবং অসভ্য জাতিদের মধ্যে দেখে থাকি, এর কিছুটা সুসভ্য মানুষের শিশুদের মধ্যেও দেখা যায়। এ ছাড়া এদের মধ্যে আমরা কিউরিয়সিটি বা ঔৎসুক্যের অভাব দেখি, এই কিউরিয়সিটি বা ঔৎসুক্যের অভাব, বিশেষ করে স্বভাব-অপরাধীদের মধ্যেই অধিক দেখা যায়। এজন্য এদেশের নিরক্ষর চাষীরা আজও পর্য্যন্ত যেমন ঋক্‌বেদীয় লাঙল নিয়েই সন্তুষ্ট আছে, তেমনি স্বভাব অপরাধীরাও তাদের সেই সনাতন সিঁদকাটাই অধিক পছন্দ করে; আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য তারা এ জন্যে নিতে চায় না। এদের মধ্যে বিজ্ঞানের বীজমন্ত্র এই কিউরিয়সিটি বা ঔৎসুক্যের অভাবই এজন্য দায়ী। সময় সময় হাস্যকর নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করলেও অপরাধীরা বিশেষ করে অভ্যাস-অপরাধীরা অত্যদ্ভুদ রূপ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করে। এই সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিশেষ বিবৃতি তুলে দেওয়া হ'ল. বিবৃতিটী হতে অপরাধী বিশেষের মনো-বিজ্ঞানের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

"আমি হুজুর সাধারণতঃ নিউ মার্কেটে মেমসাহেবদের ব্যাগ ছিনিয়ে নিই। যে সকল মেমসাহেব অল্পদিন মাত্র বিলাত হ'তে এদেশে এসেছে, মাত্র তাদেরই আমি শীকাররূপে বেছে নেই। আমি প্রথমে লক্ষ্য করি মেমসাহেবদের গাল বা গণ্ডের দিকে, যদি তা'র গাল দুটা অধিক লাল দেখা যায় তাহলে আমি বুঝে নিই, মেমসাহেব সবেমাত্র এই দেশে এসেছে। নবাগত বিধায় এই ধরণের মেমসাহেবের হাত হ'তে ব্যাগ ছিনালে তারা সহসা চীৎকার করতে পারে না, কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে তারা অস্ফুটস্বরে, উ-উ—এরূপ একটা শব্দ করে মাত্র, এই সুযোগে আমরাও সরে পড়তে পারি। এরা হঠাৎ পুলিশ ডাকে না, কর্ত্তব্য ঠিক করতে এরা একটু সময় নেয়। এ ছাড়া আমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে কি'না এক দৃষ্টে বলে দিতে পারে, কোন লোকটী ভীরু, কোন লোকটী সাহসী,

কে একা যাচ্ছে, কার সঙ্গে বা অনেক লোক আছে, এমন কি কার পকেটে কত টাকা আছে তা'ও তারা অনুমান করে নেয়। আমি এমন পিক্-পকেটকে জানি যারা পকেটের উপর একটা মাত্র টোকা দিয়ে বলে দিতে পারে, সেই পকেটে নোট আছে, কি কাগজ আছে। এই ক্ষমতার জন্যে এদের আমরা গুণি বলি। যারা প্রেরণা দ্বারা পরিচালিত হয় তাদেরই আমরা বলি গুণি, আর যারা বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয় তাদের আমরা বলি "শেয়ানা"। শেয়ানারা অনেক সময় ব্যাঙ্ক কাউন্টার, পোষ্ট অফিস ও ষ্টেশন থেকে শিকার অনুসরণ করে। গুণিরা কিন্তু রাস্তায় দেখেই এদের শিকার বলে চিনে নিতে পারে। আমার এক সিঁদেল চোর বন্ধু আছে, কাল তাকে আপনার কাছে এনে দেব, তার কাছে আরও অনেক কাহিনী শুনবেন।"

অপরাধীদের দ্বারা "বোরিঙড্রিল", এ্যাসিড প্রভৃতি আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মধ্যেও অপরাধীদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। অপরাধীদের বিভিন্ন প্রকার কার্য্যপদ্ধতি, বিশেষ করে ঠগীদের কার্য্য-পদ্ধতিগুলি বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে পণ্ডিত ব্যক্তিদেরও চমৎকৃত করে। আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং অপরাধীদের বিভিন্ন কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে পুস্তকের ২য় খণ্ডে আলোচনা করব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবলমাত্র অপরাধীদের মনস্তত্বসূচক বুদ্ধিমত্তা সকল আলোচিত হবে। এই বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে অন্য আর একটী বিবৃতি দেওয়া হ'ল।

"আমি হুজুর একজন বাড়ীর চোর। ঐদিন ঐ বাড়ীটায় আমিই চুরি করি। চুরির আগের দিন সন্ধ্যায় বাড়ীটার নীচের একটা খোলা মাঠে আমি সিঁদকাটীটা পুতে রাখি। অধিক রাত্রে পাছে যন্ত্রপাতি শুদ্ধ পথে ধরা পড়ি, এই ভয়ে আমরা আগে থেকে সুবিধামত অকুস্থলের নিকটেই যন্ত্রগুলি পুতে রাখি। এর পর সন্নিকটস্থ একটা খোলার বাড়ীতে আমি

আশ্রয় নিই।, এবং কথিত বাটির ঝিএর সঙ্গে আলাপ জমাই। গভীর রাত্রে অকুস্থলে গিয়ে আমি সিঁদকাটীটা উঠিয়ে নেই, এবং পরে পাঁচিলের ওপর দিয়ে ভিতরের দিকে একটা দড়ী ফেলে দিই। ব্যবস্থা মত বাড়ীর ঝি উঠানে সজাগ ছিল। সে তৎক্ষণাৎ জলের কলের পাইপটার সঙ্গে দড়ীর একটা মুখ বেঁধে দেয়, আর আমি সেই দড়ী ব'য়ে ভিতরে নামি। এর পর পাইপ ব'য়ে আমি উপরে উঠি। উপরের ঘরের দরজাটা বন্ধ দেখা যায়। আমি কৌশলে দরজার ফাঁকে লোহার শিক ঢুকিয়ে দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে নিই। ঘরের ভিতর মশারীর ভিতর ফরিয়াদি এবং তার স্ত্রী ঘুমাচ্ছিল। আমি ডিঙি দিয়ে দিয়ে, তাদের শিয়রে এসে বসি। এর পর নিঃশব্দে একটা বিড়ি ধরাই। এই বিড়ীর মধ্যে কোকেন চরস, ক্যাম্ফার ইত্যাদি ছিল। এই মিশ্র দ্রব্যের ধোঁয়ার মধ্যে একটা মাদকতা আছে। এই ধাঁয়া নাকে গেলে মানুষ অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। এর পর আমি ধীরে ধীরে মহিলাটীর গায়ে হাত দিই। কুমারী মেয়েদের গা হ'তে গহনা খুলবার সময় আমরা যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করি, হুজুর, বিবাহিত মহিলাদের বেলায় আমরা এতটা সাবধানতা প্রয়োজন মনে করি না। কারণ হঠাৎ ঘুমন্ত অবস্থায় গায়ে হাত লাগলে, বিবাহিতারা মনে করে, সেটা তাদের স্বামীর হাত, এই জন্যে এরা জেগে উঠে না, কুমারীরা কিন্তু এই ক্ষেত্রে স্পর্শ মাত্রেই জেগে উঠে। আমি মহিলাটীর গা হ'তে সকল গহনাই নিঃশব্দে খুলে নিই। তার পর ঝুটা চাবির সাহায্যে আলমারী খুলে অন্যান্য দ্রব্য বের করি। কিরূপ ভাবে চাপ দিলে বা নাড়লে কোন কোন তালা কি ভাবে খোলা যায় তা আমাদের জানা আছে। আড্ডাখানায় সরু শিকের সাহায্যে তালা খোলা আমরা হামেসা অভ্যাস করি। এই সব কাপড় চোপড় গহনা আদি একত্রে বেঁধে অচীরেই আমি নেমে আসি এবং নিকটের এক বেশ্যা

গৃহে রাত্রি কাটাই, কারণ রাত্রে বামালসহ রাস্তা চলা নিরাপদ নয়। হাঁ, হুজুর, রাত্রের কোন সময়, গৃহস্থেরা অঘোরে ঘুমায়, সে সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। কতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘরের আলো জ্বলে, এইটেই আমরা বিশেষ করে লক্ষ্য করি। রাত্রি দেড়টা বা ছুইটার পর আলো নিবলো, আমরা বুঝে নিই এবার এরা অঘোরে ঘুমাবে। বাড়ীতে কোনও বাচ্ছা শিশু আছে কি না, সে সম্বন্ধেও আমরা খবর নি। কারণ এই সব শিশুরা হঠাৎ জেগে উঠে। শীতকালে প্রথম রাত্রে এবং গ্রীষ্মকালে শেষ রাত্রে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, অভিজ্ঞতা হতে আমরা এরূপ জেনেছি। আমাদের কেউ কেউ অকুস্থলে এসে অত্যন্ত নারভাস্ হয়ে পড়ে, বিষ্ঠা ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত তাদের এই ভয় বা নারভাস্নেস কাটে না। এজন্যে তারা অকুস্থলেই বিষ্ঠা ত্যাগ করে। সময় মত বিষ্ঠা ত্যাগ না হ'লে, এরা অপকর্ম্ম না করেই চলে যায়। আজকাল আমরা নানারূপ যন্ত্রপাতির ব্যবহারও শিখছি, এমন কি ইলেকট্রিক ল্যাম্প, এ্যাসিড প্রভৃতির ব্যবহার পর্য্যন্ত—আমরা চোরাই মাল নিজেরা কখনও পাচার করি না। আমরা এ বিষয়ে চোরাই মালের গৃহীতাদের, বিশেষ করে বড় বড় দোকানদারের সাহায্য নিই।"

সাধারণতঃ যে সকল অপরাধীরা দল বেঁধে অপকর্ম্ম করে, তারাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় অধিক দেয়। এ বিষয়ে পিক্-পকেটদল, এবং ডাকাতরা অন্যতম। পিক্-পকেটদের মধ্যে প্রেরণা এবং ডাকাতের মধ্যে বুদ্ধি অধিক দেখা যায়। ডাকাতদের ন্যায় পিক্-পকেটরাও অনেক সময় সর্দ্দার বা নেতা দ্বারা পরিচালিত হয়। পিক্-পকেটদের, যে যেখানে যা কিছু "কাজ" করে তা তারা তাদের সর্দ্দারদের কাছে এনে জমা দেয়। এই সর্দ্দার চুরির মাল সমান ভাবে সকলের মধ্যে বণ্টন করে দেয়, ফলে একজনের কপালে যদি সেদিন কোন শিকারই না জোটে তা

হ'লেও সে উপবাসী যায় না। এই পিক্-পকেট আদি সরল-চোরেরা সময় সময় অত্যদ্ভুত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকে। এদের কেউ কেউ নিম্নে একটী ইজের বা পাতলা পাণ্ট্‌লন ও পাঞ্জাবী পরে এবং তার উপর একটা লুঙ্গী পরে, গা'য়ে একটা কোটও চাপায়। অপকার্য্যের পর ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এসে এরা তাড়াতাড়ি কোট এবং লুঙ্গীটা খুলে ফেলে অকুলস্থলে ফিরে আসে। এই অবস্থায় তাকে দেখে ফরিয়াদি এবং আশে পাশের কোনও লোকই আর তাকে চিনতে পারে না। কারণ তাদের দৃষ্টি থাকে লুঙ্গিপরা কোট গায়ে ব্যক্তিদের দিকে, পাণ্ট্‌লন ও পাঞ্জাবীপরা ব্যক্তিদের দিকে তারা ফিরেও দেখে না। এটা ছাড়া এ সব পিক্-পকেটরা বোতল ভাঙ্গা কাঁচ ঘষে এমন সব ছুরী তৈরী করে যা দিয়ে পকেট ত কাটা যা'ই এমন কি উহা দ্বারা দাড়ীও কামান চলে। এই সব চোরদের মধ্যে এমন অনেক চোর আছে যারা তাদের গেঞ্জির উপর একটা রবারের বেল্ট এঁটে দিয়ে তার উপর একটি সার্ট ও কোট চাপায়। দোকান থেকে বস্ত্রাদি তুলে নিয়ে নিমিষে সেটা গেঞ্জির্ নীচে এরা ঢুকিয়ে দেয়। গেঞ্জির নিম্নাংশ রবারের বেল্ট দ্বারা বেষ্টিত থাকায় সেটা আর নীচে পড়ে না, ফলে অপরাধীটী হাত দুলাতে দুলাতে প্রকাশ্যেই বেরিয়ে আসতে পারে। এই সব অপরাধীরা দলের জন্যে ছেলে ছোকরা সংগ্রহ করার মধ্যেও কম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় না। এ বিষয়ে নিম্নের বিবৃতিটী প্রণিধান যোগ্য।

"আমাকে হিরু সর্দ্দার প্রথমে পানের সঙ্গে কোকেন খেতে শেখায়। এই নেশার খাতিরে প্রত্যহই আমি তার সঙ্গে দেখা করতে বাধ্য হই। সর্দ্দারজী আমাকে বায়স্কোপ দেখার জন্যে প্রায়ই পয়সা দিত। এ ছাড়া আমাকে সে নানারূপ কু-অভ্যাসও শেখায়, এ ছাড়া সর্দ্দারজী আমাদের জন্যে কয়েকটী মেয়েও এনে দেয়। আমাদের শিক্ষার জন্যে সর্দ্দারজী

স্বগৃহে একটা ইস্কুলও খুলে ছিল, এখানে আমরা তালা চাবি তৈরী করতে এবং খুলতে শিখি। এর পর আমাদের পরীক্ষার দিন ধার্য্য হয়। সর্দ্দারজী আমার হাতে একটা কাপড় কাচা সাবান দিয়ে বলেন—'যা'দিকিন, বাড়ী গিয়ে ম'ার আঁচল থেকে সিন্ধুকের চাবিটা খুলে তার একটা ছাঁচ নিয়ে আয়।' আমি বাড়ী গিয়ে সুবিধামত মায়ের চাবিটা সাবানের নরম অংশে ঢুকিয়ে দিয়ে ছাঁচ তৈরী করি। সর্দ্দারজীর ডেরায় এই ছাঁচ থেকে চাবি তৈরী হয়। এর পর এক মাসের জন্যে আমি মামার বাড়ী চলে যাই, ফিরে এসে শুনি ময়ের সিন্ধুকেরও যাবতীয় গহনাপত্র চুরি গেছে।"

নিম্নের বিবৃতিটি পকেটমার অপরাধীদের মনস্তত্ব জ্ঞানের পরিচয় দেয়।

"পকেটমারার পূর্ব্বে আমরা মানুষকে জোরে একটা ধাক্কা দিই। এবং এর পরেই তার পকেটটা কেটে ফেলি। ফলে পকেট কাটার জন্যে ছোট ধাক্কাটা সে আর অনুভব করে না। মানুষ তখন বড় ধাক্কাটীর কথাই ভাবে এবং অসাবধানে পথ চলার জন্যে আমাদের গাল পাড়ে। এক কথায় বড় ধাক্কার আওতায় ছোট ধাক্কাটি আর অনুভূত হয় না।"

এই সব শহুরে চোরেদের ন্যায় পল্লীগ্রামের চোরেরাও নানারূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়, বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা অগ্নি সহযোগে গবাদি পশুর শিং বাঁকান বা সোজা করা যায়। সোজা শিং গরু চুরি সম্বন্ধে থানায় ডাইরী হয়েছে, এদিকে চোর উক্তরূপ উপায়ে চুরি করা গরুটীর শিং বাঁকা করে দিয়ে রক্ষা পেয়েছে, পল্লীগ্রামে এমন অনেক কাহিনী শোনা যায়। এ বিষয়ে কিছুদিন আগে আমি এরূপ একটী গল্প শুনি ; কোনও এক অপরাধী একটী শ্বেতকায় ছাগল চুরি করে সেটা ভক্ষণ করে, কিন্তু তার ছালটী জুতার কাল কালি দ্বারা পালিশ করে গৃহেই রেখে দেয়। চুরির তদন্তে এসে দারোগা সাহেব কাল ছাগলের ছাল দেখে

অপরাধীটিকে নাকি আর গ্রেপ্তার করেন নি। কোনও এক গ্রামে তদন্ত ব্যপদেশে দারোগা আসেন। তদন্ত করতে করতে হঠাৎ দারোগা লক্ষ্য করেন, পাশের বাড়ীর বিচালীর গাদাটী দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। বলাবাহুল্য এই অগ্নিকাণ্ডের নায়ক এবং তার সাকরেতরা দারোগার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পরে জানা যায়, অগ্নিকাণ্ডের প্রধান হোতা লোক মারফৎ একটা মালায় করে কিছুটা ফস্‌ফরাস বিচুলি গাদায় বহু পূর্ব্বেই রেখে আসে। মালাটায় হিসাব মত জল রাখা ছিল। জলের ভিতর থাকায় ফস্‌ফরাসের টুকুরাটুকু সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠে নি। ঘণ্টাকয় পরে, এই জল শুকিয়ে যায়, এবং ফস্‌ফরাসটীও জ্বলে উঠে। দারোগার সামনে হাজির থাকায় অগ্নিকাণ্ডের জন্যে এদের কাউকেই আর দায়ী করা যায় না। অপরাধীদের এই বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে একটী বিলাতী উদাহরণ দিয়ে বর্ত্তমান পরিচ্ছেদটী শেষ করা যাক। এ বিষয়ে হ্যাভলক এলিস্ সাহেবের "দি ক্রিমিন্যাল" পুস্তকের ১৫৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

"চোরদের রিপাবলিকে" জোনাথন্ ছিল একজন ডিকটেটার। শেষ বরাবর সে লণ্ডনের চোরদের একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে উঠে। এক দিক দিয়ে যেমন সে চোরের রাজা ছিল, অন্য দিকে সে পুলিশকে চোর ধরাতে সাহায্যও করেছে। বলাবাহুল্য বিপক্ষ পক্ষীয় চোরদের এবং যে সব চোরেরা তার অবাধ্য হত, জোনাথন্ মাত্র তাদেরই ধরিয়ে দিত। অন্য সকলকে রক্ষা করবার জন্যে কিন্তু সে চেষ্টার কোনওরূপ ত্রুটী করে নি। এদের কেউ দৈবাৎ কারাবরণ করলে জোনাথন্ তাদের পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করত, এবং তাদের রক্ষিতাদেরও খবরদারি করত। পরিশেষে জোনাথন্ লণ্ডন সহরে চোরাই মাল উদ্ধারের জন্যে একটী অফিসও খুলে। হৃতসর্ব্বস্ব নাগরিকরা এই অফিসের কানুন মত, কিছু টাকা জমা দিয়ে

দরখাস্ত করত, এদের কেউ কেউ তাদের অপহৃত দ্রব্যাদির কিয়দংশ ফিরে পেত, এই ভাবে সে নগরবাসীদের ও সরকার বাহাদুরের বিশ্বাস ভাজন হয়ে উঠে। জোনাথন্ সমগ্র ইংলণ্ডকে কাজের সুবিধার জন্যে কয়েকটী জিলাতে ভাগ করে! এবং এক একটী জিলাতে অপকর্ম্মের জন্যে এক এক জন সর্দ্দারের অধীনে এক এক দল অপরাধী নিযুক্ত করে। এই সব অপরাধীরা তাদের সর্দ্দারদের মারফৎ চোরাই মাল সব জোনাথনের কাছে পাঠিয়ে দিত। এই সব চোরেরা কেউ 'কমিশন বেসিসে,' কেউ বা মাসিক মাহিনায় জোনাথনের অধীনে কাজ করত। জোনাথন্ অপকার্য্যের জন্যে এদের পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করত, জরিমানাও। এমন কি চোরাই মাল পাচারের জন্যে জোনাথন্ ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও প্রতিনিধি নিযুক্ত করে। জোনাথন্ তার দেহরক্ষী রূপে কেবলমাত্র ফেরারী আসামীদেরই নিযুক্ত করত, কারণ তার বিশ্বাস ছিল এই সব ব্যক্তি ইচ্ছা সত্বেও তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।"

এই ধরণের অত্যদ্ভুত বুদ্ধির পরিচয় অপকর্ম্মের মধ্যে দেখা গেলেও, অপরাধীরা তাদের অন্তর্নিহিত নির্ব্বুদ্ধিতার এবং অদুরদর্শিতার জন্যে এমন অনেক ফাঁক তাদের অপকর্ম্মের মধ্যে পূর্ব্বাপর ভাবে রেখে যায়, যা কি'না অভিজ্ঞ শান্তিরক্ষকদের নজর এড়ায় না, এই জন্য প্রভূত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হওয়া সত্বেও নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে অপরাধীরা পরিশেষে ধরা পড়ে তাদের অপরাধ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

অপকর্ম্মের সময় অপরাধীরা অত্যন্ত রকমে উত্তেজিত হয়ে উঠে। সাফল্য লাভের পর এদের উত্তেজনা শেষ সীমায় উপনীত হয়। এই উত্তেজনার জন্যেও এদের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। কোনও কোনও অপরাধী তাদের দাম্ভিকতার জন্যেও প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করে না। এই-

জন্যে অপরাধীরা সময় সময় এমন অনেক চিহ্ন * অকুস্থলে রেখে আসে, যে সব চিহ্ন বা সূত্রের সাহায্যে সহজেই তারা ধরা পড়ে।

এদেশের অপরাধীরাও সংগঠনের দিক থেকে কম বুদ্ধি প্রকাশ করে না। এদেশের রঘু ডাকাত, গৌর বেদে প্রভৃতি ডাকাতেরা এ বিষয়ে অন্যতম ছিল। এ বিষয়ে এই বিবৃতিটী প্রণিধান যোগ্য।

"আমাদের জুয়ার অড্ডাটা ছিল তেতালার ছাদের উপর। বাড়ীটার বিভিন্ন ফ্লাটে বহু লোকই বাস করত, তাদের অনেককেই আমরা জুয়াড়ী করে তুলি। আত্মরক্ষার জন্যে আমরা চারিদিকে পাহারা রাখতাম, ছোকরা পাহারাই রাখতাম আমরা বেশী। অদূরে রাস্তার মোড়ে নির্দ্দেশ মত দুটা ছোকরা মারবেল খেলত। পুলিশের হাল্লা দেখলেই মারবেল খেলতে খেলতে এগিয়ে এসে সে অন্য আর একটী ছেলেকে খবর দিত, যে কিনা সেখানে লাট্টু ঘোরাচ্ছে। লাট্টুওয়ালা ছেলেটী লাট্টু ঘুরাতে ঘুরাতে এগিয়ে এসে মোড়ের মাথায় একটী যুবককে খবর দিত। এই যুবকটী খবরের অপেক্ষায় ঘুড়ী ও লাটাই হাতে বাড়ীর কাছেই অপেক্ষা করত। খবর পাওয়া মাত্র বাড়ীটার একতলার পানের দোকানে সে দৌড়ে আসত। এই দোকানটায় একটা ইলেক্‌ট্রিক সুইচ থাকত। এই সুইচের সঙ্গে দোতলার একটা কলিঙ বেলের সংযোগ ছিল। কলিঙ বেলটা বেজে উঠা মাত্র দোতলার পাহারাদার তেতলার ছাদে এসে আশু বিপদ সম্বন্ধে খবর জানাত এবং আমিও নালের টাকাগুলো উঠিয়ে নিয়ে সরে পড়তাম, জুয়াড়ীরাও এধারে ওধার ছড়িয়ে পড়ত।

---

* এই দাম্ভিকতার জন্যে কেউ কেউ অকুস্থলে নাম লেখা কার্ডও রেখে আসে। দলগত সংস্কারের জন্যেও কেউ কেউ অকুস্থলে নানাবিধ চিহ্ন রেখে আসে, যথা:— খড়, দড়ি ইত্যাদি!

পুলিশ ছাদে এসে না পেত টাকাকড়ি, না পেত কোনও যন্ত্রপাতি বা লোকজন। গোয়েন্দাকে গাল দিতে দিতে তারা ফিরে যেত, বিফল মনোরথ হয়ে—"

অপরাধীদের বুদ্ধিপ্রেরণার আরও প্রমাণ স্বরূপ কলিকাতার পুলিশ জার্নেলে প্রকাশিত "পাগলা হত্যার কাহিনী" হ'তে কিছুটা অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"২০এ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬—আমরা খবর পাই খাঁদা হাওড়ার একটা বাড়ীতে লুকিয়ে আছে। তৎক্ষণাৎ আমরা হাওড়া রওনা হই, এবং সেই বাড়ীটী সমগ্র সিপাহীদের দ্বারা ঘেরাও করাই, খাঁদা নামে লোকটা ধরা পড়ে। লোকটা বিনা যুদ্ধে ও শস্ত্র প্রয়োগে ধরা দেয়। তাকে দেখেই আমাদের ইনফরমার কাঁপতে সুরু করে। এর পর অনেকেই তাকে খাঁদা বলে সনাক্ত করে। খাঁদার ফটোগুলির সহিত তার চেহারা অবিকল মিলে যায়, খাঁদার ঠোঁট ও ভ্রূর উপর কাটা দাগ ছিল, এই লোকটীরও সেরূপ দাগ দেখা যায়। খাঁদার বুকে উল্কি দ্বারা বেঙ ও ফুল প্রভৃতি এবং ডান হস্তে নারিকেল গাছ, সাপ, "প্রাণের খেঁদা" প্রভৃতি আঁকা ছিল, এই লোকটীর দেহেও সেরূপ প্রতিকৃতি সকল দেখা গেল, বুকের মাপ এবং দৈর্ঘ্যও একরূপ দেখা যায়। সনাক্তি সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসন্দেহ হ'লেও আমি তাকে খাঁদা বলে বিশ্বাস করি নি। কারণ খাঁদা বিনা রক্তপাতে ধরা দিতে পারে না। পরে তদন্তে জানা যায় এই ব্যক্তিটী খাঁদা নয়, খাঁদার একজন সাকরেত মাত্র। হুবহু অনুরূপ দেখতে এই ব্যক্তিটীকে খুঁজে বার করে সে দলে ভর্ত্তি করে। একে ডুপ্লিকেট খাঁদা বলা হ'ত, খাঁদার নির্দ্দেশে সে খাঁদার অনুরূপ উল্কীচিত্র এবং আঘাতের চিহ্নাদি নিজ দেহে ধারণ করে, উদ্দেশ্য, খাঁদার নামে সময় বিশেষে জেল খাটে, যাতে কি'না খাঁদা বাইরে থাকলেও লোকে মনে করতে

পারে সে জেলে আছে। টিপের কাগজ হ'তে আমাদের এই ভুল আমরা ধরে ফেলি।"

কোনও কোনও ক্ষেত্রে অপরাধীদের এই বুদ্ধিবৃত্তি বাহাদুরী বা ব্রাভাডো মিশ্রিতও হয়ে থাকে। এই ব্রাভাড়ো মিশ্রিত বুদ্ধির উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটি বিশেষ বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

"আমি আলিপুরের একজন এ্যাডভোকেট্। কিছুকাল পূর্ব্বে সন্ধ্যার সময় গড়ের মাঠে, আমি খিদিরপুরের ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ লুঙ্গীপরা একটা লোক এগিয়ে এসে নাকের উপর একটা চকচকে ছোরা উঠিয়ে হেঁকে উঠল, কি আছে বার কর শীঘ্রি। ভয়ে মনিব্যাগটা আমি তার হাতে তুলে দিই। ব্যাগে সেদিন ৩৫০৲ টাকা ছিল। টাকাগুলা গুণে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে সে কি ভাবল। আমার দেহে উকিলের পোষাক ছিল, আমার পোষাকের দিকে চেয়ে সে বলল, 'ওঃ আপ উকিলবাবু, আচ্ছা যাইয়ে আপ।' টাকা কট'াকে ব্যাগ সমেত আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে সে চলে গেল। তার ব্যবহারে সেদিন আমি অবাক হয়ে গিছলাম। এর মাস তিন পর একদিন চেম্বারে বসে আছি, হঠাৎ একটা লোক ঘরে ঢুকে শুধাল, আদাব। অনুমানে বুঝলাম মক্কেল, শুনলাম সে এক মহা বিপদে পড়েছে। তাকে আশ্বস্ত করে আমি তার কাছে 'ফি' চাই। 'ফি' এর নাম শুনে সে অবাক হয়ে বলে, 'ফি?' ফি আবার কি? ফি ত আপনাকে সেদিন মাঠে ছেড়ে দিয়েছি। ঐ ত আপনার ফি হল।' তিন মাস আগেকার ঘটনাটি আমার মনে পড়ে যায়। আমি সভয়ে টেবিলটা তার ঘাড়ের উপর উল্টে দি, সেও টেবিলটা আমার ঘাড়ে উল্টে দিয়ে বেইমান বলে বেরিয়ে যায়।"

আত্মরক্ষার কারণেও অপরাধীরা নানারূপ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেয়,

মিথ্যা ভাষণের মধ্যে আমরা ইহার পরিচয় পাই। ধরা পড়ার পর এরা নিম্নোক্ত রূপ বহুবিধ মিথ্যা ভাষণের সাহায্য নেয়।

"আমি মশাই একজন নিরপরাধী ব্যক্তি। আমি অপরাধী বটে, কিন্তু চোর নই। ফরিয়াদির যুবতী কন্যার সঙ্গে.আমার প্রেম হয়। আমি গোপনে রাত্রিযোগে কথিত কন্যার ঘরে যেতাম, কিন্তু কাল ধরা পড়ে যাই। ক্রুদ্ধ হ'য়ে ফরিয়াদি এই ঘটীটা হাতে দিয়ে আমাকে পুলিশে দেয়। লোকলজ্জাবশতঃ আসল বিষয়টী ফরিয়াদি গোপন করেছেন। ফরিয়াদির স্ত্রীও আমার এই প্রেম সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তিনিও আমাকে গোপনে বাটী বাটী দুধ খাইয়েছেন।"

চাকর চোরেদের প্রায়ই এই ধরণের মিথ্যা বিবৃতি থানায় দিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ অভ্যাস অপরাধীরাই এরূপ মিথ্যার আশ্রয় নেয়। কোনও এক চাকর-চোর গহনা শুদ্ধ ধরা পড়ার পর এইরূপ উক্তি করে— "ওত গিন্নী-মা আমাকে কর্ত্তাকে না জানিয়ে চুপি চুপি বাঁধা বা বিক্রী করে টাকা আনতে বলেছেন।" অন্য আর (নারী) এক অপরাধী এরূপ অবস্থায় নিম্নোক্তরূপ উক্তি করে, "দাদাবাবুর সঙ্গে আমার প্রেম হয়। তিনিই আঙটীটা চুরি করে আমায় উপহার দেন। এখন ভয়ে ও লজ্জায় উনি এ কথা অস্বীকার করছেন।"

সাক্ষ্যপ্রমাণ

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদগুলিতে অপস্পৃহা, শোণিতস্পৃহা, ভাবপ্রবণতা প্রভৃতি বিষয়বস্তুগুলির প্রমাণ স্বরূপ বহু কাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটা প্রমাণের উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমে শোণিতস্পৃহার প্রমাণ স্বরূপ আরও একটী কাহিনীর উল্লেখ করা যাক্।

"তদন্তকারী অফিসারের বিশ্বাস ছিল, হত্যাকারী অকুস্থলে ফিরে আসবে। এই জন্যে অকুস্থলের জনসাধারণকে তিনি অপরাধীর হুলিয়া সম্বন্ধে অবহিত করেন, এবং এরূপ চেহারার কোনও লোককে অকুস্থলে ঘুরাঘুরি করতে দেখলে তাকে আটকে রাখতে অনুরোধ জানান। দুই দিন পরই ঐরূপ একটী লোককে আমরা এইখানে ঘুরাঘুরি করতে দেখি। চ্যালেঞ্জ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে দৌড় দেয়, আমরাও তাকে অনুসরণ করি।"

অপরাধীদের অন্তর্নিহিত ভাব প্রবণতা সম্বন্ধে অপরাধ বিজ্ঞান-বিদ্‌-পণ্ডিত ডোয়েটোইফস্কি এরূপ লিখে গেছেন, "জেলে থাকাকালীন এমন অনেক অপরাধীকে জানতাম যারা কিনা আসলে নির্দ্দয় পশু ছিল, অন্তরের সঙ্গে আমি তাদের ঘৃণা করতাম, কিন্তু এদের মধ্যেও সময়ে সময়ে অভাবনীয়রূপে আমি ভাবপ্রবণতা দেখেছি। এই সম্বন্ধে লম্ব্রোসো সাহেব এরূপ লিখে গেছেন, "কোনও এক অপরাধী গলায় দড়ী দেয়। আত্মহত্যার পূর্ব্বে বিছানার উপর কুশ নির্ম্মিত একটী ক্রসের দুই ধারে তার জুতা দুইটী সাজিয়ে রাখে. এতদ্বারা সে এরূপ বলতে চেয়েছিল— ওগো, আমি চললাম, তোমরা আমার জন্যে প্রার্থনা কর। ভাবপ্রবণতার এটা একটী অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

এই সম্বন্ধে নিম্নে একটী চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল। বিবৃতিটী প্রণিধান যোগ্য।

"রক্ষীরূপে কর্ম্মবহাল হবার পর সর্ব্ব প্রথম আমি সরযূ তেয়ারী নামক একজন পুরানো চোরের মামলা তদন্ত করি। ঐ অপরাধী যখন জানলো যে আমার হাতের ইহা প্রথম মামলা, তখন সে খুসী হয়ে বলে উঠলো, 'হুজুর, আপনার আর কষ্ট করে আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে না, আমি এইবারকার মত আদালতে অপরাধ স্বীকার করে নেবো।

আমার এই মামলা আপনার জীবনে প্রথম মামলা, রক্ষী জীবনে আপনি বহু উন্নতি করবেন, এ কথা এখনই আমি জানিয়ে রাখছি, পরে মিলিয়ে দেখবেন, আমার কথা সত্য হ'ল কিনা ?"

অপস্পৃহা সম্বন্ধে পূর্ব্বে বহু দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয়েছে,—এ সম্বন্ধে আরও সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া উচিত।

ইহার প্রমাণস্বরূপ হ্যাভলক্ এলিস উল্লেখিত কয়েকটী বিলাতী উদাহরণ বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে দেওয়া যাক। এ সম্বন্ধে হ্যাভলক এলিস সঙ্কলিত "অপরাধী" নামক পুস্তকের ১৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অপরাধ-স্পৃহার স্বভাবগত ও দুর্দ্দমনীয় শক্তি সত্য সত্যই বিস্ময়কর। সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়েছে; এই জন্যে ইহা আর অবিশ্বাস্য নয়। ঠগী ক্যাসানোভা তার ঠকামির সুচতুর মতলবগুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হ'লে সে এরূপ উক্তি করেছিল,—আমার অত্যদ্ভুদ মতলব-গুলির কোনটীও, কিন্তু পূর্ব্বকল্পিত নয়, সেটা সব সময় আমার নিজের অজ্ঞাতেই এসে যায়। আমি যখন আমার এই মতলব-সকল কাজে লাগাই আমার মনে হয়, কোনও এক অজ্ঞাত শক্তিমান হস্ত জোর করে আমার দ্বারা অপকর্ম্ম সকল করিয়ে নিচ্ছে। বহু পকেটমার লম্ব্রোসরের কাছে এরূপ বিবৃতি দেয়—"মশাই, যখন আমাদের প্রেরণা (স্পৃহা ?) আসে, আমরা কিছুতেই নিজেদের ঠিক রাখতে পারি না, চুরি তখন আমাদের করতেই হয়!" অন্য আর এক অপরাধী এরূপ উক্তি করে —"আমার অপরাধ কি ? চুরি না করার জন্যে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি কিন্তু চুরি না করে আমি কিছুতে পারি নি। এক্ষেত্রে আমি দোষী নই, কারণ আমি চেষ্টা করেছিলাম।"

জো ব্রাগ ওরফে আলবার্ট বোরক্ নামক কোন এক (অভ্যাস ?) অপরাধী স্বকীয় চেষ্টা দ্বারা কিছুকাল নিরপরাধ থেকে, পরে আবার

অপরাধী হয়ে যায়। এর কারণ সম্বন্ধে সে নিম্নোক্তরূপ একটী স্বীকারোক্তি করে। সে এরূপ বলে—"আমার পিছনে এক ব্যক্তিকে আমি ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পাই। আমি উঠে বসে তার দিকে তাকাতে থাকি। নিকটে কেউই ছিল না। হঠাৎ আমার তার পকেটের দিকে লক্ষ্য পড়ে। পকেটটাকে ফোলা ফোলা দেখাচ্ছিল। কৌতূহল হ'ল পকেটে কি আছে দেখবার জন্যে। পকেটে আমি দশটী স্বর্ণ মোহর পেলাম। নয়টী মোহর পুনরায় তার পকেটে ফেলে দিয়ে, মাত্র একটী মোহর আমি তুলে নিলাম। এই সময় আমার অর্থের বড় টানাটানি চলছিল। মনে হ'ল, না বলে, এটা কর্জ্জ নেওয়া যাক্। পরে ফিরিয়ে দিলেই হবে। তাকে চিনে রাখবার জন্যে তার মুখটা ভাল করে দেখে রাখলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পথ চলার পর হঠাৎ আমাকে আমার পূর্ব্ব প্রেরণায় পেয়ে বসল। আমি বাইবেল খানাকে পথিপার্শ্বে নিক্ষেপ করে নৃত্যরত হলাম। তারপর আমি পুনরায় অকুস্থলে ফিরে এসে লোকটার বাকি নয়টী স্বর্ণ মোহর অপহরণ ত করলামই, তা ছাড়া তার অন্য পকেটের রৌপ্য মুদ্রা কয়টী, এমন কি হতভাগার নূতন বুটজোড়াটাও অপহরণ করতে দ্বিধা করলাম না। সুবিধা হ'লে আমি তার পেণ্টুলনটাও খুলে নিতাম।"

এই সব কাহিনী থেকে অপস্পৃহার অবস্থিতি এবং তার অত্যদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'তে হয়। মানুষের অভাব, প্রয়োজন, লোভ প্রভৃতির জন্যে কিরূপে এই অপস্পৃহার আবির্ভাব হয় সে সম্বন্ধে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদগুলিতে আলোচিত হয়েছে। স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে ইহার শক্তি থাকে অত্যন্তরূপ মৃদু, তাই সব সময় আমরা সেটা অনুভবও করি না। কিন্তু প্রয়োজনাদির জন্য যে কোনও মুহূর্ত্তে তার আবির্ভাব ঘটাতে পারে। এ সম্বন্ধে আমার কোনও এক বন্ধু এরূপ বলেছিলেন—

"আমাকে যদি কেউ একটা চোরাই গহনা বিক্রী করতে আসে ত তাকে আমি মারি ত বটেই, এমন কি পুলিশেও ধরিয়ে দিই। কিন্তু কেউ যদি আমার কাছে চা'য়ের জন্য চোরাই 'চিনি' বা লেখার জন্য একটা চোরাই ফাউনটেনপেন্ বা পড়ার জন্য একটা দুষ্প্রাপ্য বই এনে দেয় ত চোরাই মাল গ্রহণের শেষ পরিণতি সম্বন্ধে অবহিত থাকা সত্ত্বেও তা আমি ক্রয় করি। ঘর সাজাবার জন্য কোনও এক দুষ্প্রাপ্য ছবি বা মনোমত [illegible]প কোনও দ্রব্য পেলেও হয়ত এই কারণে আমি উহা নিয়ে নিই।"

কোনও এক পকেটমার মাররো সাহেবের কাছে এইরূপ উক্তি করে —"আমি কোনও ভদ্রলোকের পকেটে যদি দামী ঘড়ী দেখি, ত আমার অর্থের কোনও প্রয়োজন না থাকলেও, আমার মনে হয় ঘড়ীটি আমার নিতান্ত প্রয়োজন। ডস্টয়ফস্কি সাহেব কোনও এক দুর্দ্দান্ত চোর সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ বিবৃতি দেন। অপরাধীটি দুর্দ্দান্ত হ'লেও নানা কারণে সাহেবের অনুরক্ত ছিল।

"সে প্রায় অনিচ্ছা সত্বেই আমার দ্রব্যাদি অপহরণ করেছে, কিন্তু কখনও আমার সম্মতি সত্ত্বেও আমার দান নেয় নি; আমার কাছ থেকে কোনও কিছু ধারও সে চায় নি। সে চুরি করত অর্থের প্রয়োজনে নয়, তার অপঃইচ্ছার উপশমের জন্যেই সে চুরি করত। একদিন আমার নিত্য প্রয়োজনীয় বাইবেল পুস্তকটা চুরি করে সে বিক্রী করে দেয়, মদ কেনবার জন্যে। অর্থের প্রয়োজন হওয়াতে নাকি সে ঐরূপ করে, হয়ত মদ খাবার জন্যে সেদিন তার একটা দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা আসে, যে কোনওরূপ ইচ্ছাই হোক তার উপশম বা নিবৃত্তি সে ঘটাবেই, আমি তাকে এজন্য বহু ভৎর্সনা করি, সে আমার ভৎর্সনায় বিরক্ত হয় না, বরং ধীর ভাবেই সে তা শুনে, স্বীকার করে, বাইবেল আমার কাছে অতীব প্রয়োজনীয় সামগ্রী। আমার দুঃখে সে দুঃখিতও

হয়, কিন্তু এজন্য তাকে অনুতপ্ত বা লজ্জিত দেখা যায় না। তার ধারণা ছিল এরূপ গালিগালাজ দ্বারা আমার মনের শান্তি ফিরে আসবে এবং আমার মনের সকল দুঃখ বা ক্ষোভও এর দ্বারা বিদূরিত হবে। এইভাবে আমার বাইবেল হারানোর ক্ষতিজনিত সকল দুঃখ আমি ভুলে যাব, তার ওরূপ ধারণা থাকার জন্যেই সে আমার এই সব ভৎর্সনা আনন্দের সহিত সহ্য করে। মনে মনে কিন্তু সে আমাকে একজন নির্ব্বোধ বালকের মত মনে করে, আমি যেন একজন মস্ত মূর্খ, পৃথিবীর হাল চাল সম্বন্ধে আমি যেন একেবারেই অনভিজ্ঞ। চুরি করা রূপ একটা সাধারণ ব্যাপারের জন্যে আমি যে কেন এতটা মাথা ঘামালাম তা তার হৃদয়ঙ্গমই হ'ল না।"

এই ত গেল বিদেশী পণ্ডিতদের উক্তি। এ সম্বন্ধে আমাদেরও অনেক অভিজ্ঞতা আছে। এ সম্বন্ধে কয়েকটী দেশী উদাহরণ দিব। কোনও এক পকেটমার জিজ্ঞাসিত হয়ে এইরূপ উক্তি করে—"মিট্টুর সঙ্গে যাচ্ছিলাম মশাই। হঠাৎ দেখলাম এক ছোকরাবাবু নেলাক্ষেপার মত পথ চলেছে। পাতলা পকেটের মধ্যে নোট্ কটা বার থেকেই দেখা যাচ্ছিল। এ কি মোদের সহ্য হয় বাবু। এই রকম একটা বুড়বাক্ শহরে ঘুরে বেড়াবে, আর আমরা চুপ করে তা দেখবো?" অপর আর একটী অপরাধীকে ধরা পড়ার পর বলতে শুনেছিলাম—"কি করব মশাই, যাচ্ছিলাম ত অন্য বরাতে (কাজে)। হঠাৎ দেখলাম বাইরের ঘরে মেঝের ওপর চেয়ারটা রাখা হয়েছে। চেয়ারের ওপর রয়েছে একটা রূপার ভাস্। রাস্তার ধারের দরজাটাও খোলা, অথচ ঘরে কেউ নেই। এ সব ছোট কাজে আমি হাত দিই না, কিন্তু আমার রাগ হ'ল। আমি ফিরে এসে চেয়ারখানা নিয়ে সরে পড়লাম। কিন্তু মশয়, আমি ত চেয়ার চোর নই, তাই দু পা এগিয়েই ধরা পড়ে যাই।" অপরাধীদের

নিষ্ঠুরবৃত্তির অন্তর্গত ক্রোধ ও হিংসার সংমিশ্রণের জন্যেই এইরূপ ঘটে থাকে বলে মনে হয়। কোনও এক ভদ্র চীনা চোর ধরা পড়ার পর এইরূপ উক্তি করে—"যাচ্ছিলাম ত ট্রামে, হঠাৎ জানি না কেন, ফুটের এই সাইকেলটা নিয়ে চম্পট দিতে ইচ্ছে হ'ল।" তদন্তে দেখা যায়, চীনা ভদ্রলোকটী একজন ধনী ব্যক্তি। অপরাধী বিশেষের এই সকল উক্তি "অপস্পৃহার" অবস্থিতি প্রমাণিত করে।

এ সম্বন্ধে অপর আর একটী দেশী উদাহরণ দেওয়া যাক। কোনও এক গ্রামের একটী বালক হঠাৎ দুর্দ্ধর্ষ অপরাধী হয়ে উঠে। গ্রামের লোকেরা তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাকে খুন করতে চায়। এই সময় কোনও এক ব্যক্তি দয়াপরবশ হয়ে তাকে গৃহে স্থান দেন। বাড়ীর যা কিছু দ্রব্য তিনি বালকটির কাছেই গচ্ছিত রাখেন। সকালে উঠে ভদ্রলোকটী জিজ্ঞাসা করেন, "কি শ্যামসুদ্দিন আজ কিছু চুরি করেছ?" মাথা চুলকে শ্যামসুদ্দিন উত্তর দেয়, "আজ্ঞে রাত্রে বাগান থেকে একটা শশা নিয়েছি।" আশ্চর্য্যের বিষয় ভদ্রলোক সেইদিনই দুপুরে তাকে পাঁচটা শশা খেতে দিয়েছিলেন। শশা কটা তখনও পর্য্যন্ত ঘরেই মজুত ছিল। ভদ্রলোকের কাছে শুনেছি, শ্যামসুদ্দিন সারারাত ধরে এঘরের জিনিস ও ঘরে এবং ওঘরের জিনিস এঘর করত। দিনের বেলায় কিন্তু তার অপস্পৃহার আবির্ভাব কখনও হয় নি। ভদ্রলোকের মতে ছেলেটীকে তিনি আশ্রয় না দিলে সে শহরের বস্তীতে আশ্রয় নিত এবং সেই সঙ্গে সভ্য সমাজের শেষ স্মৃতিটুকু ভুলে গিয়ে সে উৎকট অপরাধী বা মানব দানবে পরিণত হ'ত। এ সম্বন্ধে আরও একটী উদাহরণ দেওয়া যাক। উদাহরণটী সচরাচর লোকের নজরে পড়ে। এটা অত্যল্প অপস্পৃহার একটী উদাহরণ। নিম্নের বিবৃতিটী প্রণিধান যোগ্য।

"আমি আমার এক বন্ধুর সহিত ট্রামে যাচ্ছিলাম। কন্‌ডাক্‌টার সামনে আসতেই আমরা টিকিট কেনার জন্যে প্রস্তুত হলাম, কিন্তু কন্‌ডাক্‌টার টিকিট না দিয়ে চলে গেল। এর পর বিনা টিকিটে আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছলাম। হঠাৎ কন্‌ডাকটারকে নিকটে আসতে দেখে আমার বন্ধু আমাকে ফেলেই গাড়ীটা থামবার আগেই নেমে গেলেন। আমারও মন তাঁকে অনুসরণ করতে চাইল। কিন্তু আমি জোর করে মনটাকে ঠিক করে নি এবং আমার ও বন্ধুর উভয়ের টিকিটই কিনে নিই।"

অপস্পৃহা সম্বন্ধে কোনও একটী প্রাথমিক অপরাধী আমার নিকট এইরূপ একটী বিবৃতি দেয়।

"দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি এক জমীদার বাটীতে কাজ করতাম। একদিন কাছারী হতে একটী হাজার টাকার নোট চুরি যায়। জমীদার আমাকে সন্দেহ করে ধমকা-ধমকি করেন, কিন্তু বরখাস্ত করেন না। বস্তুতঃ আমি নোটটী চুরি করি নি। কিন্তু সেইদিন হ'তে আমার মনে অপস্পৃহা বাসা বাঁধে। এবং আমি চুরি করতে সুরু করি।"

অপরাধীদের বুদ্ধি-প্রেরণার মিথ্যা ভাষণের দিকটী ১৭১ পৃঃ আলোচিত হয়েছে। এই সম্বন্ধে আরও একটী উদাহরণ দেওয়া যাক। আসামীর প্রতি পূর্ব্বাহ্নেই সহানুভূতিশীল হ'লে কিরূপ বিপদে পড়তে হয় তা নিম্নের বিবৃতিটী হ'তে বুঝা যাবে।

"দোকান হ'তে কাপড় চুরির অপরাধে একজন সপ-লিফটারকে আমার কাছে ধরে আনা হয়। অপরাধ সম্বন্ধে বাষ্পরুদ্ধস্বরে সে এরূপ সাফাই দেয়, 'দেখুন আমি রিপণে বি, এ, পড়ি। সংসারে আমরা তিন জন, দাদা বৌদি এবং আমি। বৌদি বেথুনে থার্ড ইয়ারের ছাত্রী, রেকর্ডে তাঁর গান শুনে থাকবেন। বৌদির জন্য দোকানে শাড়ী কিনতে

এসেছিলাম। সাতখান শাড়ীর মধ্যে পছন্দসই একটাও পাই নি, তাই একটাও আমি কিনি না।' দোকানদার এতে বিরক্ত হয়ে 'বলে, "বটে, শাড়ীগুলোর পাট ভেঙ্গেচে, কিনবে না মানে?' কিছুক্ষণ বাক-বিতণ্ডার পর দোকানদার এই শাড়ীখানা হাতে গুঁজে দিয়ে আমাকে এনেছে।' আমি এই শিক্ষিত ছেলেটীর ও তার পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি-শীল হয়ে উঠি। বি, এ, পাশ করা বৌদির দেবরের এই দুর্দ্দশা আমার অবচেতন মন পছন্দ করে নি। যুবকটীর দেহে প্রহারেরও চিহ্ন ছিল। আমি তাকে হাসপাতাল পাঠাই, এবং তার হাতের হাতকড়ি খুলে দিতে বলি। এর পর পথিমধ্যে পুলিশের হেপাজত হ'তে যুবকটী ফেরার হয়। তদন্তে জানা যায় তার কাহিনীটী সর্ব্বৈব মিথ্যা, এবং সে একজন গৃহহীন পুরান দাগী চোর। সঙ্গীতজ্ঞ শিক্ষিতা কোনও বৌদি তার নেই এবং কখনও ছিলও না।"

জুয়াড়ীরা এই ধরণের মিথ্যাচরণের মধ্যে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। আত্মরক্ষার জন্যেই এরা এরূপ করে থাকে। সাধারণতঃ ঘরের মধ্যে ঢালোয়া সতরঞ্চি পেতে এরা জুয়া খেলে। আত্মরক্ষার কারণে এরা মাঝখানে একটা গ্রামোফোন এবং কিছু রেকর্ড রেখে দেয় এবং সেই সঙ্গে বিশ ত্রিশ থালি খাবারও। কিছু ফুল এবং আতরও তারা সেখানে মজুত রাখে। পুলিশের হাল্লা এসে দরজায় ধাক্কা দেওয়া মাত্র তারা জুয়া খেলার সাজ-সরঞ্জাম এবং নালের টাকা বাক্সবন্দি করে রেকর্ড বাজাতে সুরু করে। পুলিশ ঘরে ঢুকে দেখে বিশ ত্রিশ জন লোক মালা ও সিঁদুর পরে খাবার খাচ্ছে। কেউ কেউ বাক্সের উপরকার ফুলে ঢাকা গণেশ ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে বলছে, ঠাকুর—

এ ছাড়া এমন অপরাধীও আছে, যারা কিনা, দৈহিক পীড়নের হাত হ'তে মুক্তি পাবার জন্যে বিপক্ষ পক্ষীয় চোরদের ধরিয়ে দেয়

নিজের দলের লোক বলে। অর্থাৎ কিনা এক ঢিলে তারা দুই পাখী মারে।

কোনও কোনও অপরাধী আবার গোয়েন্দা সেজে পুলিশকে খবর দেয় এই বলে যে, কোনও একটী বিশেষ বাটীতে রাত্রে ডাকাতি হবে। পুলিশ সদল বলে কথিত বাটীতে পাহারায় নিযুক্ত হয়। এই ভাবে তারা পুলিশবাহিনীকে একটী বিশেষ জায়গায় আটক রেখে অন্য এক জায়গায় ডাকাতি করে আসে।

অপরাধীদের আত্মরক্ষামূলক বুদ্ধিমত্তার আরও প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে অন্য আর একটী বিবৃতি তুলে দেওয়া হ'ল।

"আড্ডাখানায় তখন ভাগ বাঁটরা চলছিল। এমন সময় পুলিশ এসে দরজায় ধাক্কা দেয়। ব্যাপার দেখে কিষণিয়া জিজ্ঞেস করে, "কেয়া সর্দ্দার, লড় যায়? উত্তরে সর্দ্দার বলে, "কেয়া ফয়দা, দশ মিনিটকে বাস্তে লড়নে—। "আনে দেও শালে লোককো—। এর পর সর্দ্দারের নির্দ্দেশে তবলা এবং করতাল ক'টা নামিয়ে এনে আমরা গান সুরু করি। পুলিশ ঘরে ঢুকে দেখে আমরা গজল গাচ্ছি "ভজ গোবিন্দনাম ভজ গোপালনাম, ইত্যাদি।"

অপরাধীদের মধ্যে বিভিন্ন রূপ অপরাধ স্পৃহা বা অপরাধ স্পৃহার অংশ বিশেষ, যথা :—কাম স্পৃহা, দ্রব্য স্পৃহা প্রভৃতির পৃথক বা একত্র অবস্থিতির প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে একটী বিশেষ বিবৃতি তুলে দিলাম।

"কর্ম্মজীবনে আমি বহু প্রকারের লোক দেখেছি, এদের কেউ কেউ জীবনে কখনও ঘুস নেয় নি। বরং তাকে তারা ঘৃণাই করে এসেছে, কিন্তু এদের স্ত্রীলোক দিয়ে ভুলানো গেছে। অন্য দিকে এমন লোকও দেখেছি যাদের নৈতিক চরিত্রের যৌন দিকটা অতিশয় উন্নত, কিন্তু অযৌনজ দিকটা একেবারে যাচ্ছেতাই :—পয়সা কড়ির ব্যাপারে তারা

নিকৃষ্ট চরিত্রের লোক। আবার এমন লোকও আমি দেখেছি যারা অর্থ এবং নারী কোনও কিছুই চায় নি, অথচ মিথ্যাভাষণ এবং পরপীড়নের দিক থেকে তাদের মানব-দানব বললেও চলে, জীবনে উন্নতি করার জন্যে তারা সব কিছুই করতে পারে।"

অপরাধ-চিকিৎসা

চিকিৎসা দ্বারা অপরাধীদের পুনরায় নিরপরাধী করা যায়, এ কথা আমি বিশ্বাস করি। অপরাধীদের শ্রেণী ও উপশ্রেণী ভেদে তাদের চিকিৎসা প্রণালীও বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে, এই কারণে চিকিৎসার পূর্ব্বে প্রথমেই প্রয়োজন, অপরাধীদের নির্ভূল শ্রেণী বিভাগ করা। সাধারণভাবে আমরা অপরাধীদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ দোষ দেখে থাকি, তাদের যথাক্রমে নৈতিক অসাড়তা, দৈহিক অসাড়তা, আদর্শহীনতা, কর্ম্মালসতা প্রভৃতি বলা হয়। আমার বিশ্বাস এই দোষগুলি দূরীভূত হ'লেই অপরাধীরা নিরাময় হতে পারে। এ ছাড়া অপরাধীরা হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগে ভুগে, জিহ্বা ও দন্তের রোগও এদের মধ্যে দেখা যায়। অনেকের কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। অনেক সময় এই সকল দৈহিক রোগের কারণে স্নায়ু দুর্ব্বল থাকে। এইসকল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের জন্যেও অনেকে কুকর্ম্মাদি করে বসে। এই কারণে, অপরাধীদের এই সকল দৈহিক রোগাদি প্রথমেই নিরাময় করা উচিত। এই সব দৈহিক রোগ দূরীভূত হলে মানসিক রোগ এমনিই দূরীভূত হতে পারে—তা দূরীভূত না হলে অবশ্য মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন আছে। কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, সভ্য জগতের ধারণা ছিল, দৈহিক পীড়নই

অপরাধীদের অন্যতম ঔষধ, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এরূপ ধারণা বর্ত্তমান শতাব্দীতে পরিত্যক্ত হয়েছে, দৈহিক পীড়ন মানুষের আত্মসম্মানেরও হানিকর, এ কথা সকলেই জানেন। আত্মসম্মান-জ্ঞান ও চক্ষুলজ্জাই মানুষকে বহুবিধ অপকর্ম্ম হতে বিরত রাখে এবং এই দুটির অভাবে মানুষ আর মানুষ থাকে না। চক্ষুলজ্জা এবং আত্মসম্মানের অভাব নৈতিক অসাড়তার অন্যতম কারণ। এই দুইটি বস্তু বা গুণকে দৈহিক পীড়ন দ্বারা বিনষ্ট করে আমরা উৎকট অপরাধীর সৃষ্টি করি মাত্র। যাদের নিজেদের আত্মসম্মান বোধ নেই, তারা অপরের আত্মসম্মানেরও মর্য্যাদা রাখে না। এসম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটী প্রণিধান যোগ্য।

"মৈনে দেখা কি গালি খাকর মেরা দোস্ত্ একদম চুপচাপ বৈঠগয়া, সাহব নে উসে ঝুটমুট গালি দিয়া থা। মৈনে কহা, ভাই আফ্শোষ মত করো। আফিস মে লোট চলো। উঁহা যা কর নীচেওয়ালে, আউর দো-চার পাব্লিককো হম লোগভী গালি দেঙ্গে। যিস্সে দিল্ভি থোড়া হল্কা হো যায়গা আওর নীঁদ ভী আয়েগী। থোড়ীদের বাদ মৈ আপনে আফিস্ মে গয়া, আউর বীশ আদমিয়োঁ কো ঝুট্মুট গালী দেকর দিল কো হল্কা কর লিয়া।"

নির্দোষ জনসাধারণকে ঝুটমুট্ গাল দেওয়াকে আমি অপরাধ মনে করি। এই বিশেষ ক্ষেত্রে উপরোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের ওপরওয়ালারাও তাদের এই অপরাধের জন্য কতকাংশে দায়ী। কারণ, অধস্তন অফিসারদের মধ্যে এই নৈতিক অসাড়তার আবির্ভাবের প্রধান কারণ তাঁদের অসদ্ব্যবহার। অপরাধীদের সূক্ষ্মবৃত্তিগুলি দুর্ব্বল এবং স্থূলবৃত্তিগুলি প্রবল থাকে, এ কথা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে—অপরাধীদের মস্তিষ্ক তথা মনের এই বিশেষ ব্যবস্থা নৈতিক অসাড়তা আনয়ন করে। বাক্-প্রয়োগ ও উপদেশাদি দ্বারা আমরা অপরাধীদের সূক্ষ্মবৃত্তিগুলিকে পুনরায়

তাদের স্থূল বৃত্তিগুলি অপেক্ষা প্রবল করে দিতে পারি। এরূপ অবস্থায় নৈতিক অসাড়তার অবসান ঘটে, ফলে অপরাধীরা পুনরায় নিরপরাধী হয়। এই বাক্-প্রয়োগের শব্দগুলি চোখা চোখা এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হওয়া দরকার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এরূপ বলা যেতে পারে—"তুমি ভাল হবে, নিশ্চয় ভাল হবে, কেন ভাল হবে না, নিশ্চয়ই তুমি ভাল হবে, তোমাকে ভাল হতেই হবে, বুঝলে। কত লোক ভাল হ'ল আর তুমি ভাল হবে না ইত্যাদি।" এইরূপে একার্থক শব্দগুলির বিভিন্নরূপ বিন্যাস দ্বারা বার বার উচ্চারণ করলে তা মনের মধ্যে স্থায়ীরূপে প্রোথিত হয়। গীত বাদ্যাদি মানুষের সূক্ষ্মবৃত্তি প্রসূত হয়ে থাকে, অপরাধীদের মন এই সকল কলাবিদ্যার প্রতি আকর্ষিত হলেও, তাদের সূক্ষ্মবৃত্তিগুলি সতেজ হয়। সূক্ষ্মবৃত্তিগুলি সতেজ হওয়া মাত্র নৈতিক অসাড়তা বিদূরিত হয় এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ মানুষ আবার নিরপরাধী মানুষ হয়। মনের সহিত দেহের চিরন্তন সম্বন্ধ, এই কারণে দৈহিক অসাড়তা বিদূরিত হ'লেও নৈতিক অসাড়তা দূর হয়। এই দৈহিক ও নৈতিক অসাড়তা ছাড়া কর্ম্মালসতা অপরাধীদের আর একটি দোষ। বহুক্ষণ স্থায়ী একটানা কাজকর্ম্ম করতে অপরাধীরা অক্ষম, এ কথা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। চিকিৎসা হিসাবে অপরাধীদের একটানা কাজ করতে বাধ্য করা উচিত কিনা, সেই কথা বিবেচ্য। আমার মতে এরূপ বাধ্যবাধকতার মধ্যে আত্মসম্মান নাই, আছে শুধু লজ্জা ও গ্লানী; মানুষ যখন এই লজ্জা ও গ্লানীর বাইরে এসে পড়ে, তখনই তাদের মধ্যে স্থান পায় নৈতিক অসাড়তা, ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ প্রাথমিক অপরাধীরা কারাগারে এসে উৎকট অপরাধীতে পরিণত হয়, এ বিষয়ে অবশ্য কুসঙ্গাদিও এদের সাহায্য করে। কারাগারের মধ্যে অভ্যাস অপরাধীদের চিকিৎসা নিম্নোক্তরূপে

করা যেতে পারে। নিম্নোক্ত ব্যবস্থাটী প্রণিধানযোগ্য। ব্যবস্থাটী ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন।

খাদ্য নিরূপণ, নিয়মিত স্নান, মেসাজ, ব্যায়াম ইত্যাদি অপরাধীদের চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। এর দ্বারা তাদের স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বিদুরিত হয় এবং মনের প্রতিরোধ শক্তির বৃদ্ধি ঘটে। এই সকল বিষয়ের সহিত এদের শিক্ষার জন্য স্কুল ও শ্রমশিল্পের কারখানারও প্রয়োজন। এই সব কারখানায় খাটিয়ে নিয়ে, এদের মাসিক বা সাপ্তাহিক পারিশ্রমিক দেওয়া উচিত। কাজকর্ম্মের জন্য পারিশ্রমিক পেলে এদের আত্মসম্মানের হানি হয় না, সেটা তারা চাকুরী মনে করে। শ্রমশিল্পের মধ্যে তারা জীবিকার সন্ধান পায় এবং একটানা কাজকর্ম্মেও অভ্যস্ত হয়, ফলে তাদের কর্ম্মালসতা দূর হয় এবং তারা সহজ মানুষ হয়ে উঠে। খেলাধূলা এবং আমোদ প্রমোদ দ্বারা এদের ভুলিয়ে রাখারও প্রয়োজন। এ ছাড়া "ভেপার বাথ" পর্য্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা জলে স্নান ও নিয়মিত ব্যায়াম, অপরাধীদের রক্ত চলাচলের সহায়ক হয়। তা চর্ম্মকোষগুলিকে সতেজ করে তাদের দৈহিক অসাড়তা বিদূরিত করে, এভাবে আমরা অপরাধীদের অন্যতম দোষ সকল, যথা—নৈতিক ও দৈহিক অসাড়তা, কর্ম্মালসতা প্রভৃতি দোষ দূর করতে পারি। এরূপ চিকিৎসার সঙ্গে সদ্ব্যবহার সৎসঙ্গ ও উপদেশাদি দ্বারা অভ্যাস-অপরাধীদের সহজেই নিরাময় করা যায়। এই সব অপরাধীরা সমাজের কাছ হতে বিসদৃশ ব্যবহার পেয়ে থাকে, ফলে তারা সভ্যসমাজ হতে দূরে চলে যায় এবং নিজেদের জন্য পৃথক একটি সমাজ তৈয়ারী করে। সদ্ব্যবহার এবং উপদেশাদি অপরাধীদের পূর্ব্বসমাজ সম্বন্ধে সচেতন করে তাদের মধ্যে অনুতাপের সৃষ্টি করে—অনুতাপের হেতু

এদের মধ্যে আত্মসম্মান ও লজ্জাবোধ ফিরিয়ে এনে এদের নিরপরাধী করে তুলে। এরূপ চিকিৎসা দ্বারা অপরাধীদের আকৃতি পর্য্যন্ত বদলে যায়, এরূপও দেখা গেছে। ডাঃ ওয়ে এলমিরাতে এই ধরণের পরীক্ষা দ্বারা সুফল পেয়েছিলেন। অভ্যাস-অপরাধীদের চিকিৎসা সম্বন্ধে বলা হল, এইবার মধ্যম অপরাধী ও উৎকট অপরাধীদের চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। এই বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের ৮৮,৮৯ পৃঃয় বিশেষরূপ আলোচিত হয়েছে। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বাড়তি অপস্পৃহা ভিন্ন প্রণালীতে নিষ্কাশিত করে অপরাধী বিশেষকে কিরূপে পুনরায় নিরপরাধী করা যায়, সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে। পুরান চোরদের ইনফরমার বানিয়ে আমি এরূপ অনেক পরীক্ষা করি। চোর ধরার কাজে যেমন কিছুটা অপস্পৃহা থাকলে ভাল হয়, তেমন এই সব কাজের মধ্যে কিছুটা আদর্শ বা সৎপ্রেরণার প্রয়োজন। এই কাজে, এক দিক দিয়ে যেমন বাড়তি অপস্পৃহার নিষ্কাশন ঘটে' অন্য দিক দিয়ে, তা সৎপ্রণালীতে প্রবাহিত হওয়ায়, কিছুটা আদর্শ ও সৎপ্রেরণাও আনয়ন করে—আদর্শ ও সৎপ্রেরণার ক্রমাবির্ভাব পরিশেষে অপস্পৃহাকে বিদূরিতও করে দেয়। এই একই কারণে যে সকল পুরান চোর ইনফরমারের কার্য্য করে, কিছুকাল পরে চৌর্য্য কার্য্যে তাদের আর মন বসে না। এই একই কারণে শোণিতাত্বক অপরাধীদের যুদ্ধে পাঠালে যুদ্ধাবসানে ফিরে এসে তারা শোণিতাত্বক কোনও অপরাধ আর করে না। বরং তাদের শান্ত শিষ্ট ভদ্রলোক দেখা যায়। সৎপ্রেরণার ক্রমাবির্ভাবই এর কারণ। এই সৎপ্রেরণা অপস্পৃহার ন্যায় অত পুরাণ নয়, মানুষ তা মধ্য পথে অভ্যাস দ্বারা লাভ করে। সৎপ্রেরণা সভ্যতার এক অন্যতম দান। সৎপ্রেরণার সহিত পুং-বীজ বা স্পার্ম্ম এবং অপস্পৃহার সহিত স্ত্রী-বীজ বা ওভাব

তুলনা করা চলে। স্ত্রী-বীজ বা ওভাব নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায়, বারে বারে বা ক্ষেপে ক্ষেপে জন্মায় এবং তা ৪৫ উর্দ্ধ বৎসর বয়স্কা নারীর মধ্যে প্রায়ই আর জন্মায় না। অপরদিকে পুং-বীজ বা স্পার্ম্ম বহুল পরিমাণে, অফুরন্ত সংখ্যায় জন্মায় এবং তা শতবর্ষীয় পুরুষদের ভিতরেও সমান ভাবে বর্ত্তিয়ে থাকে। এজন্য শক্তিহীন না হলে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত পুরুষমাত্রই প্রজননে সক্ষম থাকে। অনুরূপ ভাবে এই সৎপ্রেরণা জাত কর্ম্ম সকল মানুষ একটানা ভাবে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সমান ভাবে করে যায় বা করতে পারে, অন্যদিকে অপরাধীরা বহুদিন ত দূরের কথা বহুক্ষণ ব্যাপীও তারা কোনও অসৎকর্ম্ম করতে অক্ষম থাকে, বাড়তি অপস্পৃহা নিঃশেষিত হওয়া মাত্র তারা অপকর্ম্ম ত্যাগ করে এবং পুনরায় অপস্পৃহার সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত তারা নিশ্চেষ্ট থেকে যায়। ৪৫ বৎসর উর্দ্ধবয়স্কা নারীর যেমন প্রজনন শক্তি থাকে না, তেমনি ৫০ বৎসর উর্দ্ধবয়স্ক অপরাধীরাও আর অপরাধ করে না বা করতে পারে না। অপরদিকে ৯০ বৎসর বয়স্ক পুরুষরা যুবকদের মতই সৎ-প্রেরণা-জাত কর্ম্ম সকল সমানভাবে করে যায় বা করতে পারে। ৯০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধকেও আমরা রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তির পদে অধিষ্ঠিত দেখি, কিন্তু এই বয়সের একজনও ডাকাতের সর্দ্দারের আমরা সন্ধান পাই না। বীজ-বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেরই জানা আছে, পৃথিবীর প্রথম জীবেরা সকলেই ছিল স্ত্রী। স্ত্রী বীজের ন্যায়ই তারা গোলাকার হত, কিংবা বংশবৃদ্ধি বা প্রজননের সময় গোলকাকৃতি ধারণ করত, পরে এই স্ত্রীবীজ হতে সৃষ্ট হয় পুংবীজ। পুংবীজ স্ত্রীবীজেরই এক সূক্ষ্মরূপ বিশেষ। অনুরূপ ভাবে অপস্পৃহার সহিত অপস্পৃহার সংঘাতের ফলস্বরূপ সৃষ্ট হয় এই সব প্রেরণা, পুরুষরা যেমন নারীদের চেপে রাখতে পারে, তেমনি সৎপ্রেরণাও তার সূক্ষ্মতার

কারণে অপস্পৃহাকে দাবিয়ে রাখে। এই কারণে চিকিৎসার দ্বারা অপরাধীর মধ্যে সৎপ্রেরণার আবির্ভাব ঘটিয়ে তার দ্বারা অপস্পৃহাকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব হয়। এ বিষয়ে নিম্নের বিবৃতিটী প্রণিধান যোগ্য।

"কোনও এক বালক অপরাধীকে আমি এরূপ ভাবে নিরাময় করি। বালকটী সুবিধা পেলেই এর ওর পকেট থেকে পয়সা চুরি করত। এ বিষয়ে তাকে নিরস্ত করা অসম্ভব ছিল। আমি তাকে এই চুরির পয়সা দিয়েই কাঁচা মাল কিনিয়ে খেলনা তৈয়ারী করতে শেখাই। এ ছাড়া তার হাতে আমি প্রচুর পয়সা দিয়ে তাকে দিয়ে আমি নানারূপ জিনিষ কেনাতাম। ইচ্ছাকৃত ভাবে আমি যেখানে সেখানে পয়সা ছড়িয়ে রাখতাম, যাতে করে বালকটী সহজেই পয়সা কয়টী চুরি করতে পারে। এই বালকটীর মারফৎ আমি বহু দরিদ্র ব্যক্তিকে সাহায্যও পাঠাই। এরা সত্য সত্যই দরিদ্র কিনা তার অনুসন্ধানের ভারও আমি বালকটীর উপরই ছেড়ে দিই। তাকে চোর ধরার কাজেও নিয়োগ করি। এই ভাবে বালকটীর বাড়তী অপস্পৃহা কখনও অসৎ কখনও বা সৎপ্রণালীতে নিষ্কাশিত হতে থাকে। কাজকর্ম্মের মধ্যে তার কর্ম্মালসতারও উপশম ঘটে। দানধ্যান ও শ্রমশিল্পের কারণে তার মধ্যে আদর্শ স্থান পায়, ঔৎসুক্যেরও আবির্ভাব ঘটে। ধীরে ধীরে তার নৈতিক অসাড়তা বিদূরিত হয়, এবং সে তার বিগত দিনের অপকর্ম্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে থাকে।"

অভ্যাস, মধ্যম এবং উৎকট অপরাধীদের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হল। এইবার স্বভাব-অপরাধীদের চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। এই স্বভাব-অপরাধীদের চিকিৎসা অতি কঠিন ব্যাপার। পুরাকালে মানব-দানব বিধায় এদের মেরে ফেলার রীতিই প্রচলিত ছিল। ঔষধাদি দ্বারা এদের বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম পাড়িয়ে রাখলে সুফল পাওয়া যেতে

পারে। এদের চিকিৎসার জন্য স্নায়ুর উপর কার্য্যকরী ঔষধের প্রয়োজন। ইগ্‌নেসিয়া প্রভৃতি হোমিওপ্যাথ ঔষধাদির দ্বারা এরূপ পরীক্ষা করা চলে। এ ছাড়া এদের দেহাভ্যন্তরস্থ রস-পিণ্ড-(গ্লাণ্ড) গুলির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়ে এদের অপস্পৃহা নিম্নগামী করা যায়, এরূপ অনুমিত হয়। নারী অপরাধীরা কখনও স্বভাব-অপরাধী হয় না, এই স্থলে তারা হয় স্বভাব-বেশ্যা, এ কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। স্বভাবতঃ অপরাধী না হলেও এদের মধ্যে অনেক অভ্যাস-অপরাধী এবং অপরাধ রোগীর সন্ধান মিলে। নারী অভ্যাস-অপরাধীদের অনেকের মধ্যেই কিছুটা পুরুষালী ভাব দেখা যায়। পুরুষ হ'তে নারী এবং নারী হ'তে পুরুষ হওয়ার কাহিনী পৃথিবীতে বিরল নয়, কারণ নারী এবং পুরুষের যৌন ব্যবস্থার মূল ব্যবস্থা একই। এই কারণে নারী অপরাধীদের প্রাথমিক চিকিৎসা ঔষধাদির দ্বারাই করা উচিত। ঔষধাদির দ্বারা নারী অপরাধীদের মধ্যে নারী-সুলভ ভাব ফিরিয়ে এনে, তাদের মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে সুফল ফলবে, এরূপ আমি মনে করি।

প্রকৃত অপরাধীদের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হল, এবার অপরাধী রোগীদের চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। প্রথমেই নির্ণয় করা উচিত এদের এই রোগের মূল কারণ। এই রোগ ব্যক্তিগত কিংবা বংশগত তাও জানা দরকার। অনেক সময় বংশগত মাদকতা ও উন্মাদনাও এই রোগের সৃষ্টি করে, অনেক সময় মানসিক কারণেও ইহা উপগত হয়। মনোবিশ্লেষন, বাক-প্রয়োগ এবং ঔষধাদির দ্বারা মানসিক রোগের প্রকারভেদে, মানসিক রোগ সারান যায়। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে মানসিক রোগ সম্বন্ধে অনেক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। মনোবিশ্লেষণ দ্বারা এই সব রোগের কারণ নির্ণয় করা যায়। এই মনোবিশ্লেষণের রীতি সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটী প্রণিধান যোগ্য।

"কোনও এক যুবক মরা বা মড়ার কথা শুনলেই মার-মুখী হয়ে উঠত। চিকিৎসার জন্য যুবকটী আমার কাছে নীত হয়। এই একটী বিষয় ছাড়া অন্যবিষয়ে তাকে সহজ মানুষের মতই দেখা যায়। আমি অভিভাবকদের জিজ্ঞাসা করি, যুবকটির শিশুকালে কোনও আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটেছিল কিনা– উত্তরে তারা বলেন, না। আমি তখন যুবকটীর মনোবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হই। যুবকটিকে একটি নিরালা ঘরে বসিয়ে আমি প্রশ্ন সুরু করি। তার প্রতি আমি বাৎসল্যের ভাব দেখাই এবং আমাকে তার বড় ভাই বা পিতার ন্যায় জ্ঞান করতে বলি, আমি যে তার একজন বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী এবং আমার জ্ঞান ও ক্ষমতা আমি যে তার উপকারার্থে নিয়োগ করছি, এরূপ ভাব দেখাই। আমি তাকে জীবনের এক একটি ঘটনা সম্বন্ধে মনে করতে বলি। সে একটি বিশেষ ঘটনার কথা বলে, আমি তখন এরও পূর্ব্বের একটা ঘটনা মনে করতে বলি। যে যে ঘটনা তার জীবনের পথে স্থায়ী চিহ্ন রেখেছে তার সব কয়টীই সে বলে যেতে থাকে। এই মনে করার রীতি সম্বন্ধে আমি তাকে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে নির্দ্দেশ দিয়ে, তাকে এই ব্যাপারে আমি সাহায্যও করতে থাকি। বিগত দিনের একটীর পর একটী ঘটনার কথা স্মরণ করে মনের পথে সে পিছিয়ে আসতে থাকে এবং পরিশেষে তার এগার বৎসর বয়সের একটা ঘটনার কথা হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়। নানা আলোচনার মধ্যে আমি জেনে নিই, তার এক গ্রাম সম্পর্কীয়া বৃদ্ধা ঐ সময় তাদের বাড়ী আসেন এবং মারা যান। ছেলেটী অন্যান্য সকলের সঙ্গে শ্মশান-ঘাটে গিয়েছিল এবং শ্মশানগামী নরনারীর মধ্যে একজন নবম বর্ষীয়া বালিকাও ছিল, সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত এই বালিকাটি তার অজ্ঞাতেই তার মনের পথেই হানা দিয়ে আসছে। যৌবনপ্রাপ্তির পর এই সুপ্ত যৌনবোধ অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠে মানসিক রোগের সৃষ্টি করে।

রিপ্রেসড্ বা প্রদমিত ইচ্ছাই এর কারণ। অবচেতন মনের এই ইচ্ছা জানতে পারা মাত্র যুবকটী বহুলাংশে সুস্থ হয়ে উঠে। কয়েক মিনিট বাগ-প্রয়োগ ও কারণ নিদর্শনের পর ছেলেটী সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হয়। আমার উপদেশমত যুবকটী কথিত বালিকাটীর শ্বশুরালয়ে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে আসে। এর পর যুবকটীর মরা বা মড়া সম্বন্ধে ভীত হওয়া ত দূরের কথা মড়া পোড়াতেও তার দ্বিধা হত না।"

এরূপ মানসিক রোগীদের নিরোগ করার অন্য আর একটী পন্থা সম্বন্ধে এবার বলা যাক। নিম্নের বিবৃতিটী হতে বিষয়টী উত্তম রূপে বুঝা যাবে।

"কোনও একটি শিশু লাল মাছ দেখা মাত্র অত্যন্ত ভীত হয়ে চীৎকার করে উঠতো। আরও শিশুকালে লাল মাছ ধরতে গিয়ে সে আঘাত পেয়েছিলো, হয়তো এই জন্যেই সে এইরূপ ভয় পেতো। আমি তাকে এই মনোরোগ হতে মুক্ত করবার জন্যে সচেষ্ট হই। আমি তা না করলে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে এই ভীতির কারণটী তার অবচেতন মনে চলে যেতো এবং প্রাপ্তবয়সে এই বিস্মৃত কারণ তার মনে অহেতুক ভয়ের এবং তৎজনিত নানারূপ বিসদৃশ ব্যবহারের কারণ হয়ে থাকতো। আমি এই শিশুটীকে লম্বা টেবিলের এক মুখে বসিয়ে খেতে দিতাম এবং লাল মাছের ভাস্‌টী রাখতাম ঐ টেবিলের অপর মুখে। এর পর প্রতিদিন ঐ মাছের ভাস্ একটু একটু করে শিশুটীর দিকে এগিয়ে আনতাম, ধীরে ধীরে এবং সইয়ে সইয়ে। পরিশেষে এই ভীতির বস্তুটীই * একদিন এই শিশুটীর খাবার টেবিলের এক উপাদেয় এবং মনোরম বস্তুতে পরিণত হয়ে যায়।"

---

* শিশুদের যারা কারণে বা অকারণে ভয় দেখায় তারা তাদের শত্রুতা সাধনই করে থাকে। কারণ বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে শিশুদের এই ভয় প্রদমিত হয়ে তাদের মধ্যে নানারূপ মানসিক রোগের বা বিসদৃশ ব্যবহারের সৃষ্টি করে দেয়।

আমরা যতগুলি রোগ হতে ভুগে থাকি, তার অধিকাংশই থাকে মানসিক রোগ, কিন্তু সেটা দৈহিক রোগ বলে চালু হয়ে যাওয়ায় তা আমরা বুঝেও বুঝতে চাই না। এবং ঐ রোগের জন্য মানসিক চিকিৎসা না করে আমরা করি দৈহিক চিকিৎসা।

আমাদের অবচেতন মন যখন বলে—না, আমাদের চেতন মন তখন বলে—হাঁ। চেতন মনের দুইটী বিভিন্ন বিষয়বস্তু অনেক সময় দ্বন্দ্বরত অবস্থায়, দ্বন্দ্বের সমাধানের পূর্ব্বেই বিস্মৃতির অতলতলে ডুবে যায়। মানুষ তখন মূল বিষয়বস্তুটী ভুলে যায়, অথচ ভুলে না। প্রাণপণে সে তা মনে করতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। এই অবস্থায় আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর বদলে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর আনুসঙ্গিক অনুরূপ বা সমসাময়িক অন্য আর একটীর ঘটনা তার মনে পড়ে, কিন্তু তা তাকে সান্ত্বনা দেয় না, তা তাকে ভয় দেখায় বা দুঃখ দেয় মাত্র। এরূপ অবস্থায় নানারূপ মানসিক রোগের সৃষ্টি হতে পারে। রিপ্রেসড্ ইচ্ছা, রিপ্রেসড্ ভয় প্রভৃতিই বহুবিধ মানসিক রোগের কারণ।

এ সম্বন্ধে অন্য আর একটী উদাহরণ দেওয়া যাক। কোনও এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে, তার শোবার ঘরের উত্তর দিকটার দেওয়ালটা পড়ে গেল। তার শোবার ঘরের উত্তর দিকটার ঘর তার খুল্লতাত ব্যবহার করতেন। মনো-বিশ্লেষণের পর ভদ্রলোক স্বীকার করেন, যে তিনি তাঁর খুল্লতাতের মৃত্যু চান। অবচেতন মন হ'তে এই অন্যায় ইচ্ছা চেতন মনে এনে বাক্-প্রয়োগ বা উপদেশাদি দ্বারা তা আমরা বিদূরিত করি - ভদ্রলোকের এই সুপ্ত ইচ্ছা, এভাবে বিদূরিত না হলে হঠাৎ একদিন তা হয়ত জাগ্রত হয়ে পিতৃব্য হত্যার কারণ হত। মানসিক রোগ নানাবিধ কারণে হয়ে থাকে। দমনীত বা রিপ্রেসড্ যৌনবোধক মানসিক রোগসমূহের প্রধান কারণ, এরূপ অনেকে মনে করেন। দমনীত বা

রিপ্রেসড্ ভয় এই মানসিক রোগের অন্য আর এক কারণ। শিশু ও বালকদের মধ্যে এই রোগ বিশেষরূপে দেখা যায়। বালকদের মধ্যে কোনও রিপ্রেসড্ ভয়ের কারণ ঘটলে তা অবিলম্বে চেতন মনে ফিরিয়ে এনে, তা দূরে না ঠেলে দিয়ে, বরং তাকে নিকট হতে আরও নিকটে এনে বালকটীর নিকট ভয়ের ব্যক্তি বা বস্তুকে অতি সহজ করে তোলা উচিত। ভয়ের বিষয় বস্তুটীর অসারতা এইরূপে প্রমাণিত করে আমরা রোগীকে নিরাময় করতে পারি। দেহের অসুস্থতা অপেক্ষা মনের সুস্থতার প্রয়োজন অনেক বেশী। এই রিপ্রেসড্ ভয়, ইচ্ছা ও যৌনবোধের ন্যায় ক্রোধ, বংশগত, মাদকতা, উন্মাদনা, উত্তেজনা এবং স্নায়বিক ক্ষয় ক্ষতি প্রভৃতির কারণেও মানসিক রোগের সৃষ্টি হয়। উন্মাদনা, উত্তেজনা, ক্রোধ প্রভৃতি রোগ মানুষের সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলিকে দুর্ব্বল ও তাদের স্থূল বৃত্তিগুলিকে প্রবল করে দেয়। এরূপ অবস্থায় মানুষ নিজের অজ্ঞাতে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপরাধ করে, কিন্তু পরক্ষণেই এই অপকর্ম্মের জন্য সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে লজ্জাবোধ বা অনুতাপ থাকে না। একথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। অপরাধী রোগীদের অপকর্ম্মের মধ্যে অপস্পৃহা থাকে না, এই কারণে তাদের মধ্যে আমরা অধিক অনুতাপ ও লজ্জা দেখি।

মানুষের চিন্তারোগ অপর আর এক প্রকারের মানসিক রোগ। চিন্তা-রোগ দুই প্রকারের হয়। প্রথম ক্ষেত্রে, কোনও একটী বিশেষ চিন্তা, মানুষের অপরাপর চিন্তার উর্দ্ধে উঠে মানুষকে নিয়ত আঘাত হানে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মানুষের মন কোনও একটী বিশেষ চিন্তা অধিকক্ষণ ধরে রাখতে অক্ষম হয়, একটীর পর একটী চিন্তা মনে এসে মুহুর্মুহুঃ তাকে বিরক্ত করে। এরূপ অবস্থায় মানুষ পাগলের মত হয়ে উঠে। এই সময় সামান্য মাত্র বিরক্তির কারণ ঘটলে মানুষ অপকর্ম্ম করে

বসে। * মনোবিশ্লেষণ, বাক্-প্রয়োগ ও ঔষধাদির দ্বারা এই সকল রোগ সহজেই নিরাময় হয়।

অনেক সময় এই সব অপরাধী রোগীরা ভুলক্রমে আসল অপরাধী রূপে চালু হয়ে যায়। আমার মতে এই সব অপরাধীদের কোনও রূপ শাস্তির ব্যবস্থা না করে, বরং এদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিৎ। এই অপরাধী রোগীদের স্বরূপ জানতে হলে, কিরূপ পন্থার অনুসন্ধান করা উচিত তা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। এদেশের ন্যায় ইয়ুরোপেও অপরাধ রোগীদের জন্য কোনও রূপ পৃথক ব্যবস্থা পূর্ব্বকালে ছিল না। ইংল্যাণ্ডের কোনও এক আদালতে আসামী পক্ষ থেকে ক্রীপটোম্যানিয়ার অজুহাতে আসামীর মুক্তি প্রার্থনা করা হয়, জজ সাহেব আসামীর সওয়ালের জবাবে এইরূপ উক্তি করেন—এদের এই রোগ সারাবার জন্যেই আমাকে এখানে পাঠান হয়েছে। কিন্তু অধুনা-কালে সকল সভ্য দেশই এই সব রোগ সম্বন্ধে সচেতন।

অনেক সময় অতৃপ্ত বাসনা এবং জাগ্রত যৌনবোধও নানারূপ অপকর্ম্মের কারণ হয়। এই সম্বন্ধে একটী বিশেষ ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। বিবরণটী নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

"কলিকাতার বটতলা অঞ্চলে কোনও এক মন্দিরে ৬০ বৎসর রয়স্ক এক পুরোহিত বাস করতেন। পাড়ার বহু বালক বালিকা ওই দেবালয়ে যাতায়াত করত, কারণ পুরোহিত মশাই তাদের বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতেন। কিন্তু আজন্ম ব্রহ্মচারী সাধু-চরিত্র পুরোহিত মশাই-ই একদিন এক দশম বৎসর বয়স্কা বালিকার প্রতি পাশবিক অত্যাচার করে বসলেন। বৃদ্ধকে থানায় ধরে এনে আমি জিজ্ঞাসা করি, "এ

* এই সব চিন্তা ভুলবার উত্তেজক ঔষধরূপে অনেকে মদ খায়, বেশ্যাসক্ত হয়, পরনারী গমন করে, কেউ কেউ অপরাধও করে, কেউ আবার বুড়ো বয়সে বিবাহও করে।

কেয়া কিয়া আপ ?" "কেয়া বলে বাবু সাব," বৃদ্ধ উত্তরে বলে, "যব হাতা তব এইসাই হোতা।" বৃদ্ধ ঠক ঠক করে কাঁপতেও কাঁদতেও থাকে। অনুশোচনায় তার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছিল। বৃদ্ধ এতদিন ব্রহ্মচর্য্য পালন করে এসেছিল, কিন্তু তা সে করে আসছিল ইচ্ছার বিরুদ্ধে। বার্দ্ধক্যের দুয়ারে এসে এজন্য তার অনুতাপ আসে। কিন্তু যে যৌবন মনের দুয়ারে বার বার মাথা খুঁড়ে ফিরে গেছে তাকে সে আর ফেরাতে পারে না। হঠাৎ সে আবিষ্কার করে, আর একদিনও তার সময় নেই, তার মনে হয়, ওই দিনটাই বুঝি তার শক্তি সামর্থের শেষ দিন। অনাস্বাদিত ফলটির আস্বাদনের জন্য তার মন আকুল হয়ে উঠে, মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একবার, হাঁ হাঁ মাত্র একবার। এর পর হঠাৎ সে ক্ষেপে উঠে ক্ষমার অযোগ্য এই অপরাধটি করে বসে কিন্তু পরক্ষণেই তার জ্ঞান ফিরে আসে, কিন্তু তার সেই ক্ষণিকের ভুল সুধরোবার, সে আর কোনও পথই পায় নি, ফলে তাকে জেলে যেতে হয়।

এই সব কারণে অসাধুর ন্যায় সাধুকেও বিশ্বাস করা উচিত নয়। আমরা পরস্পর পরস্পরের অন্তর্নিহিত অপস্পৃহাকে দমন করে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে (ব্যক্তিগত বা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে) আত্মরক্ষা করি মাত্র—মানুষ, সমাজ এবং রাষ্ট্রগঠন একমাত্র এই কারণেই করে থাকে, মনের শয়তানই মানুষের সর্ব্বপ্রধান শত্রু। নিউরেটিক অবস্থায় ও ব্লাডপ্রেসার রোগের কারণেও অনেকে অপকর্ম্ম করে, যৌনস্পৃহার প্রতিরুদ্ধতার কারণেও এই সব রোগ জন্মে থাকে। এই কারণে অবিবাহিত ব্যক্তিদের উপর নির্ব্বিচারে কোনও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার দেওয়া নিরাপদ নয়। এ ছাড়া এমন অনেক ব্যক্তি আছে যারা কিনা মাত্র একটা উত্তেজনা উপভোগ এবং রোম্যান্সের কারণেই ডাকাত প্রভৃতির সর্দ্দার হয়। তারা ডাকাতি করে কেবলমাত্র এই রোম্যান্স ও

উত্তেজনা উপভোগের জন্যে, অর্থের কারণে নয়। এরূপ মনোবৃত্তিও এক প্রকার রোগ এবং এরও চিকিৎসার প্রয়োজন আছে। অন্য আর একপ্রকার অপরাধী আছে, যারা কিনা মনে করে একটি বড় অন্যায় প্রতিরোধ করবার জন্যে একটি ছোট অন্যায় করা যেতে পারে—এই ক্ষেত্রে ভুল পথে চিন্তা ধারা প্রবাহিত হওয়ার জন্যেই তারা অপরাধ করে। আমি এমন একটি অপরাধ জানি, যে কিনা বন্ধুর গচ্ছিত অর্থ খরচ করে ফেলে, এবং পরে বন্ধুকে তার গচ্ছিত অর্থ কড়ায় গণ্ডায় ফেরত দেবার অভিপ্রায়ে অন্য আর একটি অপরাধ করে বসে। এই সকল অপরাধীদের বাক্-প্রয়োগ এবং উপদেশাদির দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া উচিত, "একটী অন্যায় দিয়ে অন্য একটী অন্যায় কোনও অবস্থাতেই চাপা দেওয়া যায় না।"

অপরাধ-সমাজ

অপরাধী-সমাজ—বিশেষ করে ভারতীয় অপরাধ-সমাজ, বহু লাংশে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের অনুকরণে গঠিত। হিন্দু সমাজে যেমন স্ব স্ব কর্ম্মরীতি বা পেশা অনুযায়ী উচ্চ নীচ সম্প্রদায় নির্দ্দিষ্ট হয়, অনুরূপভাবে অপরাধী-সমাজেও অপকর্ম্মের স্বরূপ অনুযায়ী অপরাধীসকল উচ্চ বা নিম্ন শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে ডাকাত বা খুনেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান পেয়ে থাকে। অপরাধী-সমাজের ইহারা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। অপরাপর অপরাধীরা, এদের বীরত্বের জন্যে রাজার ন্যায় সন্মান করে। ফাঁসীর সময় কখনও কখনও কয়েদীদের ঘাতকদের সাহায্য করবার জন্য আহ্বান করা হয়। এমন কি যারা জহ্লাদদের সাহায্য করে তাদের

মেয়াদেরও কিছুদিন মকুব করা হয়, কিন্তু তা সত্বেও কোনও অপরাধীই এই বিষয়ে রাজী হয় না। খুনি ডাকাতদের প্রতি অপরাধীদের অবিচল ভক্তিই এর কারণ। এই খুনে এবং ডাকাতদের পরই সিঁদেল চোর বা বারগ্লাররা সম্মান পায়। এই সিঁদেল চোরদের পর সম্মান পায় যে সকল চোর রাস্তা থেকে হার প্রভৃতি ছিনিয়ে নেয়। অপরাধ-সমাজে ছিঁচকে চোর এবং ঠগীদের স্থান সবার নিম্নে। এই সকল শ্রেণীর অপরাধীই আবার যে সকল ব্যক্তি নারীর উপর তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অত্যাচার করে জেলে এসেছে তাদের অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে। বলাৎকারক বলে কাউকে জানতে পারলেই অন্যান্য অপরাধীরা তাদের প্রায় মারধোর করে থাকে। অপরাধী-সমাজে বলাৎকারকদের কোনওরূপ সম্মানজনক স্থান নেই। প্রকৃত অপরাধীদের সম্বন্ধে এ কথা বিশেষরূপে প্রযোজ্য। অপরাধী-সমাজ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটী প্রণিধানযোগ্য।

"কোনও এক ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় আমি কয়েক বৎসর জেলে থাকি। একদিন জেলের একটী উন্মুক্ত স্থানে একজন খুনে ডাকাতের সহিত আমি কথোপকথন করছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, সে ক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সেই সময় সামনে দিয়ে একজন ছিঁচকে চোর যাচ্ছিল। খুনে ডাকাতটী তার গালে বিরাশী সিক্কার একটা চড় কসিয়ে বলে উঠল—"বেটা ছিঁচকে, এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর। আমি একজন খুনে ডাকাত, বার বছর জেলে আছি, আর তুই কিনা বুক চিতিয়ে সামনে দিয়ে যাচ্ছিস্।" এই সময় একজন সিঁদেল চোর সেখানে এসে দাঁড়াল, খুনে ডাকাতটীকে নমস্কার জানিয়ে সে বলল—"দিন বেটাকে আরও ঘা কতক, ছিঁচকে বেটার বড় আস্পর্দ্ধা হ'য়েছে।" এতক্ষণে আসল বিষয়টী আমার বোধগম্য হয়, অপরাধী-সমাজে এইরূপ জাতিভেদের প্রভাব দেখে আমি সবিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হই।"

এই সম্বন্ধে অপর আর একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। কিছুকাল পূর্ব্বে কোনও একটী ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকায় কোনও এক ভদ্র যুবককে হাজতে পাঠান হয়। হাজত থেকে বেরিয়ে এসে আমার নিকট সে এইরূপ একটী বিবৃতি দেয়। বিবৃতিটী নিম্নে তুলে দেওয়া হল।

"হাজতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকগুলি পুরান চোর আমাকে ঘিরে দাঁড়ায়। তাদের সকলেরই বিশ্বাস ছিল, আমি বহু সহস্র টাকা মেরে সেখানে এসেছি। তারা অজাচিতভাবে আমাকে অনেক উপদেশ দেয়। এবং পুলিশের কাছে কোনওরূপ স্বীকারোক্তি করতে এরা আমায় মানা করে দিয়ে জেলের পথ সুগম না করার জন্য তারা আমাকে সাবধান করে দেয়। আমি জানাই যে তাদের এই সব ধারণা ভুল কিন্তু তারা তা বিশ্বাস করে না। আমি সকলের দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠি। একজন এগিয়ে এসে বলে—"থোড়া পা দাবায়গা হুজুর, আপ্ বড়ি ঘরকো লেড়কা, কয়রোজ আপ্‌কো বহুৎ তপলিক্ হোগা।" এদের মধ্যে একজন রাস্তার চোর ছিল। আলাপ করে জানতে পারি, তার কাজ হচ্ছে হার ছিনিয়ে নেওয়া। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, সে কখনও কোনও বাড়ী থেকে চুরি করেছে কিনা। উত্তরে সে বলে, "না হুজুর, ওসব বড় ছোট কাজ, ধরা পড়ে যাব আর লোকে মনে করবে, আমি ঘটি-বাটি চুরি করতে গিছলাম, এতে ঝুটমুট্ বদনাম হতে পারে। এই চোরটী চুরি করার কায়দা-কানুন সম্বন্ধে আমাকে অনেক গল্প করে-এবং সে তার গালের দুই কষির মধ্যে দুইটি বড় বড় থলি দেখায়। গালের এই থলি দুইটির মধ্যে সে নাকি সাময়িক ভাবে দ্রব্যাদি লুকিয়ে রেখে থাকে। গালের মধ্যে এই সব থলি চুণ মাখানো নুড়ীর সাহায্যে নাকি তারা নিজেরাই তৈয়ার করে। এদের কেউ কেউ নাকি আবার ছোট ছোট আনি, দুয়ানি, গিনি, গিলে ফেলে, পরদিন বাহ্যের পর বিষ্ঠা খুঁটে সেগুলি তারা বার করে নেয়।"

এই ধরণের জাতিভেদ এদেশে আমি অভ্যাস-অপরাধীদেরই মধ্যে অধিক দেখে থাকি, স্বভাব-অপরাধীরা কিন্তু এই সব জাতিভেদের ধার দিয়েও যায় না। "অপরাধ" নিয়েই অপরাধ-সমাজ তৈয়ারী। কিন্তু অপরাধী-সমাজেরও আবার অপরাধ আছে। অপরাধীদের কাছে একমাত্র অপরাধ "বিশ্বাসঘাতকতা", এই বিশ্বাসঘাতকদের তারা অত্যধিকরূপে ঘৃণা করে। বিশ্বাসঘাতকতা এদের কাছে সর্ব্বদাই বধ্য। স্বভাব-অপরাধীরা প্রায় আদিম সমাজের মত হয়ে থাকে, এইজন্য তাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসও আদিম সমাজের অনুরূপ। সকল দেশের স্বভাব-অপরাধীরা প্রায় এক প্রকারেরই হয়ে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন দেশীয় ধর্ম্ম-বিশ্বাস সেই সেই দেশীয় অভ্যাস-অপরাধীদের বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করে। এদেশের অনেক ডাকাতদলকে অপকর্ম্মের পূর্ব্বে কালীপূজা করতে দেখা গেছে। অনেক অপরাধীদের অপকর্ম্মের সফলতার জন্যে ঠাকুর দেবতার কাছে মানত করতে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেও দেখা গেছে। তাদের অন্তর্নিহিত নৈতিক অসাড়তা এবং স্বার্থপরতার জন্যেই তারা ঈশ্বরকেও তাদের অপকর্ম্মের সহিত জড়াতে দ্বিধাবোধ করে না। কারো কারো আবার ধারণা হয়, অপরাধীদের ঈশ্বর এবং নিরপরাধীদের ঈশ্বর—দু'জন আলাদা ঈশ্বর। এদেশে আবার এমন অপরাধীরও সন্ধান মিলে, যারা অপরাধ করে বটে, কিন্তু তাদের সেই অপকর্ম্মের জন্যে সর্ব্ব সময়ই তারা শাস্তির প্রতীক্ষা করে। কোনও এক অপরাধীর ধারণা হয় তাকে মিথ্যে করে জাল কেসে ফাঁসান হয়েছে, কিন্তু এজন্য তাকে কিছুমাত্র দুঃখিত বা ক্রোধান্বিত দেখা যায় না। এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে সে বলে, "দেখুন, এই কেসে আমাকে মিথ্যে জড়ান হয়েছে বটে, কিন্তু এর পূর্ব্বে এমন অনেক অপরাধ আমি করেছি, যার জন্যে আমার কোন সাজা হয় নি। যাই হোক অল্পের

সাক্ষী এদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিলেও এরা ক্রোধান্বিত হয় না এবং নির্ব্বিকারচিত্তে তাদের কাণ্ডকারখানা উপভোগ করে, কিন্তু সত্যি সাক্ষীও যদি তাদের নিকট হতে ঘুষ নিয়েও তাদের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলে, তা হ'লে এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এদের তারা শাস্তি দেয়। এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এদের নিজেদের মধ্যেও প্রায়ই খুনখারাপি হয়। এই বিশ্বাসঘাতকতা নিবারণের জন্য এরা গুপ্তচর নিযুক্ত করে। প্রকৃত অপরাধীদের কাছে কারাজীবন একটী অতি সাধারণ জীবন। এই জন্য জেল থেকে বেরিয়ে এসে অপরাধীদের পুলিশ অফিসারদের সেলাম করতেই দেখি। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবরণটী প্রণিধান যোগ্য।

"ছুটি নিয়ে মোটর বাইকে দেশে যাচ্ছিলাম। টিটাগড়ের নিকট এক জায়গায় এসে ধাক্কা খেয়ে সাইকেলটা বিগড়ে গেল। আশে-পাশে কুলি মজুরের ভিড় জমে' গেছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম পথিপার্শ্বের একটা মাংসের দোকান হ'তে মাংস কাটা ছুরি হাতে জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ বদমায়েস—গুণ্ডা নেমে আসছে। লোকটাকে বহুকষ্টে আমরা সায়েস্তা করি, জেলেও পাঠাই। শেষে ব্যতিব্যস্ত হয়ে লোকটা কলিকাতা ছাড়ে। এই বেপোট জায়গায় তাকে দেখে আমি শিউরে উঠলাম। ভাবলাম দিল বুঝি সাবড়ে। অপরাধীটী কিন্তু আমাকে দেখে সেলাম জানিয়ে বলল, "কেয়া বাবুসাহেব, আচ্ছা হ্যায়?" উত্তরে আমি বললাম, "আউর আপ্, বালবাচ্ছা!" অপরাধীটী জিজ্ঞাসা করল—"সটিনবাবু জিন্দা হ্যায়।" উত্তরে আমি বললাম, "উ ত' বদ্‌লি হো গিয়া, আপ্ চলিয়ে না আভি লোটকে।" অপরাধীটি উত্তর করল, "নেহি হুজুর আপ্‌লোক বহুত জুলুম কিয়া, হাম্ ইঁহিপরই আচ্ছা হ্যায়।" এর পর অপরাধীটী নিজেই মিস্ত্রী ডেকে এনে

মধ্য দিয়েই আমার পাপটুকু ক্ষয় হয়ে গেল। এই ধরণের অপরাধীরা সর্ব্বদাই শাস্তির আশঙ্কা করে কিন্তু তা সত্বেও সহজাত অপস্পৃহার কারণে তারা অপকর্ম্মই করে থাকে। এদের উপর দৈহিক পীড়ন করলে এরা চেঁচায় ও গালি দেয়, কিন্তু এরূপ ব্যবহার তারা করে তাদের দৈহিক পীড়নজনিত বিরক্তির জন্য, দৈহিক পীড়নের অবসান হওয়া মাত্র এরা বেশ নিশ্চিন্ত ও প্রফুল্ল হয়ে উঠে, হয়ত এরা মনে করে, এদের যা কিছু প্রায়শ্চিত্ত বাকি ছিল, তা তাদের এই দৈহিক পীড়নের উপর দিয়ে কেটে গেল। ভারতীয় প্রাথমিক অপরাধীদেরই মধ্যে এরূপ মনোবৃত্তি বিশেষরূপে দেখা যায়। বিভিন্ন অপরাধীদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মবিশ্বাস দেখা গেলেও কোনও অপরাধীদের, বিশেষ করে প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে, ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান লেশমাত্রও থাকে না,—অভ্যাস-অপরাধীদের এই ধর্ম্মবিশ্বাসও ব্যক্তিগত ব্যাপার, তার সঙ্গে গোটা অপরাধ-সমাজের কোনও সম্বন্ধ নেই। এই কারণে প্রকৃত অপরাধীদের দলগুলি দলের জন্য জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে লোক সংগ্রহ করে, এদের দলগত ধর্ম্ম বলতে, একমাত্র অপকর্ম্মকেই বুঝায়, এই দিক দিয়ে এরা এক ধর্ম্মাবলম্বী ও এক জাতি। অপরাধী-সমাজ একমাত্র বিশ্বাস-ঘাতকতাকেই অপরাধ বলে স্বীকার করে। এই বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধীদেরও অপরাধ। কোনও শান্তিরক্ষক যদি কোনও দাগী চোরকে মিথ্যে কেসে ফাঁসিয়ে জেলেও পাঠায় তা সত্বেও সে সেই শান্তিরক্ষকের প্রতি কোনওরূপ বিদ্বেষ পোষণ করে না এবং অপরাধীটী সেটা তার এক স্বাভাবিক পরিণতি মনে করে। কিন্তু সেই শান্তি-রক্ষকটী যদি তার কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে, পরে আবার তাকে পীড়ন করে তা হলে প্রকৃত অপরাধীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে তাকে গালিগালাজ করে, এমন কি তাকে সে ছুরিকাঘাত করলেও করতে পারে। কোনও

আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে, শুধু তাই নয় আমাকে পুনঃ পুনঃ আদাবও জানায়।"

এ সম্বন্ধে নিম্নের উক্তিটিও প্রণিধান যোগ্য। এম এমিলি গেন্টার সাহেব এই উক্তি করেন—"দি ক্রিমিন্যাল" পুস্তকের ১৬৮ পৃঃ দেখুন।

"পৃথিবী তাদের কাছে বারেক কারাগমন এবং বারেক বেশ্যা-সম্ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ পৃথিবীতে আসার তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য কিছুদিন বেশ্যা সম্ভোগ, মদ্যপান ও জুয়াখেলার পর কিছুদিন কারাবরণ করা, তাদের কাছে কারাবরণ একটা নিত্য নৈমিত্তিক ও সাধারণ ব্যাপার। মুক্তি বা স্বাধীনতাকে তারা তাদের ছুটির দিন মনে করে। তাই এই দিন কয়টাতে তারা উপায় করে, খায় দায় স্ফূর্তি করে। নাবিকরা যেমন তাদের আট মাসের উপার্জ্জিত অর্থ তিন দিনেই শেষ করে, সেইরূপে প্রকৃত অপরাধী মাত্রেই অর্থাগমের পরদিনই তা ব্যয় করে দেয়। এরা এদের এই ছুটির শেষ দিনটির জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে। তারা জানে তাদের ছুটির দিন কয়টি একদিন শেষ হবেই, শীঘ্রই তারা ধরা পড়ে জেলে যাবে, এইরূপ ধারণা নিয়েই তারা বাস করে।"

এইরূপ মনোবৃত্তি বিশেষ করে আমরা প্রকৃত বা উৎকট অপরাধীদেরই মধ্যে দেখে থাকি, কোনও কোনও অপরাধী জেল থেকে বার হয়ে পুনরায় অপরাধ করে, কেবলমাত্র জেলে ফিরে আসবার জন্যে। প্রাথমিক অপরাধীরা সম্ভবতঃ এইরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় দেয় না।

অপরাধীরা সমাজের মধ্যে পরগাছা সমাজ, এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। মানুষের দেহ থেকে প্রতিদিন যেমন কিছু কিছু ক্ষয়িত অংশ বার হয়ে যায়, তেমনি যুগ যুগ ধরে সভ্য সমাজের নষ্ট অংশ সমূহ সমাজ হতে বার হয়ে এসে অপরাধী-সমাজের সৃষ্টি করে। এই কারণে প্রতি বৎসরই

সভ্য সমাজ হতে কতিপয় পুরুষ এবং কতিপয় নারী বেরিয়ে এসে, যথাক্রমে চোর ও বেশ্যা হয়। সভ্য সমাজের প্রারম্ভ হ'তে আজ পর্য্যন্ত, সকল দেশের পক্ষেই এই বিশেষ সত্যটি প্রযোজ্য। দেশ বিশেষের পরিস্থিতি ও সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী, কোনও দেশে এদের সংখ্যা কম, কোনও দেশে বা এদের সংখ্যা হয় বেশী।

মধ্যযুগের কঠোর শাসন প্রকৃত অপরাধীদের প্রারম্ভেই বিনষ্ট করত। গ্রামবহুল পৃথিবীর মধ্যযুগীয় মানুষ প্রকৃত অপরাধীদের মানব-দানব মনে করত, কখন কখনও বা তারা তাদের শয়তান মনে করে নিহতও করেছে। মধ্যযুগে স্বভাব-অপরাধী মাত্রই বধ্য ছিল। অভ্যাস-অপরাধীদেরও সাধারণতঃ হাত কেটে দেওয়া হত, এই সব কারণে মানুষ সাধারণতঃ অপরাধ বিমুখ হতে বাধ্য হত। কেবলমাত্র প্রাথমিক অপরাধীরা গ্রামবাসীর চোখ এড়িয়ে কোনওরূপে অব্যাহতি পেত, এইরূপ অনুমিত হয়। এই কারণে ঐ সময় গ্রামের মধ্যে তারা বাস করতে পারে নি, আজও পারে না, বিশেষ করে এদেশে—কারণ ভারতীয় গ্রামবাসীরা নিরক্ষর হলেও শিক্ষিত, এদের নৈতিক শিক্ষার তুলনা হয় না। এই জন্য গ্রাম্য অপরাধীরা শীঘ্রই গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়। এরা গ্রামের শেষ সীমান্তে বা জঙ্গলে বাস করে, কিংবা ভ্রাম্যমান স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতিদের কলেবর বৃদ্ধি করে। বর্ত্তমান যুগে বড় বড় শহর সৃষ্টির সঙ্গে অপরাধীদের সকল অসুবিধা বিদূরিত হয়েছে। গ্রামবাসীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, এরা বড় বড় শহরে এসে আশ্রয় নেয়। শহরের বস্তী, বস্তী বাড়ী ও বেশ্যালয়গুলি ওদের একমাত্র নিরাপদ স্থান। বর্ত্তমান যুগে বড় বড় শহরগুলিকে আশ্রয় করে অপরাধী সমাজ গ'ড়ে উঠে। ক্রমবর্দ্ধমান উদ্যোগ শিল্পই এজন্য দায়ী। শহরের চণ্ডুখানা ও জুয়ার আড্ডাগুলি এদের ক্লাব ঘর, এবং বস্তি, বস্তিবাড়ী ও বেশ্যালয়গুলি এদের বাসস্থান।

শহরের এই সব আণ্ডার-ওয়ার্লড বা পাতালপুরীর সহিত শহরের সভ্য সমাজের কোন সংযোগ নেই, এজন্য গহন সুন্দর বনের ব্যাঘ্রকুলের ন্যায় অপরাধীরাও শহরের পাতালপুরি বা আণ্ডার-ওয়ার্লড সমূহে নিরাপদে বাস করে। প্রাথমিক অপরাধীরা কিন্তু পূর্ব্ব যুগের মত, আজও সভ্য মানুষের সহিতই বাস করে। এরা একদিক দিয়ে যেমন সভ্য মানুষের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে, অন্যদিক হ'তে এদের কেউ কেউ অপরাধী সমাজের সহিতও যোগাযোগ রক্ষা করে—কেউ কেউ পরিশেষে প্রকৃত অপরাধীদের পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে "আসলি শেয়ানাদের" সহিত বেমালুম মিশে যায়। সভ্য সমাজের তখন এরা কোনও ধারই ধারে না।

কলিকাতার পাতালপুরী অর্থাৎ কি'না, কলিকাতার বস্তি, বস্তি বাড়ী অগণিত বেশ্যালয়, চণ্ডুখানা ও জুয়ার আড্ডাসমূহ সম্বন্ধে এইবার কিছু বলা যাক। এই সব পাতালপুরী বা আণ্ডার-ওয়ার্লড কেবলমাত্র অপরাধীদের আশ্রয়স্থল নয়, সেগুলি অপরাধীদের জন্মস্থানও বটে। আণ্ডার-ওয়ার্লড বা পাতালপুরীতে কোনওরূপ জাত-পচ্ (কমুন্যালিজম্) বা জাত-বিচার নেই, তা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের জন্যই উন্মুক্ত থাকে। একটু বুঝিয়ে বলা যাক। সম্প্রদায় মাত্রেই বহু সৎলোক থাকে। তারা বিভিন্ন গুণের অধিকারী, স্বস্ব সম্প্রদায় স্বস্ব গুণ নিয়েই বিভোর থাকে। কিন্তু এই সব গুণের কোনওরূপ আদান প্রদান হয় না। অর্থাৎ কি'না এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের কোনও গুণ বা ধর্ম্মাচরণের ভাগী হয় না। গির্জ্জা মসজিদ প্রভৃতি সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষের জন্য খোলা নেই, কিন্তু বেশ্যালয়, চণ্ডুখানা ও জুয়ার আড্ডায় সকল সম্প্রদায়েরই অবাধগতি, পাপের পথে জাত-পচ বা জাত-বিচার নেই কিন্তু ধর্ম্মের পথে আছে। মোসলেম মেয়েরা ধর্ম্মচারণ করে পবিত্র হারেমে, হিন্দু ললনারা ধ্যান ধ্যান করে পর্দ্দার আড়ালে—এক কথায় ধর্ম্মাচরণের কার্য্য হয়

লোকচক্ষুর অন্তরালে, এ বিষয়ে কেউ কারুর খবর রাখে না। কিন্তু পাপাচরণ সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মাচরণের খবর না রাখুক, পাপের খবর রাখে। এই বিষয়ে তাদের মধ্যে বিশ্বমৈত্র দেখা যায়। বড় বড় শহরের বস্তী-জীবনই এর কারণ। গ্রামের অপরাধীরা গ্রাম হতে বিতাড়িত হয়ে প্রথমে আসে মহকুমা বা জেলার ছোট ছোট শহরগুলিতে ও শিল্পপ্রধান অঞ্চলে, এর পরে অধিকতর ওস্তাদ হয়ে এরা কলিকাতার ন্যায় বড় বড় শহরে চলে এসে কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করে। শহরের বস্তিগুলিতে বিভিন্ন জাতীয় চোর ডাকাত ঠগ ও জুয়াচোর এক সঙ্গেই বাস করে, শুধু তাই নয়, এরা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানও ঘটায়।

কলিকাতার বস্তিগুলি দুই প্রকারের হয় খোলা-বস্তী ও বস্তি-বাড়ী। কলিকাতার এক পঞ্চমাংশ লোক বাস করে এই বস্তিতে। ২০ হতে ৫০টী মাঠ-কোঠা নিয়ে তৈরী এক একটী বস্তি। এক একটা মাঠ-কোঠায় ১০ হতে ২০টী ঘর থাকে। এক একটী পরিবার বাস করে এক একটী ঘরে। বস্তিগুলিতে সর্ব্বজাতীয় নরনারীকেই এক সঙ্গে দেখা যায়। একটী ঘরে হয়ত আছে একজন বেশ্যা নারী। অথচ পাশের ঘরেই বাস করে একজন শ্রমিক ও তার ধর্ম্ম-পত্নী; এদের পাশের ঘরেই হয়ত আছে একজন পুরান চোরের রক্ষিতা, গভীর রাত্রে এদের মিলন হয়। এদের পাশের ঘরে হয়ত আছে একজন ঝি, দিনে সে ঝিগিরি করে, রাত্রে করে পেশা। এছাড়া দুই একজন সংগ্রাহিকাও এসে জুটে। অনেক সময়ে দুরবস্থায় পড়ে অনেক গৃহস্থ বধূও এখানে এসে বাস করে। এইরূপ কোনও এক গৃহস্থ বধূর বিবৃতি নিম্নে লিখে দিলাম। নিম্নের বিবৃতি দুইটী হ'তে শহরের বস্তী-জীবন কিরূপে চোর এবং বেশ্যা সৃষ্টি করে তা বুঝা যায়।

"আমার স্বামী একজন গরীব শ্রমিক, দিন আনে দিন খায়, কোনও-রূপে সংসার চলে। আমার পাশের ঘরটায় থাকত একজন কুলটা নারী। তার আয়েসী-স্বাধীন জীবন আমাকে প্রলুব্ধ করত। তার সাজগোজে আমি মুগ্ধ হই। তার কোনও কষ্টই নেই, তার চেয়ে অনেক সুন্দরী আমি, অথচ ছেঁড়া কাপড়ে দিন কাটাই, দিন রাত শুধু হেঁসেলের দারোগাগিরি করি। পাশের ঘরে একজন বুড়ী থাকত। সে প্রায়ই আমাকে প্রলুব্ধ করত, স্বামীর বিরুদ্ধে সে'ই আমাকে উত্তেজিত করে। পরে জানতে পারি বুড়ী একজন সংগ্রাহিকা—কন্যা সংগ্রহের জন্য সেখানে ডেরা বেঁধেছিল, সে আমাকে লাখপতি হবার লোভ দেখায়। পরিশ্রান্ত স্বামী গৃহে ফিরে দেখে আমি বিরক্ত ও অমনোযোগী। ক্ষেপে উঠে স্বামী আমাকে প্রহার করেন। এতে আমার বিরূপ মন আরও বিরূপ হয়। এই সুযোগে বুড়ী আমায় স্বামী ত্যাগের পরামর্শ দেয়, সে আমাকে বহু জায়গায় লুকিয়ে রাখে, শেষে এক মাড়োয়ারীর কাছে গছিয়ে দেয়। এর পর অনেক হাঙ্গাম হুজ্জুতের পর আমি স্বাধীন হই। পয়সা পেয়েছি রোগ পেয়েছি, কিন্তু সুখ পাই নি, শান্তিও না, মনে মনে আমি মৃত্যুই কামনা করি।"

এই সকল সংগ্রাহিকারা যে শুধু খোলার বস্তিতেই ডেরা বাঁধে তা নয়, তারা বস্তি-বাড়ীতেও আড্ডা গাড়ে। বস্তি-বাড়ীগুলি প্রায়ই তুই বা তিনতলা কোঠা বাড়ী। এখানেও এক একটী দরিদ্র পরিবার এক একটী কামরায় বাস করে– অন্যান্য বহু অজ্ঞাতকুলশীল পরিবারের সহিত তারা এক 'কল' চৌবাচ্চা ও পাইখানা ব্যবহার করে। সংগ্রাহিকারা এইমত বস্তি-বাড়ীর বধূদের ধীরে ধীরে লোভী করে তুলে এবং স্বামীর প্রতি বিরূপ করে দেয়। এর পর কোনও এক ব্যক্তি দ্বারা আদালতে দরখাস্ত করিয়ে শুভাকাঙ্ক্ষিণীটী হাকিমকে জানায়, মেয়েটীর উপর অকথ্য

অত্যাচার হচ্ছে। মেয়েটীর উদ্ধারের জন্য আবেদন জানান হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট কানুনমত পরোয়ানা জারী করেন। পুলিশ মেয়েটীকে উদ্ধার (?) করে আদালতে আনে। অনেক সময় সংগ্রাহিকার লোকই বধূর জামীন হয়। কোর্টে হাজির হওয়ার দিন পর্য্যন্ত সে কুশিক্ষাই পায় এবং তোতা পাখীর মত বয়ান মুখস্ত করে। সাধারণতঃ মেয়েরা যার হেপাজতে থাকে, তারই গ্রামোফোন হয়ে উঠে, মনের মত লোক পেলে ত কথাই নেই ;— আদালতে যা হবার তাই হয়, আদালতে বধূটী অনেক কাল্পনিক অত্যাচারের কথা বলে—আদালত শুদ্ধ লোকের চোখে জল আসে। কিছুক্ষণ পরে হাকিম রায় দেন, "মেয়ে সাবালিকা, যেখানে ইচ্ছা সে যেতে পারে।" অচিরে চোখের জল মুছে হাসতে হাসতে বধূটী বেরিয়ে আসে, কিন্তু ঘরে ফেরে না।

শহরের এই বস্তি ও বস্তি-বাড়ীগুলি যেমন বেশ্যা স্বষ্টি করে, তেমনি অপরাধীও তৈয়ারী করে, একথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। এ সম্বন্ধে কথিত শ্রমিকটীর একটী বিবৃতি নিম্নে তুলে দিলাম। এই বিবৃতিটী হতে আরও একটী বিশেষ সত্য প্রতীত হয়। সত্যটী সম্বন্ধে এইরূপ বলা যেতে পারে—নারী সব সময়ই নারী এবং তাদের যা ভাল তা তারা কোনও অবস্থাতেই হারায় না।"

"একদিন বাটী ফিরে দেখলাম স্ত্রী নেই। পাশের ঘরের পুরান চোরটা ঠাট্টা করে জানাল—"পাখী পাইলে গেছে।" পরিশ্রান্ত আমি, মাটিতে বসে পড়লাম। কাজকর্ম্মে স্পৃহা হারালাম, মদ খেতে শিখলাম, কিস্তিওয়ালার কাছে টাকা ধার করলাম। টাকা শোধা অসম্ভব। শেষে চুরিও করলাম। চোখের সামনে দেখি স্ত্রী আমার রাজরাণী, ট্যাক্সি করে ঘুরে বেড়ায়, আমি অনাহারে মরি, তাই চুরি করি, বেশ্যাসক্ত হই। একদিন নেশার মাথার স্ত্রীর ঘরেই ঢুকে পড়ি। চিন্তে পারিনি তাকে,

হঠাৎ শুনি স্ত্রীলোকটি বলছে,—এতদূর অধঃপাতে গেছ, কিন্তু এতে যে অকল্যাণ হবে, বরং নাও দশটা টাকা, অন্য কারো ঘরে যাও। চলে যাও এখান থেকে, পাপের উপর আর পাপ আমার বাড়িও না। চেয়ে দেখি আমারই স্ত্রী। আফিং খাই, কিন্তু মরি না, পরিশেষে চোরদের সঙ্গে ভিড়ে চোর হই। এখন আর আমার কোনও দুঃখই নেই, লজ্জা ভয়, আমার সব কিছুই আজ দূর হয়েছে।”

অপরাধীদের সহিত বেশ্যাদের সম্বন্ধ চিরন্তন ও শাশ্বত যুগের—এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদগুলিতে বিশদরূপে আলোচিত হয়েছে। বেশ্যা ভিন্ন প্রকৃত অপরাধীদের একদিনও চলে না। অভ্যাস-অপরাধীরা সাধারণতঃ অভ্যাস-বেশ্যার সহিত এবং স্বভাব-অপরাধীরা সাধারণতঃ স্বভাব-বেশ্যার সহিত মিলিত হয়। স্বভাব-বেশ্যাদের স্বভাব প্রায়ই স্বভাব-অপরাধীদেরই অনুরূপ হয়। এদের উভয়ের মধ্যে নৈতিক এবং দৈহিক অসাড়তা অত্যধিকরূপে পরিদৃষ্ট হয়। এই স্বভাব বেশ্যারা—নিম্নশ্রেণীর বেশ্যা, এবং এরা পঙ্কিল ও জঘন্য বস্তীগুলিতে বাস করে, এদের দেহে অপরাধীদের ন্যায় উল্কিচিত্রও দেখা যায়। অপর দিকে অভ্যাস-বেশ্যারা সাধারণতঃ কোঠা-বাড়ীতে বাস করে। কোনও অপরাধীকে স্বভাব-অপরাধীরূপে জানা থাকলে, শান্তিরক্ষকদের উচিত তার খোঁজ করা, এই সব খোলার বেশ্যা-বস্তিতে। অপরদিকে অভ্যাস-অপরাধীরূপে কাউকে জানা থাকলে তার সন্ধান করা উচিত কোঠা-বাড়ীর বেশ্যাদের মধ্যে। এইরূপ অনুসন্ধানের জন্য গভীর রাত্রে এবং নিরালা দুপুরের সময়ই প্রশস্ত। একজন অপরাধী কি প্রকৃতির অপরাধী তা তার দেহের উল্কি-চিত্র হতেও জানা যায়। উল্কিচিত্র-ধারণ অপরাধী সমাজের এক প্রিয় বস্তু। সৈন্য এবং আদিম মানুষের ন্যায় অপরাধীরাও উল্কি ভালবাসে। সৈন্যগণ সাধারণতঃ প্রিয়ার নাম, ফুল, নিশান, জাহাজের

নঙ্গর প্রভৃতি উল্কির দ্বারা চিত্রিত করে। এই সব উল্কিচিত্রের মধ্যে কিছুটা আদর্শ ও সভ্যতার চিহ্ন দেখা যায়, কিন্তু অপরাধীদের দ্বারা চিত্রিত উল্কিচিত্রের মধ্যে কোনওরূপ আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় না, কিন্তু নৈতিক অসাড়তার সন্ধান পাওয়া যায়। অপরাধীরা সাধারণতঃ সাপ, ব্যাঙ, নারিকেল গাছ, রক্ষিতার নাম ইত্যাদি ধারণ করে। সক্রিয় অপরাধীরা এই সব চিত্র বক্ষ, হস্ত প্রভৃতি দেহের মুক্ত স্থানে ধারণ করে, বোধ হয় এতদ্দ্বারা এরা ভীষণাকৃতি হতে চায়। নিষ্ক্রিয় অপরাধীরা এই সব উল্কিচিত্র উরু, পৃষ্ঠ প্রভৃতি দেহের গোপন স্থানে সাধারণতঃ ধারণ করে, আত্মগোপনের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় এরা এইরূপ করে। অপরাধী এবং সৈনিকদের উল্কিচিত্র বিভিন্ন রূপেরই হয়ে থাকে। কোনও এক সৈনিকের হস্তে আমি এইরূপ একটী উল্কিচিত্র দেখি। হাতের উপরি অংশে একটী অশ্বের মুখ দেখা যায়, এই মুণ্ডের নিম্নেই একটী মদের গ্লাস এবং তার নিম্নে একটী নারীর মুখ আঁকা দেখা যায়। এই নারীর মুখের নিম্নে আঁকা ছিল একটী চৌকা ঘর এবং ঘরের মধ্যে লেখা ছিল—MAN'S RUIN. এই ধরণের উল্কিচিত্র আদর্শ ও সভ্যতার পরিচায়ক।

অপরাধীদের উল্কিচিত্র সম্বন্ধে বলা হল, এইবার তাদের চালচলন ব্যবহার ও সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যাক। সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় এই দুই প্রকার অপরাধী সম্বন্ধে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। সক্রিয় অপরাধীরা সাধারণতঃ ডিঙ্গি দিয়ে চলে, নিষ্ক্রিয় অপরাধীরা পায়ের চেটো মাটির উপর চেপে চলে। সক্রিয় শোণিতাত্মক অপরাধীদের চোখের পাতা অস্থির থাকে, তা মুহুর্মুহুঃ উঠানামা করে, নিষ্ক্রিয় অপরাধীদের চোখের পাতা প্রায়ই স্থির থাকে। নিষ্ক্রিয় অপরাধীরা কিছুটা ভীরু প্রকৃতির হয়ে থাকে, কিন্তু সক্রিয় অপরাধীরা অতীব সাহসী, নিষ্ঠুর ও পেশীবহুল হয়ে থাকে। নৈতিক ও দৈহিক অসাড়তা, কর্ম্মালসতা

অদূরদর্শিতা প্রভৃতি দোষ স্বভাব-অপরাধীদের মধ্যে যত অধিক থাকে, তত অধিক অভ্যাস-অপরাধীদের মধ্যে এই সব দোষ থাকে না। অপরাধীদের এই আকৃতি ও স্বভাব হতে অপরাধীদের শ্রেণী বিভাগ নির্ণয় করা সহজ। স্বভাব অপরাধীরা সাধারণ ভাবে অভ্যাস-অপরাধীদেরও এড়িয়ে চলে, কিন্তু অভ্যাস-অপরাধীরা বুদ্ধিমত্তায় শ্রেষ্ঠ বিধায় তাদের প্রায়ই আয়ত্তে এনে দলের কাজে লাগায়। এই ধরণের মিশ্র দলের নেতৃত্বের ভার কিন্তু একজন অভ্যাস-অপরাধীই নিয়ে থাকে। সাধারণতঃ নিষ্ক্রিয় অপরাধীদের এবং সক্রিয় অপরাধীদের দল পৃথক হয়ে থাকে। স্বভাব, মধ্যম এবং অভ্যাস-অপরাধীদের মধ্যে মিলন ঘটলেও সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় অপরাধীদের মধ্যে মিলন ঘটে না। এই কারণে সক্রিয় স্বভাব-অপরাধীরা মাত্র সক্রিয় অভ্যাস-অপরাধীদের সহিত মেশে এবং নিষ্ক্রিয় অভ্যাস-অপরাধীরা মেশে নিষ্ক্রিয় স্বভাব-অপরাধীদের সঙ্গে।

এই সব অপরাধীদের প্রতি সভ্য মানুষদেরও কিছুটা দুর্ব্বলতা থাকে—মুখে যে যা'ই বলুক, এই বিশেষ দুর্ব্বলতা প্রত্যেক সভ্য মানুষের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়। কোনও বন্দিকৃত খুনে ডাকাতের আগমন সম্বন্ধে জ্ঞাত হলে মানুষ মাত্রই বিশেষ উত্তেজনা অনুভব করে এবং তাকে দেখবার জন্য রাস্তায় রাস্তায় ভীড় করে। সভ্য মানুষের এইরূপ ব্যবহার প্রখ্যাত অপরাধীদের প্রতি তাদের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধারই পরিচায়ক। মানুষের অন্তর্নিহিত অপস্পৃহাই এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। সংবাদপত্রে কোনও দুর্দ্ধর্ষ অপরাধীর কাহিনী প্রকাশিত হ'লে প্রায়ই দেখা যায়, শহরের বহু বালক সেই অপরাধীর আদর্শ অনুযায়ী অপরাধী হতে প্রয়াস পেয়েছে। মধ্যযুগে ইয়ুরোপীয়দেশে খুনে ডাকাতদের নগরের প্রকাশ্য স্থানে বধ করা হ'ত। সেই সময় বহু নরনারী বধ্যমঞ্চের চারিপাশে ভিড় করে স্ব স্ব রুমাল অপরাধীর রক্তে রঞ্জিত করে নিত। তাদের বিশ্বাস ছিল, এই সব রক্ত-

রঞ্জিত রুমাল মঙ্গলকর দ্রব্য। এদেশেও অনেকে এই বিশ্বাসে চোরের বালা সংগ্রহ করে। তবে এই সব বিশ্বাসের মধ্যে কোনও হেতু নেই। প্রখ্যাত বা অখ্যাত যে কোনও অপরাধীই হোক না কেন, তাদের নিয়ে মাতামাতি করার কোনও অর্থ হয় না। অপরাধীদের মধ্যে কোনও রূপ প্রতিভার সন্ধান করা নিরর্থক, তারা নিছক রোগী ছাড়া আর কিছুই নয়।

অপরাধী সমাজকে আমরা দুই প্রকার বিভাগ দ্বারা বিভক্ত করে থাকি, যথা—(১) লম্বালম্বীভাবে, অর্থাৎ কি'না স্বভাব-অপরাধী, অভ্যাস-অপরাধী, মধ্যম-অপরাধী (২) এবং আড়াআড়িভাবে, * অর্থাৎ কিনা, প্রকৃত অপরাধী, এবং প্রাথমিক অপরাধী। এ ছাড়া প্রকৃত ও প্রাথমিক অপরাধীদের মাঝামাঝি কোনও অপরাধী দল থাকলেও থাকতে পারে। অপরাধীদের লম্বালম্বি বিভাগের অনেকগুলি উপবিভাগ স্থিরীকৃত হয়েছে, যথা, সক্রিয়, নিষ্প্রিয়, শোণিতাত্মক, সাম্পত্তিক ইত্যাদি। কিন্তু তাদের আড়াআড়ী বিভাগের কোনও উপবিভাগ আজও পর্য্যন্ত আমি নির্দ্ধারিত করি নি। আমার মতে প্রাথমিক অপরাধীরা বহু প্রকারের হয়ে থাকে, বিভিন্নরূপ যৌনবোধের সহিত এদের অপস্পৃহার তুলনা করা চলে। এদের কেউ কেউ ব্যক্তি বা সঙ্ঘ বিশেষের বিরুদ্ধে অপকর্ম্ম করে না। এদের কেউ কেউ একজনের অকৃত্রিম বন্ধু থাকে, অপরজনের পক্ষে হয় ত সেই একই ব্যক্তি হয় শত্রু। এদের কারো কারো মধ্যে জাতপচ্ বা সাম্প্রদায়িকতা দেখা যায়। প্রকৃত অপরাধীরা দাঙ্গাহাঙ্গামার সুযোগে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে লুটপাট করে। কিন্তু প্রাথমিক অপরাধীরা এইরূপ

---

* অভ্যাস-অপরাধী সম্বন্ধে ইহা বিশেষরূপে প্রয়োজ্য। যথা, প্রকৃত অভ্যাস-অপরাধী, প্রাথমিক অভ্যাস-অপরাধী, ইত্যাদি।

করে না, বরং এই সময় স্ব স্ব সম্প্রদায়ের ধন সম্পত্তি এরা রক্ষাই করে থাকে। কোনও, কোনও প্রাথমিক অপরাধীরা বরাবরই প্রাথমিক অপরাধী থেকে যায়। ভদ্র ঠগীদের সম্বন্ধে এই কথা বিশেষরূপে বলা চলে। কোনও কোনও প্রাথমিক অপরাধীরা আবার অভ্যাসগত ভাবে প্রকৃত অপরাধী হয়ে উঠে, এই সময়ে এদের মধ্যে স্নায়বিক পরিবর্ত্তনও ঘটে। প্রকৃত অপরাধীদের বন্য হিংস্র পশুর ন্যায় দূরে পরিহার করে গৃহস্থেরা আত্মরক্ষা করতে পারে, কারণ প্রকৃত অপরাধীদের চিনে নিতে কারো অসুবিধা হয় না। কিন্তু প্রাথমিক অপরাধীরা নিরপরাধী মানুষের পরিচ্ছদে, সমাজের মধ্যে বর্ণচোরা আমের ন্যায় বাস করে, এবং তাদের প্রকৃত স্বরূপ চিনে নেওয়া শক্ত হয়, এই কারণে প্রকৃত অপরাধীদের অপেক্ষা তারা সমাজের অধিকতর ক্ষতি করতে সক্ষম হয়। প্রাথমিক অপরাধীদের অধিকাংশকেই আমরা ঠগীরূপে দেখে থাকি, কাকেও কাকেও চুরি-চামারিও করতে দেখা যায়, কিন্তু বড় বড় দুঃসাহসিক চৌর্য্যাদিতে তারা সাধারণতঃ লিপ্ত থাকে না।

অপরাধী সমাজের সহিত বেশ্যা এবং ভিখারী সমাজের নিকট. সম্বন্ধ সম্পর্কে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। অপরাধী সমাজের সহিত বেশ্যা, ভিখারী ও হিজিড়া বা নপুংসক সমাজ অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত, এই কারণে অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেরই এদের সমাজগুলির সহিত বিশেষরূপে পরিচিত থাকা উচিত। অপরাধী সমাজের সম্বন্ধে বলা হয়েছে এইবার এই বেশ্যা, নপুংসক এবং ভিখারী সমাজ সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। অপরাধীদের সহিত এই বেশ্যাদের সম্বন্ধ চিরন্তন এবং শাশ্বত যুগের, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। উত্তর কোলকাতার প্রখ্যাত কোনও এক খুনে গুণ্ডা বেশ্যাদের সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি করত—"ওদের ওপর কোনও অত্যাচার করিস নি। পৃথিবীতে ওরাই আমাদের একমাত্র বন্ধু।

পুলিশের দল কুকুরের মত যখন আমাদের পল্লী হতে পল্লীতে খেদিয়ে নিয়ে বেড়ায় তখন মাত্র ওরাই আমাদের সাহায্য করে, ওরা আমাদের আশ্রয় দেয়, আহার্য্য ও পানীয় দেয়, আর দেয় একজন সাময়িক পত্নী।" বেশ্যাগণও সমাজবদ্ধ অবস্থায় বাস করে। উচ্চশ্রেণীর অভ্যাস-বেশ্যাদের সম্বন্ধে ইহা বিশেষরূপে বলা চলে। কেবলমাত্র স্বভাব-বেশ্যাগণই ইতস্ততঃ একক জীবনযাপন করে এবং সমাজের কোনও ধার তারা ধারে না। এই অভ্যাস-বেশ্যাগণ কলিকাতার সোনাগাছি, রূপাগাছি (রাম-বাগান), সিমলা ষ্ট্রীট্, ধুবুড়ীবাগান, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট্ প্রভৃতি স্থানে, চিৎপুর রোডের কোনও কোনও অঞ্চলে এবং হাওড়ার ঘোড়াডাঙ্গায় বাস করে। এক একটী দ্বিতল বা ত্রিতল বাটীর একটী বা দুইটী ঘর নিয়ে এক একজন বেশ্যা নারী বসবাস করে। এক একটি বাড়ী এক একজন বাড়ীওয়ালীর অধীনে থাকে। এই সব বেশ্যা নারীরা তাদের স্ব স্ব বাড়ীওয়ালীর কর্তৃত্ব স্বীকার করে এবং প্রায়শঃই তার নির্দ্দেশ মত তারা কাজ করে। এই সব বাড়ীওয়ালী স্ব স্ব বাটীর প্রাথমিক শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী থাকে। নিঃসহায় রূপজীবিনীদের দুর্দ্দান্ত মাতাল বা দুর্ব্বৃত্তদের হাত হতে রক্ষা করবার জন্য এই সব বাড়ীওয়ালীরা সব সময়ই প্রস্তুত থাকে, এজন্য এরা অনেক সময় এক শ্রেণীর গুণ্ডাদের মাসিক মাহিনায় নিযুক্ত করে। এই সব গৃহস্থ গুণ্ডারা বেশ্যাপাড়ার সন্নিকটেই সপরিবারে বাস করে, প্রয়োজন মত বাড়ীওয়ালী চাকর পাঠিয়ে তাদের ডাকিয়ে এনে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের বহিষ্কৃত করে দেয়। মধ্য কলিকাতার নিম্ন-শ্রেণীর বেশ্যা বাড়ীগুলির সমাজ ব্যবস্থা অনুরূপ হয়ে থাকে। এইখানে এক একটী বাড়ীর জন্য এক একটী পুরুষ ব্রথেল কিপার থাকে। এরা একাধারে বাড়ীওয়ালী এবং তাদের নিযুক্ত গৃহস্থ গুণ্ডারূপে কার্য্য করে থাকে। মাতালের হুঙ্কার ও বীভৎস চীৎকার প্রায়ই বাড়ীওয়ালীদের

নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায়, থেকে থেকে তাদের ত্রিতলের কামরা হতে জিজ্ঞেস করতে শুনা যায়—"আর পারি না, বাবা! উজীর ঘরে বুঝি? যাব না'কি লা!" দ্বিতল বা নিম্নতল হতে উত্তর আসে—"না মাসী, ও কিছু নয়, তুমি ঘুমোও" ইত্যাদি। বেশ্যা সমাজে তিন প্রকারের বেশ্যা দেখা যায়, যথা (১) বাঁধা, অর্থাৎ কিনা একজনের মাত্র রক্ষিতা। এরা প্রায়ই স্বামী-স্ত্রীর মতই বাস করে। (২) টাইমের, অর্থাৎ কিনা যারা একজন, দুইজন বা তিনজন মাত্র উপপতি রাখে। একজন হয়ত আসে সোম ও মঙ্গলবার, অপর জন হয়ত আসে বুধ ও বৃহস্পতিবার এবং তৃতীয়জন হয়ত এইরূপ নিয়মে আসে শুক্র ও শনিবার। এরা যাকে তাকে বা অপরিচিত ব্যক্তিদের আমল দেয় না।* (৩) ছুটা, এরা নির্ব্বিচারে যখন তখন এবং যাকে তাকে কক্ষে স্থান দেয়। এই তৃতীয় শ্রেণীর নারীদের কেহ কেহ রাস্তায় বা গবাক্ষ পথে দাঁড়িয়ে বাবুদের জন্য অপেক্ষা করে, কেহ আবার ১ম এবং ২য় শ্রেণীর বেশ্যাদের ন্যায় আপন আপন কক্ষে অপেক্ষা করে। এই বাড়ীওয়ালী, পেশাদার গুণ্ডা এবং উক্তরূপ তিন প্রকারের বেশ্যা নারী ছাড়া আরও চার বা পাঁচ প্রকারের জীব বেশ্যা-পাড়ায় বাস করে। যথা—(১) গুর্গা বা কাহার, অর্থাৎ কি'না যারা চাকরের কাজ করে। এরা প্রয়োজন মত বাবুদের পান সিগারেট যোগায়, ফাইফরমাজ খাটে, এবং অন্য সময় মনিবিনীর গৃহকর্ম্ম করে। (২) দালাল, অর্থাৎ কি'না যারা পর্দ্দানশীন

* একজন টাইমের বাবুর আগমন এবং অপরজনের প্রত্যাগমনের সময় আমরা এক নাটকীয় দৃশ্য দেখে থাকি। এই সময় একজন অপরজনকে তাম্বুল বিতরণ ক'রে সেকহ্যাণ্ড করে; দ্বিতীয় বাবুটী প্রথম বাবুর নিকট বিদায় নেয়। দৃশ্যটী অনেকটা চার্জ্জ-টেকিঙ এবং চার্জ্জ গিভিঙএর মত দেখা যায়। এই ধরণের নৈতিক অসাডতার সহিত ভিখারীদের নৈতিক অসাড়তার তুলনা করা চলে।

মেয়েদের জন্য বাবু সংগ্রহ করে আনে। (৩) বেশ্যাদের পুরুষ আত্মীয় বা ভাইবর্গ, যারা কি'না এদের দ্বারা প্রতিপালিত হয়, উপপতির আগমনে এরা অন্তরালে অপেক্ষা করে। (৪) পীরিতের বাবু, অর্থাৎ কি'না যারা রাত্রি বারটার্ পর বেশ্যাদের আপন প্রয়োজনে তাদের ঘরে রাত্রি যাপন করে। বেশ্যাগণ বেশ্যা হলেও তারা নারী, এই কারণে সময় সময় তারাও কাউকে কাউকে ভালবেসে ফেলে, ভালবাসার লোকদের তারা এই ভাবে পূষে থাকে। (৫) ছোট ছোট মেয়ে, অর্থাৎ যাদের কি'না এরা ক্রয় করে বা সংগ্রহ ক'রে পুষে থাকে। পুলিশের ভয়ে এরা এই সব মেয়েদের গৃহহীন পুরান চোর বা কোন এক নির্ব্বোধ ব্যক্তির সহিত নামে মাত্র বিবাহ দেয়। আসলে কিন্তু এদের দ্বারা ছোটবেলা থেকেই এরা বেশ্যাবৃত্তি করায়। নির্ব্বিকার যৌন মিলনের ফলে কৈশোর বয়সেই এদের নারীত্বের অবসান ঘটে—এই অবস্থায় এরা চির বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধ বয়সে অন্নসংস্থানের জন্যই বেশ্যারা এই সব কন্যা পালন করে থাকে। উক্তরূপ সকল শ্রেণীর ব্যক্তিদেরই বাড়ীওয়ালীর কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করতে হয়। দুপুরবেলা এই সব বাড়ীওয়ালীদের পঞ্চায়েৎ বসে, এমন কি তারা বেশ্যানারীদের অপকার্য্যের জন্য জরিমানা প্রভৃতিও করে থাকে, বড় বড় অপরাধে অপরাধী হলে তাদের পাড়া থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। একজনের বাবু অপর জন ভাঙিয়ে নিলে, বেশ্যা সমাজে সেটা অপরাধরূপে স্বীকৃত হয়, এরূপ অপরাধের জন্য বাড়ীওয়ালী-পঞ্চায়েৎ বেশ্যানারীদের শাস্তি বিধান করে থাকে। এই বাড়ীওয়ালীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একজনকে সমাজপতিরূপেও স্বীকার করবার পদ্ধতি কোনও কোনও স্থানে প্রচলিত আছে। কোনও বেশ্যানারী মৃত হলে এই বাড়ীওয়ালীরা চাঁদা তুলে, অপরাপর নারীদের সাহায্যে শব শ্মশানে এনে সৎকার করে থাকে, চাঁদা তুলে এদের

দান ধ্যান, বারোয়ারী পূজা আদিও করতে দেখা যায়। অপরিণত বয়স্ক বালকদের গৃহে স্থান দেওয়া বেশ্যানারীদের অপর আর এক অপরাধ, এজন্যেও এদের শাস্তি পেতে হয়।

এই বিশেষ সমাজ ব্যবস্থা মাত্র অভ্যাস ও মধ্যম বেশ্যাদের মধ্যেই দেখা যায়। স্বভাব-বেশ্যারা সমাজ বা ধর্ম্মাধর্ম্মের কোনও ধারই ধারে না। সাধারণতঃ এরা আবর্জ্জনাপূর্ণ খোলার বস্তীগুলিতে বাস করে এবং অপরাধীদের দ্বারা প্রতিপালিত হয়। অর্গিস বা হুল্লোড় স্বভাব-বেশ্যাদের এক প্রিয় বস্তু, অপর দিকে অভ্যাস-বেশ্যারা একে ভয় এবং ঘৃণা করে। অভ্যাস-বেশ্যাদের নৈতিক অসাড়তা স্বভাব-বেশ্যাদের তুলনায় অনেক কম, এই কারণে হুল্লোড় ত দূরের কথা, এরা একের অধিক পুরুষকে রাত্রে গৃহে স্থান দিতেও নারাজ থাকে, এদের মধ্যে লজ্জা সরমও দেখা যায়।

আর্গিস বা হুল্লোড় শব্দটি পূর্ব্ব পরিচ্ছেদগুলিতে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু কোনও স্থানেই এর প্রকৃত ব্যাখ্যা করা হয় নি। নিম্নের বিবরণটী হতে এর স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুটা বুঝা যাবে।

"ধরুন নীচু ছাউনিওয়ালা অপরিসর একটি ঘর। বস্তিগ্রামের মধ্যকার এই বস্তিবাটীটির ঘরগুলি দিনে খালিই থাকে, কিন্তু গভীর রাত্রে এখানে পুরান চোরদের আড্ডা বসে। অপরিসর গলির পথ দিয়ে মানুষ এখানে যাতায়াত করে। অপরিসর অন্ধকার গলির পথ—দিনের বেলাও সেখান দিয়ে লোকে লম্ফ নিয়ে যাতায়াত করে। দুজন লোকের পক্ষেও পাশাপাশি পথ চলা অসম্ভব। ভাঙা জানালার নীচে একটা কলসী, কয়েকটী তাড়ীর ভাঁড় ও গোটাদুই কেরোসিনের ডিবিয়া, এ ছাড়া কয়েকটী, দেশী ও বিলাতী মদের বোতলও। এখানে ওখানে দুই একটা ছেঁড়া মাদুর ও চেটাই দেখা যায়। মাটীর দেওয়ালে পাঁকাটীর পেরেকের

সাহায্যে টাঙান কয়েকটী সিনেমা নটীর ছবি। এই কাগজে আঁকা মূর্ত্তিগুলির উপরও দেখা যায় দংশন ও নখের দাগ। গভীর রাত্রে এইখানে সুরু হয় পুরান চোরদের হুল্লোড়। ১০ বা ২০ জন বিভিন্ন বয়সের নর-নারীর সে এক বীভৎস তাণ্ডব। ৪৫ বৎসরের মাতার সহিত ১৭ বৎসরের কন্যাকেও সেখানে দেখা যায় একত্রে। মত্ত অবস্থায় হয়ত কোনও এক নারী তার পুং রাক্ষসের মাথায় বসিয়ে দিল একটা তবলা, পুং রাক্ষসটী প্রত্যুত্তরে তার মাথায় দিল বোতলের এক বাড়ী। গণ্ড দিয়ে হয়ত ব'য়ে পড়ল রক্ত। কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, জিহ্বা দিয়ে রক্তটুকু চেটে নিয়ে সে সোহাগভরে তার আততায়ীকেই জড়িয়ে ধরে। অপর এক পুরুষ হয়ত অপর আর একটি নারীর ঘাড় দিল কামড়ে, প্রত্যুত্তরে নারীটী হয়ত তার চোখের মধ্যে আঙুল পুরে দিল। এদিকে মসীবর্ণা এক রাক্ষসী তার রাক্ষসের মুখে ধাঁই করে একটা লাথি মারল। হয়ত তার একটা দাঁত ভেঙে পড়তে লাগল রক্ত, কিন্তু তা সত্বেও আহত ব্যক্তিটী কাপড় দিয়ে রক্ত মুছে তার আততায়িনীকেই আদর করে কাছে টেনে নিল। অর্দ্ধনগ্ন নরনারীর এই গড়াগড়ি কামড়াকামড়ি ও খিমচা-খিমচির কোনও বর্ণনার সৎ-সাহিত্যে স্থান নেই, কদর্য্যতার ও বীভৎসতার কারণে অধিক বর্ণনা সম্ভবও নয়। এইখানে নারীরা নর-রাক্ষসদের অত্যাচার উৎপীড়ন ও নিষ্পেষণ সহ্য করে বাধ্য হয়ে নয়, ইচ্ছা করে। দৈহিক অসাড়তার কারণে প্রতিটী খিমচানি ও দংশন হতে এরা পায় অভূতপূর্ব্ব আনন্দ। এই সময় এদের দেখলে মনে হয় এরা বীভৎস মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথিবীতে যদি কোথাও নরক থাকে ত তা এইখানেই, এইখানেই, এইখানেই।

সাধারণতঃ সক্রিয় প্রকৃত অপরাধীদেরই এইখানে অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। এই হুল্লোড় স্থানের ন্যায় শহরের চণ্ডুখানাও অপরাধীদের

একটা প্রিয় স্থান। সাধারণতঃ নিষ্ক্রিয় অপরাধীদের এবং কোনও কোনও সক্রিয় অপরাধীদের এইখানে দেখা যায়। ছেঁড়া চেটাইএর উপর শুয়ে ছেঁড়া বালিশে মাথা রেখে এদের কেউ কেউ চোখ বুজে সন্ধ্যা, সকাল ও বৈকালে চণ্ডুর পাইপ টানে, কেউ কেউ আবার রাত্রের দিকে হল্লোড়ে যোগদান করে। এইভাবে এদের পাপার্জ্জিত সমুদয় অর্থ ব্যয়িত হয়ে শেষ হলে এরা অপকর্ম্মের উদ্দেশ্যে পুনরায় রাস্তায় বেরোয়, পুরানো চোরদের এই রীতি। শেষ কপর্দ্দকটী ব্যয়িত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কিন্তু এরা এই ভাবেই জীবন কাটায়।"

এই বেশ্যাগণ সমাজের সমুদয় বিষ গলধঃকরণ করে সমাজকে পবিত্র ও অক্ষত রাখতে সাহায্য করে থাকে। পুরাকালে এটা একটা সম্মানজনক পেশা ছিল। নগরে এদের প্রয়োজন হতো ধনি ব্যক্তিদের মনের রঞ্জন করবার জন্য, নৃত্যগীতাদি দ্বারা। যুদ্ধ এবং রাজকার্য্যের ফাঁকে ফাঁকে এরা পূর্ব্বকালে সেনানায়ক এবং রাষ্ট্র-ধুরন্ধরদের মন এবং দেহকে সতেজ রাখতে সাহায্য করে দেশের তথা সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করেছে। সমাজের মধ্যে এরাই এই সময় আদব কেতা-দুরস্ত থাকত, এজন্য আদব কায়দা বা এটিকেট্ শিক্ষা দিবার জন্য অভিভাবকগণ নিজেরাই পুত্রাদিদের সঙ্গে করে এই সকল বেশ্যালয়-গুলিতে বেড়াতে এসেছেন। নগর এবং গ্রামের সীমান্তে এই সকল রূপজীবিনীগণ বসবাস করত। এদের প্রধানতম কাজ ছিল নৃত্য-গীতাদি দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করা, দেহ দান করা নয়। এরা ছিল সে যুগের রূপশিল্পের পূজারী, এই জন্য এরা সম্মানও পেয়েছে প্রভূতরূপে। আজ-কালকার বেশ্যাগণ সম্বন্ধে কিন্তু এই কথা বলা চলে না। আজ-কালকার বেশ্যালয়গুলির সহিত বরং নরকেরই তুলনা করা চলে।

বস্তুতঃ পক্ষে শিল্পের পূজারীদের কখনও মৃত্যু ঘটে না। এমন কি আজ-কালকার বেশ্যানারীগণের মধ্যেও যারা শিল্পের পূজারী হ'তে পেরেছেন, তাঁরা তাঁদের ঘৃণিত জীবন সত্ত্বেও লেখক সমাজে সম্মানিতই হয়েছেন, কিন্তু সাধারণ বেশ্যালয়গুলি সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে না। এদের এখানে এসে মানুষ ভদ্রতা শেখে না। তারা এদের কাছ হতে শেখে অশ্লীলতা। কিন্তু তা সত্বেও এদেশের কোনও কোনও দূরাঞ্চলের এমন এক একটী মূর্খ সম্প্রদায় আছে যাদের ছেলেপুলেরা হাটবারের দিনে হাটের বেশ্যালয়ে এসে আজও পর্য্যন্ত পূর্ব্বপুরুষদের অনুকরণে কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত করে গিয়ে থাকে।

অপরাধী এবং বেশ্যা সমাজের কথা বলা হল, এইবার ভিখারী সমাজের কথা বলা যাক। ভিখারী দুইপ্রকারের হয় ; যথা, অভাবগত ও পেশাগত। এই পেশাগত ভিখারীদের নিয়েই ভিখারী সমাজ গঠিত হয়েছে। বড় বড় শহর এবং তীর্থস্থানগুলি এদের ভরণপোষণ করে। ভিখারী থেকে হঠাৎ অপরাধী হয়ে উঠার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। ভিক্ষা না পে'লে, এদের কাউকে কাউকে গালিগালাজ করতে, এমন কি বল প্রকাশ করতেও দেখা গেছে। এই ভিখারী সমাজের স্থান, অপরাধী এবং নিরপরাধী সমাজের মধ্যস্থলে। এরা অপরাধীদের ন্যায়ই কর্ম্মালস হয়ে থাকে। আমরা যেমন একক ভিখারী দেখে থাকি, তেমনি সমাজ-বদ্ধ ভিখারীও দেখে থাকি। এদের দলপতি থাকে। দলপতির অধীনস্থ ভিখারীরা সন্ধ্যার পর স্ব স্ব উপার্জ্জিত অর্থ দলপতির নিকট জমা দেয়, দলপতি ঐ অর্থ অধীনস্থ ভিখারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়, অবশ্য তা থেকে একটা বড় ভাগ সে নিজের জন্য সরিয়ে রাখে—আমি এরূপ একটী দলপতিকে জানতাম। সারাদিন তাকে পায়ে পুরু ন্যাকড়া জড়িয়ে ছিন্নবাসে ভিখারীদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা যেত, কিন্তু সন্ধ্যার

পরই সে তার রক্ষিতার গৃহে ফিরে দামী "সোপের" সাহায্যে পরিষ্কার হয়ে, সিল্কের পাঞ্জাবী পরে, পাখার তলায় রাত্রি যাপন করত, এমন কি তার সিনেমা দেখারও সখ ছিল। কলিকাতার স্থানে স্থানে এরূপ ভিখারী বস্তির অভাব নেই। অনেকে আবার সপরিবারে শহরের ফুটপাতের উপর বসবাস করে। শহরে অপরাধীদের অনেকে রাত্রে এদের মধ্যে শুয়ে থেকে পুলিশের নজর এড়ায়। এমন অনেক ভিখারী আছে যারা কি'না এ বিষয়ে এদের সাহায্যও করে থাকে। পূর্ব্বে এরা ছেলেপুলে চুরি করে এনে তাদের বিকলাঙ্গ করে ব্যবসায় লাগত, এমন কি এই সব ছেলেদের ছোট ছোট মানুষটানা গাড়ী করে, জায়গায় জায়গায় বসিয়ে রাখা হত। সুখের বিষয় এই প্রথা বর্ত্তমান শতাব্দীতে বিলীন হয়েছে। সর্দ্দাররা এই সব ভিখারীদের ভিক্ষার এলাকা পর্য্যন্ত ভাগ করে দেয়, এদের ঝগড়াঝাঁটীও এরা মিটিয়ে দিয়ে থাকে। চোরেরা প্রায়ই এই বেশ্যা এবং ভিখারীদের মধ্যে আত্মগোপন করে, এই জন্য এই ভিখারী এবং বেশ্যাসমাজ সম্বন্ধে শান্তিরক্ষকদের অবহিত হওয়া উচিত। এমন বেশ্যাও আছে যাদের ঘরে কোনও এক দুর্দ্দান্ত গুণ্ডা বা ডাকাত এলে তারা গর্ব্ব অনুভব করে, শুধু তাই নয়, সে এজন্য অন্যান্য নারীর ঈর্ষারও কারণ হয়। ভিখারী সমাজেরও কোনও ব্যক্তি, বড় চোর বা গুণ্ডা হলে ভিখারী সমাজও তাকে সম্মান দিয়ে থাকে।

এই বেশ্যা এবং ভিখারী সমাজ সম্বন্ধে বলা হল। এইবার হিজ্ড়া বা নপুংসক সমাজ সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। নপুংসক বা হিজড়ারাও দলবদ্ধ ভাবে বাস করে। মধ্য কলিকাতায় এদের নিজস্ব বস্তি আছে। কোনও কোনও স্থানে এরা এককও বাস করে। দৈহিক দুর্ব্বলতার কারণে এদের অনেকেরই একজন করে পুরুষ রক্ষক থাকে। অনেকে স্বামী-স্ত্রীর মতই বাস করে। পুরানো চোরদের এদের রক্ষকরূপে

দেখা গেছে। ইহা অপরাধীদের বিকৃত যৌনবোধের পরিচায়ক। অনেক অলস প্রকৃতি নিরপরাধী ব্যক্তিদেরও এদের রক্ষকরূপে দেখা যায়। এই হিজড়া সমাজ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

কোনও কোনও পূর্ব্বকালীন অপরাধীদল তপ্ত শলাকা কিংবা উল্কি আদির সাহায্যে দলের প্রত্যেক ব্যক্তির দেহে একপ্রকার চিহ্ন অঙ্কিত করে দিতো। দলে ভর্ত্তি হবার পর দলপতি নিজ হাতে এই কার্য্য সমাধা করতো। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দলের লোকদের দল-ত্যাগের কার্য্য হতে বিরত করা। ঐ সকল চিহ্ন হতে দলত্যাগীকে ঐ ভীষণ ডাকাত দলের একজন সদস্যরূপে জনসাধারণ সহজেই চিনে নিয়ে পাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে, এই ভয়ে দলের লোকেরা কখনও দল ত্যাগ করতে সাহসী হতো না।



১নং



২নং

কোনও স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতি আছে যারা পুরুষদের দেহে কোনও বিশেষ প্রকার দল বা জাতিবাচক চিহ্ন ধারণ করে না, কিন্তু তাদের মেয়েরা তা ধারণ করে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দারোয়ালী কামীস নামক স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতির কথা বলা যেতে পারে। তারা তাদের নাকের বামাংশে ১ম চিহ্নের অনুযায়ী এবং তাদের প্রত্যেকটী চোখের কোণে ২য় চিহ্নের অনুযায়ী জাতিবাচক চিহ্ন ধারণ করে থাকে।

অপরাধীরা কোনও নূতন লোক অপরাধী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলে অত্যন্তরূপ খুসী হয়ে উঠে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরা ট্যাঁক থেকে পয়সা খরচ করে নানারূপে এজন্য তাদের আপ্যায়িতও করেছে। নিম্নের বিবৃতিটী থেকে বিষয়টী সম্যক্‌রূপে বুঝা যাবে।

"কোনও এক ব্যাপারে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করে কয়েকদিন হাজতে রাখে। এই সময় ঐ হাজতে বহু সাধারণ অপরাধীরাও উপস্থিত ছিল। আমার সুন্দর ভদ্রজনোচিত দেহাবয়বের দিকে তারা কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখে। এরপর এদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "কেয়া বাবুসাব্, আপ্ শুন্‌তা লাখ রূপেয়া মার চুকা। ছিপাকে রাখনে শেখা তো? হাম্‌লোক বহুৎ খুসী হুয়া।" এবং তারপর তারা আমার পা দুটো তাদের কোলের উপর রেখে আমার সেবা করতে সুরু করে বলে উঠে, "কেয়া বাবুসাব্ তেনি পা' আপ্‌কো দাবায় ?"

এই অপরাধীরা নিজেদের দুই শ্রেণীর অপরাধীতে বিভক্ত করে থাকে, যথা,—সাধু চোর এবং অসাধু চোর। এই অসাধু চোরদের তারা বাটপাড় নামে অভিহিত করে থাকে। "চোরের উপর বাটপাড়ী" বাক্যটী এদেশের একটী প্রাচীন প্রাবাদ বাক্য। অর্থাৎ কি'না যারা চোরেদের নিকট হ'তে চোরাই জিনিস চুরি করে বা নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করে তাদেরই তারা অসাধু চোর বলে থাকে। নিজ ভাষায় তারা তাদের লোচ্চা বা নচ্ছার এবং বাটপাড় নামে অভিহিত করে।

বংশানুক্রম

বংশানুক্রম বা হেরিডিটি অপরাধ-বিজ্ঞানের একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। পুত্র পিতার সম্পত্তির ন্যায় গুণেরও অধিকারী হয় কি'না, ইহা সঠিকরূপে আজও নির্ণীত হয় নি—এরূপ ধারণা আজও কেউ কেউ পোষণ করেন। ইয়ুরোপীয় "এ্যারিষ্টল্" সাহিত্যে এই সম্বন্ধে

একটী বিশেষ উক্তি আছে। কোনও এক পুত্র তার পিতার চুলে ধরে দরজার চৌকাঠ পর্য্যন্ত টেনে আনলে পিতা তার এই সুপুত্রটীকে সম্বোধন করে না'কি বলে উঠেন, "হয়েছে, হয়েছে, আর নয়, আমি আমার পিতাকে মাত্র এই পর্য্যন্তই টেনে এনেছিলাম।" সাধারণ ভাবে দেখা গেছে, সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য বংশগত হয় না। কামারদের ডান হাত অতি ব্যবহারের কারণে স্থূলতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তার পুত্রের ডান হাত জন্মের পর ঐরূপ দেখা যায় না। অপর দিকে পিতা বা মাতার গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল হলে পুত্রবিশেষের গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল হয়। এর কারণ কর্ম্মকারের হস্তের এই স্থূলতা দেহকোষে সন্নিবেশিত থাকে, বীজকোষের সহিত তার কোনও সম্বন্ধ নেই, অপর দিকে গাত্রবর্ণের কারণ বীজকোষের মধ্যে নিহিত। এই দেহকোষ এবং বীজকোষ সম্বন্ধে পুস্তকের পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিশদরূপে আলোচিত হয়েছে। এই স্থলে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমার মতে মানুষের কোনও দৈহিক বা মানসিক দোষ বা গুণ যদি কোনওরূপে বীজ-কোষে সন্নিবেশিত হতে পারে, তা হলে তা অন্ততঃ কয়েক পুরুষ পর্যন্ত বংশগত হতে সক্ষম হয়। তবে এই সব দোষ বা গুণ বংশগত হলেও তা বিপরীত পরিবেশ এবং সাধুসঙ্গ প্রভৃতি কারণে, সব সময় জাগ্রত বা অত্যুগ্র না হলেও হতে পারে, এরূপ আমি মনে করি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা বংশগত হলেও তা ত সুপ্তরূপেই থেকে থাকে এবং অনুকুল অবস্থায় না পড়লে তা জাগ্রত হয় না। এই সব দোষ বা গুণ বংশপরম্পরায় "বিপরীত গুণ বা দোষ সম্পন্ন" মাতা এবং পিতার মিলনের ফলে ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে এসে, কয়েকপুরুষ বাদে তা একেবারে অন্তর্হিত হ'লেও হতে পারে। লোহিত মৎস্যাদি লইয়া এরূপ বহু পরীক্ষা করা হয়েছে। একটী বৃহৎ কাঁচের পাত্রে লাল মাছ রেখে, পাত্রের তলায় নীল আলো রেখে দেখা

গেছে তার গাত্রবর্ণ নীল হয়ে গেছে। এই বিশেষ স্থলে মাছ তার চক্ষু দ্বারা এই নীল রঙ শোষণ করে দেহের স্নায়ুমণ্ডলীকে প্রভাবান্বিত করায় এরূপ হয়। লাল মাছের বদলে পাত্রে নীল মাছ রেখে, পাত্রের তলায় লাল আলো রেখে দেখা গেছে মাছের রঙ হয়ে গেছে লাল। এই মাছের একটী চোখে সাদা আলোক এবং অপর চোখে কালো আলোক নিক্ষেপ করে দেখা গেছে মৎস্যের রঙ ধূসর বর্ণের হয়েছে। কয়েকটী পুং ও স্ত্রী লাল মাছকে কয়েক পুরুষ এইভাবে নীল রঙের মধ্যে রাখলে পরিশেষে নীল আলোক না থাকলেও তারা নীল রঙের বাচ্চা পাড়বে, এরূপ আমি মনে করি। "টেলিগনি" এই মতবাদের অপর আর একটী প্রমাণ। কুকুর নিয়ে এরূপ অনেক পরীক্ষা করা হয়েছে। কুক্কুরী যদি কোনও এক কুকুরের সহিত সহবাস করে পরে অপর আর এক কুকুরের সহিত সহবাস করে তা হলে দ্বিতীয় কুকুরের ঔরসজাত সন্তান প্রায়শঃ প্রথমোক্ত কুকুরের মত দেখতে হয়। এই বিশেষ সত্যটী মনুষ্য সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, এরূপ অনেকে মনে করেন। মনসা বা চিন্তার কারণে, কিংবা প্রথম স্বামীর পুং বীজের দ্বারা, স্ত্রী-জীবের বীজকোষ বা বীজাধার প্রভাবান্বিত হলে তবেই এরূপ সম্ভব হয়, এরূপ মনে করা যেতে পারে। কোনও ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে, দয়িতার সহিত যৌন মিলন হয় নাই, অথচ নারী-বিশেষের সন্তান তার সেই দয়িতার মতই দেখতে হয়েছে—স্বামীর মত হয় নি। এই সকল ঘটনা যদি সত্য হয়, তা হ'লে মেনে নিতে হবে, যে একমাত্র মন ও স্নায়ু দ্বারাই জীব-কোষকে প্রভাবান্বিত করা যায়। এই কারণে কেবলমাত্র স্নায়বিক রোগ সকলকেই আমরা বংশগত হতে দেখি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাগলের বংশের কথা বলা যেতে পারে। নির্ব্বোধ বা পাগলের বংশধরদের আমরা প্রায়ই পাগল ও নির্ব্বোধ হতে দেখি। পাগলের ন্যায় অপরাধীর অপস্পৃহাও স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হয়, এই

কারণে আমরা অপরাধী পরিবারও দেখে থাকি। কিন্তু একজন অপরাধীর বা পাগলের সব কয়টী পুত্রই পাগল বা অপরাধী হয় না—কারণ সকল সময় পাগলের সহিত পাগলিনীর এবং অপরাধীর সহিত অপরাধিনীর যৌন মিলন ঘটে না। এ ছাড়া এই প্রকারের দম্পতি সমূহের নীরোগ ও নিরপরাধী পূর্ব্বপুরুষদেরও প্রভাব তাদের সন্ততির উপর কতক পরিমাণে বর্ত্তিয়ে থাকে। এই কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা এই সব পাগল বা অপরাধীদের সন্ততিদের পাগল বা অপরাধীরূপে জন্মাতে দেখি না, কিন্তু তাদের কেউ কেউ অপরাধমুখী হয়ে জন্মিয়ে থাকে, এবং অনুকূল অবস্থায়, অত্যল্পকালের মধ্যেই তারা অপরাধী হয়ে উঠে। এই সকল কারণে পাগল এবং অপরাধীদের বংশবৃদ্ধি সমাজের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। মানুষের মাদকতা রোগ বিশেষরূপে বংশগত হয়। এই মাদকতা পুরুষানুক্রমে হলে ত আর রক্ষাই নাই। এরূপ অবস্থায় পিতা বা মাতার মাদকতা অপরাধী-মুখী সন্তানের জন্মের কারণ হয়—অনুসন্ধান দ্বারা এইরূপ দেখা গেছে।* তবে এই সব উন্মাদ্ ও অপরাধ-মুখী ব্যক্তির সহিত নিরপরাধ ও সহজ মানুষের মিলনের ফলে, দুই এক পুরুষ বাদে তাদের বংশধরগণ পূর্ব্বোক্ত কারণে আর উন্মাদ বা অপরাধ-মুখা থাকে না, এরূপও অনুমান করা যেতে পারে।

সাধারণভাবে দেখা গেছে একজন অপরাধী ব্যক্তির সহিত একজন নিরপরাধী ব্যক্তির যৌন মিলনে তাদের কতকগুলি সন্ততি হয় অপরাধী বা অপরাধ-মুখী এবং কতকগুলি নিরপরাধী থাকে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইয়ুরোপের রবার্ট পরিবারের কথা বলা যেতে পারে।

---

* অ্যালকহলিজ্‌ম্ বা মাদক দোষ, স্বল্প মাত্রায় পান দোষের কারণে ঘটে না। অত্যধিক ও অমানুষিক মদ্যপানের ফলে এইরূপ ঘটে থাকে। এ সম্বন্ধে কেহ যেন ভুল না বুঝেন।

এই পরিবারের বাপ ছিল অপরাধী, কিন্তু মা নিরপরাধী ছিলেন। এই পরিবারের বড় মেয়েটি বেশ্যা এবং কয়েকটী পুত্র অপরাধী হয়, কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র দুইটী এবং মাতা নিরপরাধী থাকে। শেষের পুত্র দুইটী অপরাধ-মুখী না থাকায় পিতা শত চেষ্টাতেও তাদের অপরাধী করে তুলতে অক্ষম হয়। ১৮৪৫ সালের নভেম্বর মাসে এই পরিবারের তিন ব্যক্তি অ্যাসাইজ আদালত কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই দেশেও এই ধরণের অনেক অপরাধী পরিবারের সন্ধান পাওয়া গেছে। মাতা এবং পিতা উভয়েই অপরাধী, শুধু তাই নয়, উহাদের পুত্র ও কন্যাগণও পরস্পর পরস্পরের সহিত যৌন মিলন দ্বারা সন্তান সন্ততি সৃষ্টি করেছে এইরূপ পরিবারের সংখ্যা অতীব বিরল। আমেরিকার যুকেশ পরিবার এইরূপ পরিবারের একটী জীবন্ত উদাহরণ। এই বংশের সন্তান সন্ততিগণ পাঁচ পুরুষ ধরে কেবলমাত্র অপরাধ ও বেশ্যাবৃত্তিই করে এসেছে। পাঁচ-পুরুষে এদের সংখ্যা হয়েছিল স্ত্রী পুরুষে ৭০৯, দুই একজন ছাড়া এদের সকলেই ছিল অপরাধী বা বেশ্যা। আমেরিকার জনসন্ পরিবার অপরাধ পরিবারের অপর আর একটী দৃষ্টান্ত। তিন পুরুষব্যাপি এদের অপরাধ বা বেশ্যাবৃত্তি করতে দেখা গেছে। এই সব পরিবারের সন্তান-সন্ততিগণ জন্ম হতেই অপরাধী বা বেশ্যা ছিল, কিংবা তারা অপরাধ-মুখী হয়ে জন্মে অনুকূল অবস্থায় অপরাধীতে পরিণত হয়েছে—এই সম্বন্ধে কোনওরূপ অনুসন্ধান হয়েছিল কিনা তা অবশ্য জানা নেই।

অপস্পৃহা কিংবা তার অংশ বা রূপ বিশেষ—দ্রব্য বা শোণিত স্পৃহা কিংবা উভয় স্পৃহাই মানুষ মাত্রের মধ্যেই সুপ্ত বা জাগ্রত অবস্থায় বিরাজ করে এবং এই স্পৃহাদ্বয় বাহির হতে সংগৃহীত বা আগত হয় না, একথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। বহু যুগ পূর্ব্ব হতেই এই স্পৃহাদ্বয় মানুষের বীজ-

কোষে স্থান পেয়েছে। নিরপরাধ মানুষের মধ্যে এই স্পৃহাদ্বয় থাকে সুপ্ত এবং অপরাধী মানুষের মধ্যে তারা থাকে জাগ্রত। এই উভয় প্রকার মানুষের যৌন-মিলন ঘটলে তাদের কতকগুলি সন্ততি হয় জাগ্রত-স্পৃহাসম্পন্ন বা অপরাধী কিংবা অপরাধ-মুখী এবং কতকগুলি সন্ততি হয় সুপ্ত-স্পৃহাসম্পন্ন বা নিরপরাধী। উপরের অপরাধী-পরিবারের কাহিনী-গুলিতে এরূপ যৌন-মিলনের কথাই বলা হয়েছে। আদিম যুগে কতকগুলি জীব আঘাত হেনে খাদ্য সংগ্রহ করত, শুধু তাই নয় তারা রক্তপানেই অধিক অভ্যস্ত ছিল, তাদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও ভীরু প্রকৃতির ছিল, তারা অপরের নিহত জীব-দেহ বা খাদ্য-সামগ্রী চুরী করে আহার সংগ্রহ করত, নারীও এরা সংগ্রহ করত গোপনে ও ভাব করে। এই সকল জীবের পূর্ব্বপুরুষ আদিম মানুষদের মধ্যেও এরূপ দুই শ্রেণীর ব্যক্তি দেখা যেত। পরে নির্ব্বিকার যৌন-মিলনের ফলে তারা একীভূত হয়ে যায়। আজিকার অপরাধী সমাজেও এরূপ ব্যবস্থা কতকাংশে দৃষ্ট হয়। সক্রিয় অপরাধীদের আমরা অতিমাত্রায় সাহসী ও পেশীবহুল দেখি এবং নিষ্ক্রিয় * অপরাধীদের দেখি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও ভীরু প্রকৃতির। অন্তঃস্বভাবের জন্যই তারা এরূপ হইয়া থাকে। এই সবকারণ একই অপস্পৃহার অংশ বা রূপ বিশেষ,—এই দ্রব্য ও শোণিত-স্পৃহা মানুষ মাত্রের মধ্যেই সুপ্ত বা জাগ্রত রূপে বিরাজ করে কি'না তা ভেবে দেখা দরকার। কারণ যা'ই হোক না কেন, অপস্পৃহার এই অংশ বা রূপ দুইটী একত্রে বা পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেক নিরপরাধী মানুষের মধ্যেই সুপ্তভাবে অবস্থান করে। যে মানুষটীর মধ্যে তার একটী বা অপরটী বা

* এই সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়—অপরাধীদের মাঝামাঝি আরও একপ্রকার অপরাধী থাকলেও থাকতে পারে।

আমরা তাদের উপরের তালিকানুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করে থাকি।* এই অপরাধ-বিভাগের সাহায্যে অপরাধী বিশেষ কি প্রকারের অপরাধ করবে তা বলে দেওয়া যায়। কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত শোণিতাত্মক বা সাম্পত্তিক বা শোণিত সাম্পত্তিক স্পৃহার সাহায্যে কিরূপে বা কি উপায়ে তারা তা সমাধিত করবে তা নির্ভর করে তাদের কার্য্য-পদ্ধতি বা মোডাসঅপারেণ্ডির উপর, একথা ১১৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে। এই কার্য্য-পদ্ধতির সহিত মনস্তত্ত্বের সম্পর্ক অত্যল্প। কোনও অপরাধী বিশেষ এক কার্য্য-পদ্ধতির সাহায্যে যদি একবার সফলতা অর্জ্জন করে তা হলে তারা সেই বিশেষ কার্য্য-পদ্ধতিটীকেই আঁকড়ে ধরে থাকে। অপরাধীদের উদ্ভাবনী শক্তি ও ঔৎসুক্যের অভাব, তাদের সংস্কার ও দলগত শিক্ষাও এজন্য দায়ী, এরূপ আমি মনে করি। কোনও কোনও দলপতি অপরাধের পদ্ধতি ও সময়ের পরিবর্ত্তন না করার জন্যে সাকরেতদের প্রথম হতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে নেয় এরূপ শোনা গেছে, এ সম্বন্ধে বোম্বে ক্রিমিন্যাল ট্রাইব নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

বংশানুক্রম সম্বন্ধে উপরের মন্তব্যগুলিই যে ধ্রুব সত্য এরূপ আমি দাবী করি না, বরং এই বংশানুক্রম সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে এরূপ আমি মনে করি। এমন কয়েকটী ভারতীয় অপরাধী পরিবারকে আমি জানি, তাদের একটী পরিবারের পিতা মাতা এবং তিন পুত্রই অপরাধী এবং দুই কন্যা বেশ্যাবৃত্তি করে। কলিকাতার গৌরিয়া পরিবার ইহার একটী অন্যতম দৃষ্টান্ত।

---

* যে খুন করে সে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সিঁদ কাটলেও কাটতে পারে, কারণ উভয়ই সক্রিয় অপরাধ। কিন্তু যে খুন করে বা সিঁদ কাটে সে কখনও পকেট কাটা প্রভৃতি সহজ বা সরল চুরি করে না, কারণ পকেটমার এবং সরল চোরেরা নিষ্ক্রিয় অপরাধী।

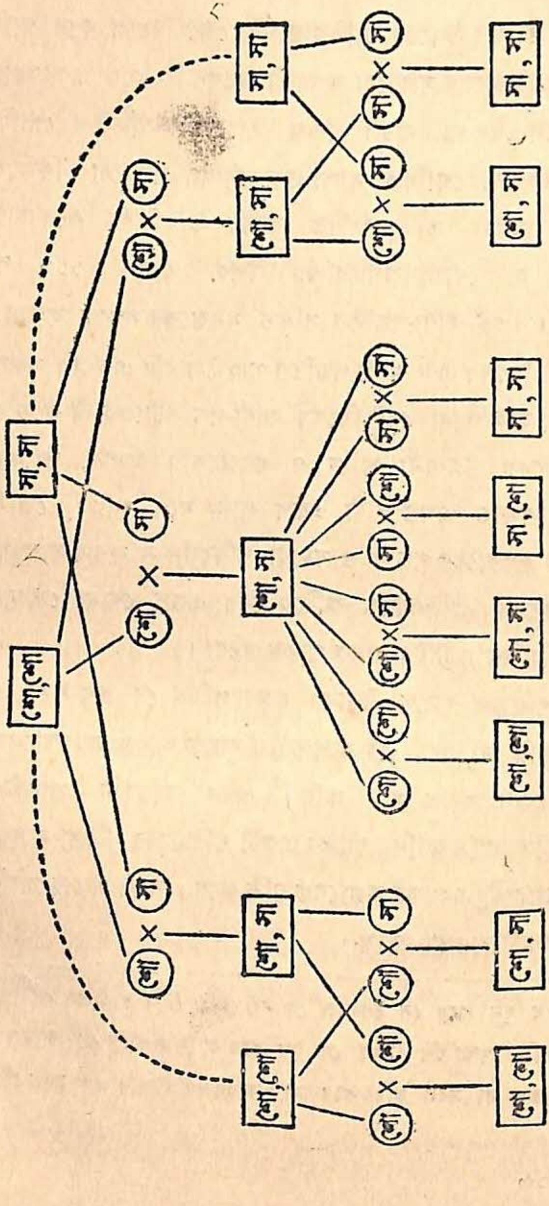
উভয় স্পৃহাই জাগ্রত হয় তাকেই আমরা বলি অপরাধী। স্বভাব-অপরাধীদের মধ্যে তারা জন্মগতভাবে এবং অভ্যাস-অপরাধীদের মধ্যে তারা অভ্যাসগতভাবে জাগ্রত হয়। আমার মতে এই স্পৃহাদ্বয় একটী বিশেষ পন্থায় বা ধারায় বংশগত হয়, এই কারণে কতকগুলি অপরাধীকে আমরা কেবলমাত্র শোণিতস্পৃহাসম্পন্ন, কতকগুলিকে কেবলমাত্র দ্রব্যস্পৃহাসম্পন্ন এবং কতকগুলিকে আবার এই উভয় স্পৃহা-সম্পন্ন দেখে থাকি। এইবার এই শোণিত এবং দ্রব্যস্পৃহা কিরূপ উপায়ে বা পন্থায় নিরপরাধী মানুষের মধ্যেও সুপ্তভাবে বংশগত হতে পারে এই সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা যাক। বুঝবার সুবিধার জন্য ৯২ পৃঃ বর্ণিত তালিকাটী নিম্নে পুনরায় উদ্ধৃত হল।

সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়

শোণিতাত্মক | শোণিত সাম্পত্তিক | সাম্পত্তিক

অপস্পৃহার অংশ বা রূপ বিশেষ—এই শোণিত ও দ্রব্য-স্পৃহার অবস্থিতি ও বংশানুক্রম যদি আমরা মেনে নিই তা হলে তারা অনেকটা ম্যাণ্ডেল ল অনুসারে বংশগত হয় বলে মনে হয়। কিরূপ পন্থায় এবং সংখ্যায় তা বংশগত হয়, সেটা পর পৃষ্ঠার চিত্রটী অনুধাবন করলে উত্তমরূপে বুঝা যায়। চিত্রের চৌকা ঘর কয়টী মূল পিতা মাতা এবং গোল ঘর কয়টী তাদের যৌন-মিলন বুঝায়। এইখানে, শো = শোণিতাত্মক, সা = সাম্পত্তিক এবং শোসা বা সাশো = শোণিত সাম্পত্তিক, এইরূপ বুঝায়। চিত্রটী হতে শোণিতাত্মক এবং সাম্পত্তিক অপরাধীরা কিরূপ পন্থায় ও কারণে জন্মগ্রহণ করে তাও বুঝা যায়। এর ছাড়া তাদের কোন কোনটী কিরূপ (২) সংখ্যায় বংশগত হয়, তাও এর দ্বারা বুঝা যায়। এই সুপ্ত দ্রব্য বা শোণিতস্পৃহা অভ্যাস বা জন্মগতভাবে জাগ্রত হলে, তাদের আমরা অপরাধী বলি এবং তাদের এই সব জাগ্রত স্পৃহার উপর নির্ভর করে

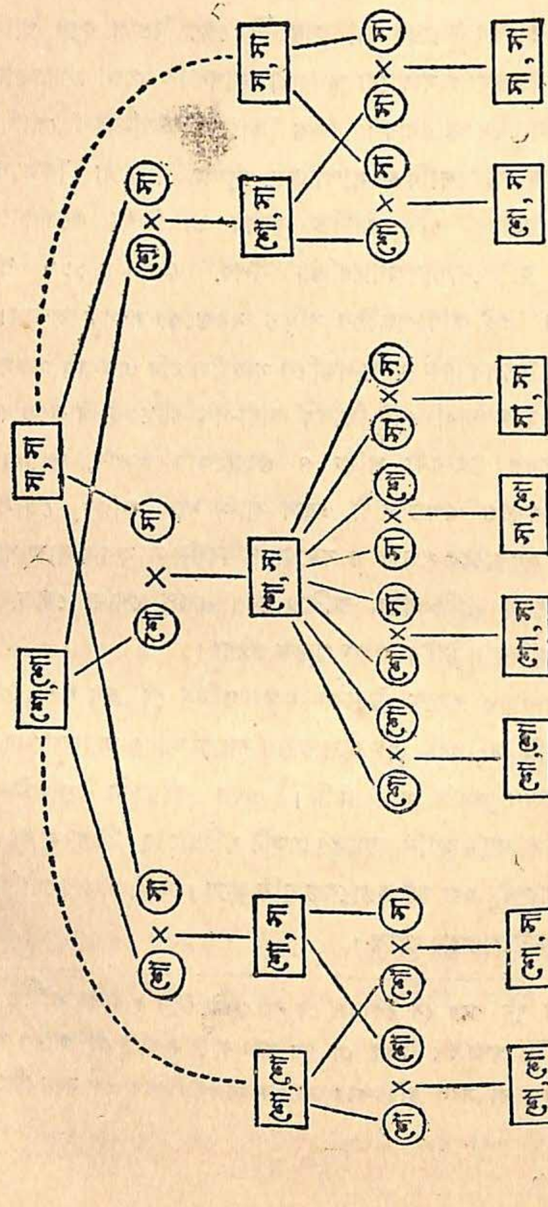
বংশানুক্রম



শো = শোণিতাত্মক। সা = সাম্পাতিক। শো সা কিম্বা সা শো শোণিত সাম্পাতিক।

পুস্তকের বর্ত্তমান খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের পূর্ব্বে আমি অপরাধীদের বংশানুক্রম সম্বন্ধে অনুসন্ধানার্থে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে গমন করি। আন্দামান বঙ্গোপসাগরের একটী দ্বীপপুঞ্জ। উহার ভারতীয় নাম আঁধার মাণিক, বস্তুতঃপক্ষে আঁধার মাণিক হইতে আন্দামান নামের উৎপত্তি হয়েছে। সপ্তগ্রামের সমুদ্রগামী শ্রেষ্ঠী ও নাবিকগণ এই দ্বীপটীর এইরূপ নামকরণ করেছিলেন। ইংরাজ রাজত্বকালে ইহার প্রধান দ্বীপটী ভারতীয় অপরাধীদের উপনিবেশ রূপে বহুকাল ব্যবহৃত হয়েছিল। অপরাধী পুরুষদের সহিত অপরাধী নারীদের এইখানে বিবাহ দেওয়া হতো। এইভাবে অপরাধী নর-নারীর সংমিশ্রনে এইখানে একটী উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। অপরাধী এবং অপরাধীদের সন্তান সন্ততিগণ এই দ্বীপের অন্যতম নাগরিক। যারা অপরাধী ছিলেন না এমন নর-নারীর সন্ততিগণেরও কেউ কেউ এই দ্বীপে বসবাস করেছিল। এদের সহিত প্রথমোক্ত নাগরিকদের কারুর কারুর বিবাহাদি কার্য্য যে না হয়েছে তা'ও নয়, কিন্তু এইরূপ বিবাহের সংখ্যা অতীব স্বল্প এবং উহা সাম্প্রতিক ঘটনা। একমাত্র এই কারণে আমার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য বিফল হয় নি। অনুসন্ধান দ্বারা আমি অবগত হই যে এখানে সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ অতীব কম, কিন্তু মারপিট জখম প্রভৃতি ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ এইখানে বহু সংখ্যায় ঘটে থাকে। ইহার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে আমি অবগত হই যে চুরি-চামারী প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অপরাধের জন্য সাধারণতঃ কাহারও দ্বীপান্তর হয় নি; কেবল মাত্র হত্যা কার্য্যের জন্য তাদের দ্বীপান্তর শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। হত্যাকারীদের মধ্যে যারা পেশাদারী খুনে তাদের সাধারণতঃ ফাঁসী দেওয়া হতো। কিন্তু যারা মাত্র ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে স্বামীকে, স্ত্রীকে, পরস্ত্রীকে বা ভ্রাতাকে হত্যা করেছিল, তাদেরই ফাঁসি না দিয়ে এই

বংশানুক্রম



শো = শোণিতাত্মক । সা = সাম্পত্তিক । শো সা কিম্বা সা শো শোণিত সাম্পত্তিক ।

পুস্তকের বর্ত্তমান খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের পূর্ব্বে আমি অপরাধীদের বংশানুক্রম সম্বন্ধে অনুসন্ধানার্থে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে গমন করি। আন্দামান বঙ্গোপসাগরের একটী দ্বীপপুঞ্জ। উহার ভারতীয় নাম আঁধার মাণিক, বস্তুতঃপক্ষে আঁধার মাণিক হইতে আন্দামান নামের উৎপত্তি হয়েছে। সপ্তগ্রামের সমুদ্রগামী শ্রেষ্ঠী ও নাবিকগণ এই দ্বীপটীর এইরূপ নামকরণ করেছিলেন। ইংরাজ রাজত্বকালে ইহার প্রধান দ্বীপটী ভারতীয় অপরাধীদের উপনিবেশ রূপে বহুকাল ব্যবহৃত হয়েছিল। অপরাধী পুরুষদের সহিত অপরাধী নারীদের এইখানে বিবাহ দেওয়া হতো। এইভাবে অপরাধী নর-নারীর সংমিশ্রনে এইখানে একটী উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। অপরাধী এবং অপরাধীদের সন্তান সন্ততিগণ এই দ্বীপের অন্যতম নাগরিক। যারা অপরাধী ছিলেন না এমন নর-নারীর সন্ততিগণেরও কেউ কেউ এই দ্বীপে বসবাস করেছিল। এদের সহিত প্রথমোক্ত নাগরিকদের কারুর কারুর বিবাহাদি কার্য্য যে না হয়েছে তা'ও নয়, কিন্তু এইরূপ বিবাহের সংখ্যা অতীব স্বল্প এবং উহা সাম্প্রতিক ঘটনা। একমাত্র এই কারণে আমার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য বিফল হয় নি। অনুসন্ধান দ্বারা আমি অবগত হই যে এখানে সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ অতীব কম, কিন্তু মারপিট জখম প্রভৃতি ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ এইখানে বহু সংখ্যায় ঘটে থাকে। ইহার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে আমি অবগত হই যে চুরি-চামারী প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অপরাধের জন্য সাধারণতঃ কাহারও দ্বীপান্তর হয় নি; কেবল মাত্র হত্যা কার্য্যের জন্য তাদের দ্বীপান্তর শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। হত্যাকারীদের মধ্যে যারা পেশাদারী খুনে তাদের সাধারণতঃ ফাঁসী দেওয়া হতো। কিন্তু যারা মাত্র ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে স্বামীকে, স্ত্রীকে, পরস্ত্রীকে বা ভ্রাতাকে হত্যা করেছিল, তাদেরই ফাঁসি না দিয়ে এই

দ্বীপে পাঠানো হতো। এই কারণে ঐ দিনকার ক্রোধী নরনারীর সন্তান সন্ততিদের মধ্যে উগ্রপ্রকৃতির মানুষের বাহুল্য এইস্থানে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এই কথা ভুলে গেলে চলবে না। এদের অপরাধী পূর্ব্বপুরুষদের পিতামাতা, পিতামহ, প্রপিতামহরা সকলেই অপরাধী ছিলেন না। এইজন্য অধুনাকালে উন্নততর শিক্ষা ও পরিবেশের মধ্যে পড়ে এইখানকার জনগণের মধ্যে যারা শিক্ষিত ও ভদ্র তাদের মধ্যে পূর্ব্বেকার উগ্রস্বভাব মানুষ কম দেখা যায়। এক্ষণে এখানকার শিক্ষিত জনগণ বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতের উন্নততর সাধুপ্রকৃতির নাগরিক।

আন্দামান দ্বীপে পরিদৃষ্ট বংশানুক্রম অনুধাবন করলে এইরূপ প্রতীতি হবে যে মানুষের স্বভাব চরিত্র তাহাদের বংশানুক্রম পরিবেশ এবং শিক্ষাদীক্ষা, এই তিনটি মূল সংস্কার মধ্যপথ (RESULTANT) অবলম্বন করে প্রবাহিত হয়ে থাকে।

অপরাধ-সাহিত্য

অপরাধীদের দ্বারা রচিত সাহিত্যকে বলা হয় অপরাধ-সাহিত্য। সভ্য মানুষের অজ্ঞাতে এই সাহিত্য আবহমান কাল হতে রচিত হয়ে আসছে। অপরাধও অপরাধীদের প্রকৃত মনোভাব সম্বন্ধে বহুবিধ বিষয় এই সাহিত্য হতে জানা যায়। শুধু তাই নয়, অপরাধী হওয়ার কারণ এবং অপরাধীর বিভিন্ন সংস্কার, নিয়ম কানুন সম্বন্ধেও জ্ঞাত হওয়া যায়। বিভিন্ন রূপ ডাক বা শব্দ, চিত্র-লিপি, গান, মন্ত্র, কবিতা, উক্তি, খেউড় প্রভৃতি লইয়া অপরাধ-সাহিত্য গঠিত হয়েছে। নিরপরাধ সাহিত্যের ন্যায় অপরাধ সাহিত্যেরও ক্রমবিকাশ হয়েছে একটী বিশিষ্ট ধারায়। সভ্যতার সহিত সংঘাতের ফলে এই সাহিত্যের স্বরূপ কিছুটা পরিবর্ত্তিত হলেও মূলতঃ তা অপরাধ-সাহিত্যেই আছে। কেবলমাত্র, ইয়ুরোপীয় এবং ভারতীয়

অপরাধীদের দ্বারা রচিত সাহিত্য নিয়ে একটী মহাভারত রচনা করা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অপরাধ-সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের মাত্র কয়েকটী করে উদাহরণ দেওয়া হবে। অর্থাৎ কি'না মনস্তত্ত্ব বুঝাবার জন্য যেটুকুর প্রয়োজন মাত্র সেইটুকুর কথাই বলা হবে। সাধারণতঃ প্রকৃত অপরাধীরা তিন ভাগে বিভক্ত। যথা – সভাব, মধ্যম ও অভ্যাস। দৈব-অপরাধী ও অপরাধ-রোগীদের প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে ধরা হয় না। স্বভাব-জাত অপরাধীদের স্বভাব-অপরাধী, অভ্যাস-জাত অপরাধীদের অভ্যাস-অপরাধী এবং যে সকল অপরাধীদের ব্যবহার কতকটা স্বভাব ও কতকটা অভ্যাস অপরাধীদের মত হয়, তাদের মধ্যম অপরাধী বলা হয়। স্বভাব-জাত অপরাধীরা হয় অনেকটা আদিম যুগের মানুষের ন্যায়, তাদের মধ্যে সাহিত্য বলে কোনও জিনিষ থাকে না বললেই চলে। এদের যা কিছু সাহিত্য তা জন্তু জানোয়ারদের অনুকরণে ডাক বা শব্দের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। প্রয়োজন মত অভ্যাস ও মধ্যম অপরাধীরাও বিশেষ করে মধ্যম অপরাধীরা এই সব ডাক বা শব্দের সাহায্য নিয়ে থাকে। বস্তুত অপরাধীদের প্রথম সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায় এই সব বিভিন্নরূপ ডাক বা শব্দের মধ্যে। এই সকল ডাক বা শব্দ পশু পক্ষীদের ডাকের অনুকরণে সৃষ্টি হয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটী ডাকের নমুনা তুলে দিলাম।

পেঁচা—কঁ্যচ ক্যা-য়্য এ্য ক্যা ক্যা-য়্য।
বেরাল—মিউ-উ ম্যাও-ও ম্যা এ্যা-ও।
কুকুর—ভোক্ ভেউ-উ ভোক ভোক।
শিয়াল—হুয়া-য়া-য়া হুয়া হুয়া হু-উ-উ।

পল্লী অঞ্চলে অপরাধীরা জঙ্গল বা বাগিচার মধ্যে আত্মগোপন করে এই সকল জন্তুর ডাকের অনুকরণে ডাক ডেকে পরস্পরকে পরস্পরের

অবস্থিতি জানিয়ে দেয়। দলপতিরা এর দ্বারা দলের লোকদের কোনও এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে জড় হবার জন্যে নির্দ্দেশ দেয়। এমন অনেক স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতি আছে যারা কিনা আজও এই ধরণের ডাক ডেকে অপকর্ম্ম করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাঙলার বাউরি জাতির কথা বলা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটী প্রণিধান যোগ্য।

"আমার বাস ছিল বর্দ্ধমান অঞ্চলের এক পল্লীগ্রামে। বহু বৎসর পূর্ব্বের কথা, আমি তখন বালক। বাইরের ঘরে বসে পিতাঠাকুর পাড়ার মুখুয্যেমশাই-এর সঙ্গে পাশা খেলছিলেন। রাত তখন প্রায় সাড়ে বার। হঠাৎ একটা শিয়ালের ডাক শোনা গেল—"হুয়া-য়া-য়া হু-উ-উ হুয়া।" মুখুয্যেমশাই চমকে উঠে বাবাকে শুধালেন—"উঁহু বাঁড়ুয্যে, গতিক সুবিধের নয়। এ যে এক শিয়ালীর ডাক!" এই শিয়ালীর ডাক না'কি এক ভয়াবহ ব্যাপার, সাধারণতঃ কখনও মাত্র একটা শিয়াল ডাকে না, একটা ডাকলেই সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক শিয়াল এক সঙ্গে ডেকে উঠে। আসলে কোনও ডাকাত দলের সর্দ্দার শিয়ালদের ডাকের অনুকরণে তার লোকেদের কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে জমা হতে বলছিল। মুখুয্যেমশাই-এর কথায় বাবা তাড়াতাড়ি উপরে উঠে চাপা সিঁড়ি বন্ধ করলেন। মুখুয্যেমশাইও আর দেরী না করে বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। সকালে উঠে শুনতে পেলাম, গাঁয়ে ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতরা পাড়ার মনো স্যাকরাকে কেটে দু'খান করে তার সর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছে।"

এই সকল ডাক বা শব্দই অপরাধীদের আদি সাহিত্য। এই শব্দ-সাহিত্যের পরই চিত্র-সাহিত্যের স্থান। চিত্র-সাহিত্যের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় মধ্যম অপরাধীদের মধ্যে। স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতিদের মধ্যেই বহুসংখ্যায় মধ্যম অপরাধী দৃষ্ট হয়। এদের সভ্যতা যেন সবে মাত্র সুরু হয়েছে। এদের মধ্যে চিত্রদ্বারা লিখনপদ্ধতি আজও পর্য্যন্ত প্রচলিত

আছে। এইরূপ লিখনপদ্ধতি অপরাধের জন্যই তারা প্রয়োগ করে। অপরাধ ও নিরপরাধ উভয় সাহিত্যেরই প্রথম উন্মেষ হয় এইরূপেই। সভ্য মানুষের প্রথম সাহিত্যের সন্ধান মেলে না। কিন্তু অপরাধীদের



অপরাধ-সাহিত্যের আজও সন্ধান মেলে। বংশ-পারম্পরিক অপরাধীরা, যাদের আমরা স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতি বলি, তারা আজও পর্য্যন্ত তাদের সেই সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের পুরানো কৃষ্টিকে ধরে রেখেছে। নমুনা স্বরূপ উপরের একটী মাত্র ছত্র তুলে দেওয়া হল।

কোনও বাড়ীতে চুরি বা ডাকাতি করার প্রয়োজন হলে, দলের সর্দ্দার বাড়ীটার কাছাকাছি কোনও একটী পাঁচিল বা গাছের গায়ে উপরি উক্ত সাঙ্কেতিক চিত্রটী এঁকে দেয়। উপরের চিত্র-সঙ্কেতের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে এইরূপঃ "যে তারিখে চাঁদ দেখা যাবে চিত্রের ফালির ন্যায়, সেই তারিখের রাত্রে, দুই প্রহরে তীর দ্বারা প্রদর্শিত পথের তৃতীয় বাড়ীটাতে কাজ হবে, অতএব বন্ধুগণ তোমরা সেই রাত্রে অনুরূপ সময়ে অকুস্থলে হাজির হবে। ইহাই আমার নির্দ্দেশ।

যে অনুজ্ঞা সভ্য মানুষ উপরের অতগুলি ছত্রে প্রকাশ করে, অপরাধীরা সেই কথাগুলি মাত্র চিত্রের কয়েকটি রেখা দ্বারা গত সাত আট হাজার বৎসর ধরে প্রকাশ করে আসছে। ওটা তাদের কাছে লিপিবদ্ধ সাহিত্যেরই সামিল। এরূপ সহস্র সহস্র চিত্র-লিপি বিভিন্ন স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতিরা আবহমান কাল ধরে ব্যবহার করে আসছে। অনেক সময় দেখা যায় ভারতের কোনও এক স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতির মধ্যে যে বিশেষ চিত্র-লিপির প্রচলন আছে, সেই বিশেষ চিত্র-লিপি ইয়ুরোপের কোনও এক স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতিও ব্যবহার করে, যদিও অধুনা কালে তারা

বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে ও বিভিন্ন পরিচ্ছদ পরিধান করে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে উভয় জাতিই একই বংশ-উদ্ভব এবং কোনও এক সুদূর প্রাচীন যুগে তাদের বিভিন্ন শাখা পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে গমন করে। এই সব চিত্র-লিপির পরিপূর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে কোন্ শাখাটী কত পুরাতন এবং কোন্ দেশটি ছিল তাদের প্রথম আবাসস্থল, সে সম্বন্ধেও একটা নির্ভুল ধারণা করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, কোন্ সময় ও কবে কোন্ শাখাটী কোন্ দেশে গমন করে তাও বলা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জিপসী বা বেদেদের কথা বলা যেতে পারে। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই এরা দৃষ্ট হয়। দেশভেদে এদের চেহারা, ভাষা ও পরিচ্ছদের বহু অদল বদল হয়েছে, কিন্তু মূলতঃ ভাষাসঙ্কেত ও আচার ব্যবহারের দিক থেকে তারা আজও একই আছে। এই সব চিত্র-লিপির স্বরূপ ও প্রসার থেকে স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতির কোন্ বংশটী কত পুরাতন ও কোন্ কোন্ সভ্য জাতির সহিত তাদের পৌরাণিক সম্বন্ধ আছে, তাও বলা যেতে পারে। বিষয়টি তথ্যান্বেষী ছাত্র ও অধ্যাপকদের বিবেচ্য।

বাংলাদেশের স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে বাউরিয়া জাতি অন্যতম। স্মরণাতীত কাল থেকে সভ্যদেশে বাস করা সত্ত্বেও তারা তাদের আদিম অভ্যাস ত্যাগ করেনি। চুরি ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধ দ্বারাই তারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই জাতির লোকদের মধ্যে বহুপ্রকার সাঙ্কেতিক লিপির প্রচলন আছে। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটী মাত্র উদ্ধৃত করা হল।



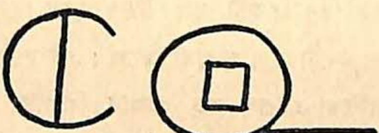


গন্তব্য পথের পাশের গাছ বা পাথরে এই সব স্বভাব-দুর্ব্বৃত্তরা উপরি-উক্ত চিত্রলিপি লিখে রাখে। পশ্চাদাগতরা এই সব লিপি দ্বারা

পূর্ব্বগামীদের খুঁজে বার করে। উপরিউক্ত লিপিকার অর্থ হয় এইরূপ :

বন্ধুগণ, আমরা আঁকড়ীর উল্টো দিককার সরল রেখার দিকে যাত্রা করেছি। (২) আমাদের দলে ৯ জন লোক আছে। সকলেই আঁকড়ীর উল্টো দিককার সরল রেখার দিকে চলেছি। (৩) আমরা গ্রামে ছাউনি ফেলব। আমরা ফিরে চলেছি।

আঁকড়ীর রেখার উপর অবস্থিত নয়টি সরল রেখার দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয় দলে কত লোক আছে। গোলকটী দ্বারা বোঝা যায় যে তারা গ্রামে রাত্রিযাপন করবে। গোলকের ডান দিকে ফাঁক থাকলে, বোঝা যাবে তারা ফিরে যাচ্ছে ; কিন্তু বাম দিকে ফাঁক থাকলে বুঝতে হবে, তারা অপরাধ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। আঁকড়ীর সরল রেখাটী দিক-বাচক। আঁকড়ীর রেখাটীর দিকেই তারা চলেছে।

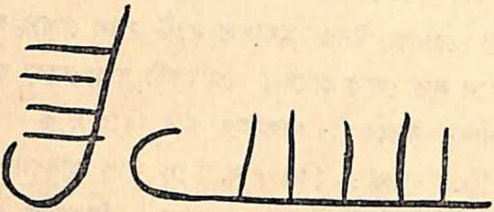


উপরে আরও দুইটি চিত্র-লিপি উদ্ধৃত করা হল। গ্রামের ছাউনি উঠিয়ে অগ্রসর হবার পূর্ব্বে পুর্ব্ব লিপিকার জের স্বরূপ বর্ত্তমান লিপিকাটি লেখা হয়। পশ্চাদাগতরা এই চিত্র-লিপি পাঠে পূর্ব্বগামীদের গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়। চিত্র-লিপিকাটীর প্রকৃত অর্থ হয় এইরূপ :

বন্ধুগণ, আমরা গোলকের ফাঁকের মুখেই (দিকেই) চলেছি বটে কিন্তু আমরা দুই দলে বিভক্ত হয়েছি। আমাদের সঙ্গে চোরাই মাল আছে। এবং আমরা গোলক সংলগ্ন সরল রেখার মুখে (দিকে) প্রস্থান করছি।

উপরের প্রথম চিত্রটী থেকে দেখা যাবে একটী সরল রেখা গোলকটীকে

দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, দলটী দুইভাগে বিভক্ত হল, কিন্তু উভয় দলই গোলকের ফাঁকের দিকে চলেছে। শুধু তাই নয় তারা ফিরে চলেছে, দ্বিতীয় চিত্রের গোলক মধ্যস্থ চৌকা ঘরটী থেকে বুঝা যায়, তাদের সঙ্গে লুণ্ঠিত দ্রব্যও আছে। গোলক সংলগ্ন সরল রেখাটী তাদের যাত্রার দিক নির্ণয় করে।



শেষ নির্দ্দেশ জানিয়ে দেওয়া হয় উপরের চিত্রটী দিয়ে। এর দ্বারা তারা জানিয়ে দেয় তাদের একটী দল উত্তর মুখে চলেছে। এই দলে আছে চারজন। অপর দলটী চলেছে পূর্ব্ব দিকে। এই দলে আছে পাঁচজন।

স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতিরা এইরূপ বহু প্রকার লিপিকা ব্যবহার করে। এইসব লিপিকা, একই অর্থে তারা বংশপরম্পরায় ব্যবহার করে আসছে। এই সব লিপিকা অপরাধীদের প্রাচীন সাহিত্য।

এই সব চিত্র-লিপি ছাড়া বহু প্রকার সাংকেতিক শব্দ ও ভাষাও এই সব স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতিরা আবহমান কাল ধরে ব্যবহার করে আসছে। এই সব ভাষা-সঙ্কেত পরবর্ত্তীকালে সৃষ্টি হয় বলেই মনে হয়। এক একটী স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতি এক এক প্রকার ভাষা-সঙ্কেত ব্যবহার করে, কোনও একটী বিশেষ স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতি কর্তৃক ব্যবহৃত ভাষা-সঙ্কেত, যদি কোনও এক আধুনিক সভ্যজাতির ভাষার মধ্যে বেশী-সংখ্যায় দেখা যায় তা হলে সেই সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য বা অসভ্য জাতিকে একই বংশোদ্ভূত বলে

মনে করা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে অপরাধ-বিজ্ঞানবিদ্‌দের অবহিত হওয়া উচিত।

ডাক বা শব্দের পর চিত্র-লিপি এবং চিত্র-লিপির পর সঙ্কেতাদি অপরাধ-সাহিত্যে একটী বিশেষ স্থান অধিকার করে। এই ভাষা-সঙ্কেতের স্বরূপ থেকে কোন্ সঙ্কেতটী কত পুরাতন এবং কোন সময় ও কি কারণে সৃষ্ট হয়, তাও বলা জেতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পুলিশ কথাটীর কথা বলা যেতে পারে। অধুনাকালে পুলিশ বা সান্ত্রী বোঝাবার জন্যে বিভিন্ন দল কর্ত্তৃক বিভিন্ন সাঙ্কেতিক শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন ভাষা-সঙ্কেত অধিক সংখ্যায় মধ্যম অপরাধীরা ব্যবহার করে এবং আধুনিক ভাষা-সঙ্কেত অধিক সংখ্যায় ব্যবহার করে অভ্যাস-অপরাধীরা। ভাষা সঙ্কেতের শব্দ-বিন্যাস থেকে তার প্রাচীনতা বা আধুনিকতা ধরা পড়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা-সঙ্কেতের কয়েকটী নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। বাংলা দেশে তুঁতিয়া মুসলমান নামক এক স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতি আছে, ডাকাতির সময় বিপদের সূচনা হলে তাদের দলপতি চীৎকার করে অপর সকলকে সাঙ্কেতিক ভাষায় আদেশ জানায়। সাঙ্কেতিক ভাষাটী এইরূপ—"মাছি ঘন জাল গুঁট"। অর্থাৎ মাছি উড়ছে দলে দলে, এইবার গুটিয়ে নাও, অর্থাৎ ফিরে চল বা সরে পড়ে।

এই সাঙ্কেতিক ভাষা দুইপ্রকারের হয়। নিম্নশ্রেণীর সঙ্কেতকে বলা হয় খেউড় বা শ্ল্যাং এবং উচ্চশ্রেণীর সঙ্কেতকে বলা হয় সাইফার বা সঙ্কেত। প্রথমে অপরাধীদের খেউড় বা শ্ল্যাং সম্বন্ধে বলা যাক।

খেউড়

খেউড় বা শ্ল্যাং অপরাধ-সাহিত্যের একটী প্রধান স্থান অধিকার করে। প্রত্যেক দেশের অপরাধীদের মধ্যেই নিজস্ব খেউড় বা শ্ল্যাং দেখা যায়। ইংরাজীতে একে বলে শ্ল্যাং, ফরাসীরা একে বলে আরগট্, ইতালীয়রা একে বলে গারগো এবং ভারতীয়রা একে বলে খেউড়। এই সব খেউড়ের সাহায্যে অপরাধীরা পরস্পরের সহিত পরস্পর কথোপকথনের কাজ চালায়। এক এক দল বা গোষ্ঠির অপরাধী এক এক প্রকার খেউড় ব্যবহার করে। বংশপরম্পরার ন্যায় গুরু পরম্পরায়, এই খেউড় সম্পদের অনেক শব্দ, যুগ যুগ ধরে নেমে এসেছে, এরূপই অনুমিত হয়। অপরাধীদের এই খেউড় সম্পদ ভাষাতত্ত্ব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয়, এই সব খেউড়ের শব্দগুলি অনুধাবন করলে, এক দেশীয় অপরাধীর সহিত অপর দেশীয় অপরাধীর প্রাচীন সম্বন্ধ জানা যায়। আমরা সকল দেশের অপরাধীদের খেউড়ের মধ্যে অনেক বিদেশী শব্দের সন্ধান পাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জার্ম্মাণ অপরাধীদের কথা বলা যেতে পারে, এদের খেউড়ের শব্দগুলির মধ্যে আমরা হিব্রু শব্দের প্রাচুর্য্য দেখি, তেমনি ইতালীয় খেউড়ের মধ্যে আমরা জার্ম্মাণ ও ফ্রেঞ্চ, ফরাসী খেউড়ের মধ্যে জার্ম্মাণ ও ইংরাজ এবং ইংরাজী খেউড়ের মধ্যে ইতালীয় ও রোমানি শব্দের প্রাচুর্য্য দেখি। হরসলি সাহেব কয়েকটী ইংরাজী খেউড়ের শব্দের মধ্যে অনেক জিপ্‌সী এমন কি বিকৃত সংস্কৃত শব্দেরও সন্ধান পান। ভারতীয় অপরাধীদলের খেউড়ের মধ্যে হিব্রু, জার্ম্মাণ, আরব এবং চৈনিক শব্দও পাওয়া যায়। এই সকল খেউড় হতে অনেক ঐতিহাসিক

তন্ত্রের কথাও জানা যায়। যথা, ইতালীয় অপরাধীরা মাতালকে বলে "ফরাসী", ভিখারীকে বলে "স্প্যানিয়ার্ড", তে-তাস-খেলোয়াড়দের বলে "গ্রিক"। স্পেনীয় অপরাধীরা চোরদের বলে মরেক্কো। ভারতীয় অপরাধীরা 'চিট'দের বলে উড়ে, নওসেরা, ডাকাতদের বলে বর্গী দেশবালী, বাঙ্গালীদের বলে বোম্বেটে ইত্যাদি ; ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করেও অনেক খেউড়ের সৃষ্টি হয়েছে। যথা,— Julilletiser অর্থে ফ্রান্সে "ডির্থোন" বুঝায়। ডিউক অব বাগুসির ব্যাপারের সহিত ইয়ুরোপীয় অপরাধীদের দ্বারা ব্যবহৃত Coup De Rogusi শব্দটীর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। এই সব খেউড়ের কতকগুলি শব্দ দেশের প্রচলিত শব্দগুলির অপভ্রংশ বা সংক্ষিপ্তসার মাত্র, কিন্তু অধিক ক্ষেত্রে খেউড়ের শব্দ সকল অতীব প্রাচীন হয়। কেবলমাত্র অভ্যাস-অপরাধীরাই প্রতিদিনই নূতন নূতন খেউড়ের সৃষ্টি করে—সাঙ্কেতিক কথোপকথনের সুবিধার জন্য। আমরা অনেক খেউড়-শব্দের সম-অর্থে ব্যবহার দেখতে পাই। মিঃ বিগনি ও মিঃ কগনেট সাহেব সম-অর্থ ব্যবহৃত নিম্নোক্তরূপ বহু খেউড়ের সন্ধান পান। ভারতীয় খেউড় শব্দগুলি সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে, নিম্নের বিলাতী তালিকাটী অনুধাবন করুন :—

(১) পুলিশ বুঝাইতে	১৭	টী	শব্দ
(২) সোডমি "	৯	"	"
(৩) ডাকাতি "	৭	"	"
(৪) মাতলামি "	৪৪	"	"
(৫) মদ্যপান "	২০	"	"
(৬) মদ "	৮	"	"
(৭) জল "	১৯	"	"
(৮) টাকাকড়ি "	৩৬	"	"

এদেশের স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে এরূপ বহু খেউড়ের প্রচলন আছে। এ ছাড়া শহর ও গ্রাম্য অপরাধীরাও বহুবিধ খেউড় ব্যবহার করে। এই সকল খেউড়ের মধ্যে বিদেশী ভাষার সহিত ভারতীয় আদিম জাতির অনুন্নত ভাষার আভাষও পাওয়া যায়। বঙ্গীয় ও কলিকাতা পুলিশের দপ্তরখানায়, এরূপ বহু শত খেউড় শব্দ সংগৃহীত আছে। ইউরোপীয় অপরাধীদের খেউড়গুলিও বিভিন্ন পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব ভারতীয় ও বিদেশী খেউড়গুলির তুলনামূলক আলোচনা এদেশে আজও হয় নি। সাধারণতঃ বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে, প্রাচীনকাল হতে, এক দেশের অপরাধীদের সহিত অপর দেশের অপরাধীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে আসছে। এই সকল খেউড় শব্দগুলির প্রাচীনত্ব অনুধাবন করে এই সব বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের সময় ও কাল পর্য্যন্ত বলে দেওয়া যায়। নিম্নে বর্ত্তমান ভারতীয় অপরাধী-দল কর্ত্তৃক ব্যবহৃত কয়েকটী খেউড়ের উদাহরণ দেওয়া হল। এই খেউড়ের শব্দগুলি অনুধাবন করলে বুঝা যায়, কতকগুলি শব্দ অতি প্রাচীন, আবার কতকগুলি শব্দ আধুনিক বা অতি-আধুনিক। প্রয়োজন বিধায় আধুনিক কালে তারা সৃষ্ট হয়েছে। কয়েকটী এদেশীয় স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতির সাঙ্কেতিক ভাষা বা খেউড় নিম্নে লিপিবদ্ধ হল :—

মুজাফাপুর সোনার

রুমাল—সিঁদকাঠি

জাজলি কৈ—আঁধার রাত

খাউ—চোরাই মালের গ্রহীতা

ইরানি দল

লেপেই—পুলিশ

ডামরি—টাকা

টিন—পকেট

সানি—টাকার থলি

ব্রো—যাও

ঝাঝা দোসাদ

বেব্রো—শীঘ্র যাও
বিয়েনয়া—এখানে এস
কাকা—ভাই
নামিদান—না
বিবিসি—এস, খানা খাও
কৈ লো বিকোশ—ধূম পান করো
চিসিমিকেবা—কি জন্যে
আস বাকোব—ভাত খাও
ধুর—মানুষ
বকুল চিন থি—বুক পকেট

থাম—দারোগা
খোহট—সিপাই
কেটরী—সিঁদকাঠি
ভোমরা—ঘটি
পানাপিয়া—গেলাস
সিলচার—গহনা
পিসাকো—কাপড়
চিকান—থালি
কাটনি—কাঠের বাক্স

এই সকল শব্দ থেকে আমরা প্রাচীন যুগে প্রচলিত বহু সামরিক শব্দও উদ্ধার করতে পারি। যথা, "ব্রে", অর্থাৎ কি'না যাও, ইংরাজী কুইক মার্চ্চ। "বে ব্রো", অর্থাৎ কি'না শীঘ্র যাও, ইংরাজী ডবল মার্চ্চ। শব্দ দুইটি যে সংস্কৃত ব্রজ ধাতু থেকে সংগৃহীত হয়েছে, তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। পুরাকালের ভারতীয় সামরিক সম্প্রদায়গুলির সহিত আধুনিক স্বভাব-দুর্ব্বত্ত জাতিদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে প্রায়ই মিলিত হতেন এই সংস্কৃতবাচক সামরিক শব্দ হতে আমরা অনুমান করে নিতে পারি।

যাঁরা এদেশীয় ভাষা-সঙ্কেতসমূহ সম্বন্ধে আগ্রহশীল, তাঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশীয় স্বভাব-দুর্ব্বত্ত জাতিদের সম্বন্ধে লেখা পুস্তকগুলি পড়ে দেখতে পারেন। এই সব ভাষা-সঙ্কেত বিভিন্ন প্রদেশীয় পুলিশ কর্ত্তৃক এখনও সংগৃহীত হচ্ছে, আমি নিজেও এরূপ বহু ভাষা-সঙ্কেত সংগ্রহ

করেছি। ভারতবর্ষে বাউরিয়া নামক একটী স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত উপদল আছে। উহারা মুজাফারনগর, হায়দ্রাবাদ, সিন্ধু ও ভাগলপুর ষ্টেটে বাস করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই উপদল কর্ত্তৃক ব্যবহৃত কয়েকটী ভাষা সঙ্কেতও নিম্নে তুলে দিলাম।

"Tuk—রুটী। Deekra—পুত্র, দিকরি—কন্যা, Sago—পিতা। Dakho—শাল। Keh—চুল। Khoyee—ঘুম। Goda—পা। Bakko—মুখ। Thanoon—পুলিশ। Boro—চিনি। Choree-nomal Lebao—চোরাই মালের ক্রেতা। মোটো বা মোধানো—হাকিম। Mankho Thaio Avechhey—অপরিচিত লোক আসছে। Malkhatigaro··· মাল লুকোও। Dhartheenapete Dheydhiyo মাটিতে পুতে ফেল। Gantadamen Hath Nako···থলির মধ্যে লুকোও। Khahan Kateo—লুকোলে কেন? Tereeano Honei Bhayamsai—সন্দেহ হয় লোকটা পুলিশ। Kharkhat Jadathi Dhksai—পুলিশ আমাদের খুঁজবে। Tabriyani Ghaogi Dhedhiyo—ছেলেটাকে মালটা দিয়ে দাও। Chuddo Namko Vatvano—তোমার আসল নাম বলো না। Bijjo Lehdavidhei—মিথ্যা নাম বলো। Tho dero heera hosei thakan javeen radeejav—তুমি যাও, পরিশিষ্ট দলে যোগ দাওগে। Tho teroo o bandosi lasseejav—রক্ষীরা অসতর্ক, এইবার পালাও আর অর্থ নেই। Thahan Ahana hutho thahan bagee chosei thahan dhad theena pete melee dhadheesai—আমি ছাউনির কাছে কাছে মাল পুঁতে রেখেছি। Kharkhaar khaareen bathein kahee-dhyo—আচ্ছা পুলিশের কাছে স্বীকার করো।

"স্মাগলারগণ নিষিদ্ধ পণ্যদ্রব্যকে সাধারণতঃ সওদা নামে অভিহিত

করে। কেহ কেহ এই ব্যবসায়কে বলে "কাম" বা "কায"। * বিবিধ নিষিদ্ধ-দ্রব্য সম্বন্ধে তাদের নিজস্ব পরিভাষা আছে। সাধারণ ব্যক্তিদের দ্বারা এই সকল শব্দ সহজ অর্থে ব্যবহৃত হইলেও অপরাধীদের নিকট উহারা বিশেষ বিশেষ গুপ্ত অর্থ বহন করে। বহু অপরাধীদের বাটী খানা-তল্লাস করিয়া পুলিশ ঐরূপ পরিভাষাযুক্ত চিঠিপত্র, হিসাব-বহি, টেলিগ্রাম প্রভৃতি উদ্ধার করিয়াছে। এইসব কাগজপত্র আদালতে উপস্থিত করিয়া অভিজ্ঞ অফিসারগণ উহাদের প্রকৃত অর্থ বলিয়া দিয়াছেন এবং আদালত তাহা মানিয়াও লইয়াছেন। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটী বিশেষ বিশেষ সঙ্কেত-শব্দ উদ্ধৃত হল —"আফিমের ফুল" দ্রষ্টব্য।

"(১) রেশমী থান—কোকেন। (২) এক নম্বর চিড়িয়া মার্কা—জাপানে প্রস্তুত কোকেনের ট্রেডমার্ক। (৩) কম্বল—আফিম। (৪) নম্বরী মাল—ট্রেজারীর চোরাই আফিম। (৫) টিকিয়া—একপ্রকার চৌকা ও চেপ্টা চোরাই আফিম। (৬) ঘোড়া বা টাট্টু—চোরাই রাইফেল, রিভলভার, পিস্তল। (৭) খাউ—চোরাই মালের গ্রাহক। (৮) খোকী—পিস্তল। (৯) খাবার—গুলি।

এই সকল সাঙ্কেতিক শব্দের সাহায্যে কিভাবে অপরাধীরা কথোপ-কথন চালায় নিম্নের প্রশ্নোত্তর হতে তার কিছুটা আভাষ পাওয়া যাবে। —"আফিমের ফুল" দ্রষ্টব্য।

১ম ব্যক্তি—খাঁ সাহেবের কারবারের খবর কি ?

---

* অপরাধীমাত্রেই অপরাধকে কাজ বা কাম বলে থাকে। কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "আচ্ছা ঐ দিনকার ঐ চুরিটা তুই করেছিস ?" তাহলে সে বিরক্ত হবে; কিন্তু তাকে যদি বলা যায়, "হ্যাঁ রে ঐ দিনকার ঐ কাজটা কি তোরা করেছিস," তাহলে তারা নিজেদের সম্মানিত মনে করে এবং খুসী হয়ে স্বীকারোক্তিও করে বসে।

২য় ব্যক্তি—মন্দ নয়। কিন্তু আপনার সঙ্গে ত অনেক দিন পর্য্যন্ত কোনও কাজই হয় নি। নূতন সওদা আছে?

১ম ব্যক্তি—এক জাপানী ব্যাপারীর হাতে দুইশ রেশমী থান (১) আছে। কি দর বলব?

২য় ব্যক্তি—এক নম্বর চিড়িয়া মার্কা (২) মাল ত? ৩০৲ টাকা হিসাবে দিতে পারি। নমুনা দেখাবেন?

১ম ব্যক্তি—আর কম্বলের (৩) দর কি দেবেন? নম্বরী মাল (৪) বিশটা আছে। এ ছাড়া এক গোয়ালিয়ারের ব্যাপারী কিছু টিকিয়া (৫) মালও এনেছে। এরই বা কি দর দেবেন?

২য় ব্যক্তি—আসল নম্বরী হয় ত ৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারি। টিকিয়া ৬৫৲ পর্য্যন্ত। নমুনা দেখলে পাকা কথা দেব, কম্বল (৩) অনেক জমেছে। রেশমী থানেরই (১) চাহিদা বেশী। দানাদার মাল পেলে দরে আটকাবে না।

১ম ব্যক্তি—ঘোড়ার (৬) কি দর? আপনার কাছে কিছু সওদা করতে চাই।

আদিম-সমাজের ব্যক্তিরা সঙ্কেত ব্যবহার করে না, তারা ব্যবহার করে খেউড়। এই সকল খেউড়ের সাহায্যে তারা আজও সভ্য লোকের অগোচরে কথোপকথন করে থাকে। এই সব খেউড় দুই প্রকারের হয়ে থাকে; যথা, সরল এবং উল্টা। সরল খেউড়ের ন্যায় অপরাধীদের মধ্যে আমরা উল্টা খেউড়ও দেখে থাকি, প্রচলিত সরল শব্দগুলিও উল্টা রূপে ব্যবহার করা অপরাধী সমাজের একটী বিশেষ রীতি। প্রমাণ স্বরূপ উল্টা খেউড়ের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক; যথা, "দেখ আমাদের একটা লোক দেখছে।" ইহার উল্টা খেউড় হবে এরূপ, "খ্যাদ, কেয়টা কোল মা আদের খেদছে।" এর যদি সরল উত্তর হয়

এইরূপ, "সত্যি। চেনা লোক, ও কিছু নয়", তাহলে এর উল্টা খেউড় হবে এইরূপ, তস্যি? নেচা কোল্, ও ছিকু অএন। উল্টা খেউড়ের দুই অক্ষরের বেশী কথাগুলির আদ্যাক্ষর দুইটীর স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ উল্টাইয়া এবং শেষের বর্ণগুলি ইচ্ছামত সোজা বা উল্টা রাখিয়া কথা বলা যায়। এদেশে 'চি' আদ্যবর্ণ এবং 'ফ' মধ্যবর্ণ দিয়া কথা বলার পদ্ধতিও প্রচলিত আছে, যথা—(১) "চিতু, চিমি, চিষা, চিও" অর্থাৎ কি'না, "তুমি যাও।" (২) তুরফপা কিরফপা করফরছ" অর্থাৎ কি'না, "তুমি কি করছ।" ইয়ুরোপীয় অপরাধীরাও এইরূপে বাক্যালাপ করে থাকে। প্রমাণস্বরূপ নিম্নে দুইটি ইংরাজী উল্টা খেউড় উদ্ধৃত করা হ'ল।

"Hi, boy! look at that fine girl with the lean moke (donkey). Pass her a pot of beer and a bit of tobacco." এই সরল ইংরাজী বাক্যটীর উল্টা খেউড় ইংরাজ অপরাধীরা এইরূপে বলে,—"Hi yob! Kool that enif olrig with the nael ekom. Sap her a top O' reeb and a tib of occabot.

অনেক সময় সরল খেউড়েরও উল্টা খেউড় দেখা যায়, যথা—Islema! Ogda the opperca! এই উল্টা খেউড়ের সরল খেউড় হবে এইরূপ "Misle! Dog the copper! এর প্রকৃত অর্থ হবে এইরূপ—"Vanish। see the police man.

[উল্টো খেউড়ের প্রথম সন্ধান পাই আমরা বৈদিক সাহিত্যে। বৈদিক ঋষিগণ এইগুলিকে "বর্ণ-বিপর্য্যয়" নামে অভিহিত করতেন। এই "বর্ণ-বিপর্য্যয়" বা উল্টা খেউড় সহ বহু শ্লোক আমরা বিভিন্ন বৈদিক গ্রন্থে পেয়ে থাকি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাত্র একটী শ্লোক আমি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"যকাঽসকৌ শকুন্তিকাঽঽহলগিতি বঞ্চতি।
আহন্তি গভে পসো, নিগল্‌গলীতি ধারকা॥"

শ্লোকটী শুক্লযজুর্ব্বেদ ২৩।২২ অশ্বমেধ পর্ব, নিহত অশ্ব-সম্পর্কে উক্ত হয়েছে। শ্লোকটীতে, "গভে" রূপ একটী শব্দ দেখা যায়। আসলে ঐ শব্দটী "গভে" নয়, উহার আসল রূপ "ভগে"। ভগে শব্দ দ্বারা ঐ যুগে স্ত্রীযোনী বুঝাতো। অশ্লীলতা বিধায় ঐ "ভগে" শব্দটী মন্ত্র উচ্চারণের সময় "গভে" বলিয়া উচ্চারিত হতো। এই মন্ত্রটী একটী যাদুমন্ত্র। অশ্বের কর্ত্তিত লিঙ্গটী মন্ত্রপূত করে বন্ধ্যা স্ত্রীগণ যোনির মধ্যে স্থাপন করে ঐরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করলে না'কি তাঁরা সহজেই সন্তানসম্ভবা হতে পারতেন।]

এই সব খেউড়ের কতকগুলি আবার বিকৃত ও কদর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা, স্ত্রীলোক, মদ প্রভৃতিকে অপরাধীরা বলে "মাল"। এবং দেহকে এরা বলে লাস বা corpse, শব্দমাত্রকেই অপরাধীরা Valgarise করে নেয় অর্থাৎ কি'না খেউড়ে পরিণত করে।

স্বভাব ও মধ্যম অপরাধীরা নিম্ন শ্রেণীর এবং অভ্যাস অপরাধীরা উচ্চশ্রেণীর খেউড় ব্যবহার করে। উচ্চ শ্রেণীর খেউড় বা শ্ল্যাং-কে ভাষার বিশুদ্ধতার জন্য আমরা সঙ্কেত বা সাইফার প্রভৃতি বলে থাকি। শিক্ষিত অপরাধীরা বহুল পরিমাণে সাইফার বা সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করে। এদের কেউ কেউ সাঙ্কেতিক ভাষা সকল ভ্যানিসিঙ ইঙ্ক দ্বারা লিখে পরস্পর পরস্পরের সহিত পত্রালাপ করে।* সাঙ্কেতিক শব্দগুলির প্রকৃতার্থ নিরূপণার্থে সকল দেশেই রাজ-সরকার "সাইফার এক্সপার্ট" বা সঙ্কেত-বিদ্ পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। এদেশীয় ভাষা সঙ্কেতের নমুনা

* কেউ কেউ ব্যক্তিগত পত্রের নির্দ্দোষ ছত্র সমূহের—অর্থাৎ কি না প্রতি দুই ছত্রের মধ্যদেশে বা ফাঁকে ফাঁকে এই কালী দিয়ে পৃথক অপর আর একটী পত্রও লিখে রাখে।

স্বরূপ নিম্নে একটী লিপিকার কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করলাম। এ সম্বন্ধে 'আফিমের ফুল' শীর্ষক অপরাধ-তত্ত্বমূলক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

"জ্যেঠা মহাশয়ের অপঘাত মৃত্যু হয়েছে। মেজজ্যেঠা কাশীতে ব্রেক্ জার্নি করিলেন। চাচা আজ রওনা হইয়াছেন, বেলুড়ে নামিবেন, টুপির নম্বর ৮৮১, গাড়ী পাঠাইবেন।"

লিপিকাটীর প্রকৃত পাঠ হইবে এইরূপ। "জ্যেঠা মহাশয়" রাশভারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অর্থাৎ যাহাতে ভারী বা বেশী মাল (আফিম) আছে। "অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে" অর্থাৎ পার্শেলটী শোচনীয় ভাবে পুলিশ ধরিয়াছে। "মেজজ্যেঠা"—যে পার্শেলে মাঝারি ওজনের মাল আছে। "ব্রেক্ জার্ণি করিবেন"—এখন ঐ পর্য্যন্ত আসিবে, পরে আবার পাঠানোর বন্দোবস্ত হইবে। "চাচা" ছোট পার্শেল। "টুপির নম্বর"—রেল কোম্পানির পুলিন্দায় দেওয়া নম্বর।

নিম্নের অপর আর একটী লিপিকার কিছুটা অংশ তুলে দেওয়া হল। "কালা মিয়া রওনা হইয়াছেন, লাল মিয়া শীঘ্রই আসিবেন। এই ব্যাপারে হিসাব নিকাশ যেন ঠিক থাকে, তা না হলে ওরা আমাকে "ট্যাপ" করবে।"

ইহার প্রকৃত অর্থ হইবে এইরূপ: কাল মিয়া অর্থে আফিম বুঝায়। অর্থাৎ আফিম পাঠান হইয়াছে। কোকেনের রঙ সাদা, কিন্তু সাদা মিয়া, এইরূপ কোন নাম নেই। স্মাগলাররা আহিফেনকে যমুনা এবং মদ্যকে গঙ্গা বলে, কারণ যমুনার রং কালো এবং গঙ্গার রং সাদা। এই কারণে কোকেনকে বলা হয় লাল মিয়া। অর্থাৎ কি'না কোকেন শীঘ্রই সংগৃহীত হবে। ট্যাপ্ করার প্রকৃত অর্থ ছুরী মারা। লিপিকাতে বলা হয়েছে, টাকাকড়ির হিসাব যেন ঠিক থাকে, সময় মত দাম না দিলে অপর স্মাগলাররা তাকে ছুরী মারতে পারে, ইত্যাদি। এইরূপ ভাবে এদেশের অপরাধীরা পিস্তলকে বলে খোকী, গুলি বা টোটাকে বলে

খাবার। রিভলভারকে এরা বলে ঘোড়া, ইত্যাদি। অধুনাকালে এট্যাব্রিন ট্যাবলেট কেবলমাত্র সামরিক বিভাগই ব্যবহার করে,সাধারণের নিকট তা থাকা আইনতঃ অপরাধ। এই কারণে স্মাগলার ও চোরেরা এই দুষ্প্রাপ্য ঔষধের নাম দিয়েছে হলদে বাড়ী। বলা বাহুল্য এই ট্যাবলেটের রঙ হরিদ্রা বর্ণের।

অপরাধীরা অনেক সময় উচ্চাঙ্গের সাহিত্যও সৃষ্টি করে থাকে। অপরাধীদের "ডাইরী" বা "রোজনামচা" লেখার কথা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। অনেক অপরাধীকে কারাগারে ও হাজতের দেওয়ালে বহুবিধ গান ও কবিতা কয়লা বা ইটের টুকরা দিয়ে লিখতে দেখা গেছে। অপরাধীদের অন্তর্নিহিত ভাবপ্রবণতার কারণে অপরাধীরা এইরূপ করে থাকে। অভ্যাস-অপরাধীদের পত্রালাপ প্রভৃতির মধ্যেও অনেক সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। আমি কোন এক ঠগী অপরাধীর ভাষার মধ্যে একটী সুন্দর শিশু-সাহিত্যের সন্ধান পাই। অপরাধীটিকে আমার নিকট আনা হলে, হঠাৎ সে বলে উঠে, "রম্ভম্ নমস্কারম্ ধনুষ্কোটীম্ মহারাজম্"। আমাকে অপরাধীটি এইভাবে সম্বোধন করায় আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি, "এর মানে কি?" অপরাধীটি তখন এর এইরূপ ব্যাখ্যা করে, "অর্থাৎ কি'না হে ধনুষ্কোটীর মহারাজ, তোমাকে আমি রম্ভা (কলা) দিয়ে নমস্কার করছি।" বেশ বুঝতে পারি অপরাধীটি আমাকে হনুমান বলছে, ক্ষেপে উঠে আমি জিজ্ঞাসা করি, তার মানে? উত্তরে অপরাধীটি বলে, "বুঝতে পারলেন না, শুনুন তবে বলি, ধনুষ্কোটী হচ্ছে কিষকিন্ধ্যার শামার ক্যাপিটেল বা গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। হিজ ম্যাজেষ্টি সুগ্রীব দি গ্রেট, হিজ্ এক্সেলেন্সি হনুমান, এবং হিজ্ রয়েল হাইনেস্ অঙ্গদকে নিয়ে এইখানে—। আমি এইবার তাকে থামতে বলে জিজ্ঞাসা করি, "থাক কোথায় তুমি?" উত্তরে অপরাধীটি বলে' "এই

যে এড্রেস্ দিচ্ছি। আমার ঠিকানা, দিশেহারা পার্ক, আকাশ পাতাল রোড, ফোন নম্বর বড়বাজার ০০০০ (ডবল ও ডবল ও)।" তাম নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলেছিল, 'সর্ব্বনাম'। এইরূপ বাক্যালাপ হতে অপরাধীদের অন্তর্নিহিত শিশুসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও একটী চোরকে ধরে এনে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার নাম কি? থাকো কোথায়? উত্তরে সে বলে, "আজ্ঞে ছিঁচ্কে।" "বিচিকাটা গলিতে থাকি।" এই ধরণের উত্তর অপরাধীদের বেপরোয়া ভাব, ভাবপ্রবণতা এবং নৈতিক অসাড়তার পরিচায়ক।

অপরাধীদের সাধারণ সাহিত্য সম্বন্ধে বলা হল, এইবার তাদের উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সম্বন্ধে বলা যাক। সাধারণতঃ অভ্যাস-অপরাধীরা, বিশেষ করে প্রাথমিক অপরাধীদের দ্বারা এই সকল সাহিত্য রচিত হয়। অপরাধ-সাহিত্য দ্বারা তারা তাদের অপস্পৃহার নিষ্কাশন ঘটায়,—শুধু তাই নয়, অপরাধ-সাহিত্য কারারুদ্ধ থাকাকালীন তাদের নিঃসঙ্গ জীবনেরও সাথী হয়।

অপরাধীরা অনেক সময় উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকে। এদের অনেকেই কোন প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করে না। এমন কি অনেকে উচ্চ বা নিম্ন কোনও প্রকারের বিদ্যালয়েও প্রবেশ করে নি। এদের অধিকাংশই লিখতে বা পড়তেও জানে না। বর্ত্তমান লিখন বা পঠন-পদ্ধতি সম্বন্ধে এরা অজ্ঞ। কিন্তু এ সত্বেও এই সকল অপরাধীরা বহু চমৎকার চমৎকার গীত ও মন্ত্রাদি রচনা করে থাকে। বহুদিন পূর্ব্বে কোনও এক পুলিশ অফিসার একটী চুরির তদন্ত ব্যপদেশে জয়নগর থানার অন্তর্গত মনিরতট নামক গ্রামে যান। সেখানে কোনও এক পুরানো চোরের বাটী হতে নিম্নলিখিত একটী তালা-ভাঙ্গার মন্ত্র তিনি উদ্ধার করেন। মন্ত্রটীর মধ্যে সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষার সংমিশ্রণ দেখা

যায়। কথিত চোরটীকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে, সে জানায় যে সে সেটা তার নিরক্ষর ওস্তাদের নিকট মুখে মুখে শিক্ষা করে। তার ওস্তাদ নিরক্ষর হলেও, সে কিছু কিছু লেখাপড়া গ্রামের পাঠশালে শিখেছিল। এই কারণে সেটা সে একটুকরা কাগজে টুকে রাখতে পেরেছে। তার বিশ্বাসমতে এই মন্ত্রপাঠে অতি সহজে তালা খুলে যায় এবং অর্থলাভ দ্বারা ভাগ্য প্রসন্ন হয়। এইরূপ বহু মন্ত্র আমি বিভিন্ন স্থান হতে সংগ্রহ করেছি। উহাদের একটি মাত্র নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল। মন্ত্রটীতে তিনটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। যথা—(১) বাঙলার সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের সংমিশ্রণ (২) তালাচাবি খোলা জনিত শব্দের অনুরূপ শব্দ-বিন্যাস (৩) দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি অথচ কুকর্ম্মে তাদের নিকট হতে সাহায্য প্রার্থনা।

> "অং ফট্ সাহা অং ফট্ সাহা অং ফট্ সাহা
> কিং কট কিং কট কটং কট সাহা
> যং যাহা অং তাহা পকেটং তট সাহা
> মা কালী দেহিং টাকা নোট ক্রলিং হাতা
> স্বায়াং ভয় ভুতেষু মাং মাতাষু দীনেষু ফট্ সাহা।"

উপরের শ্লোকটীতে আমরা "পকেট" এবং "নোট্" রূপ দুইটী ইংরাজী শব্দ পাই। ইহা ছাড়া "ক্রলিং" রূপ একটী বিদেশী শব্দের ন্যায় একটী শব্দও দেখি। ইহা কোন ভাষা হতে নেওয়া হয়েছে তা নির্দ্ধারিত করা দুরূহ। বোধ হয় উক্ত শব্দটি কোনও একটী আদিম ভাষা হতে নেওয়া হবে। স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতির লোকেরা ঐরূপ অনেক শব্দ ব্যবহার করে। এ ছাড়া আরও একটা শব্দ লক্ষ্য করবার বিষয়। শ্লোকটীতে "দীনেষু" রূপ একটী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে—হে মা কালী

আমি দীন ও দরিদ্র এবং সেই হেতু আমার টাকার প্রয়োজন। অতএব, হে মা কালী তুমি আমাকে ধনীর অর্থে ভাগ বসাতে সাহায্য করো।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদগুলিতে আমি বলেছি যে—"সকল দেশের অপরাধীদের স্বভাবচরিত্র মূলতঃ এক হলেও দেশ বিশেষের সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-বিশ্বাস এবং আবহাওয়াও তাদের বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত করে।" এই বিশেষ সত্য উপরের শ্লোকটির শব্দবিন্যাস হতে বিশেষ রূপে প্রমাণিত হয়। অপরের কষ্টার্জ্জিত অর্থে ভাগ বসিয়ে কর্ম্মালস জীবন যাপন করার যে মনোবৃত্তি পৃথিবীর সকল অপরাধীদের মধ্যেই দেখে থাকি, সেই বিশেষ মনোবৃত্তির সন্ধান আমরা উপরের শ্লোকটীতে দেখতে পাই। ইয়ুরোপের ন্যায় বস্তুতান্ত্রিক দেশের অপরাধীদের মধ্যে যে আত্মনির্ভরতা আমরা দেখে থাকি শ্লোকটীর মধ্যে সেইরূপ আত্ম-বিশ্বাস ও আত্ম-নির্ভরতার বিশেষ অভাব দেখা যায়। শ্লোকটীর রচয়িতাকে এ বিষয়ে নিজের উপর পুরাপুরি বিশ্বাস না রেখে মা কালীকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করতে দেখি। ভগবৎ-বিশ্বাসী গ্রামবাসীদের সন্নিধানে বাস করার জন্যেও অবশ্য এইরূপ বিশ্বাস এদেশের কোনও কোনও অপরাধীদের মধ্যে এলেও আসতে পারে। শ্লোকটির মধ্যে একটি বিশেষ সত্য লক্ষ্য করবার আছে। অপরাধীরা "অপরাধ করা" তাদের একটা জন্মগত অধিকার বলে মনে করে। এই কারণে তারা উপরি উক্তরূপ মন্ত্রে সহজ ভাবে ঈশ্বরকেও তাদের সাহায্যের জন্য আহ্বান করে থাকে। যাহা হোক এই সকল মন্ত্র ও গান থেকে দেশ বিদেশের অপরাধীদের স্বভাব চরিত্রের সাদৃশ্য ও পার্থক্য সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। কলিকাতাবাসী একটী অপরাধীর রচিত দুইটী গান নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল। গীত দুইটী, দুইজন অপরাধী দ্বারা হাজত ঘরে গীত হতে শোনা গিয়েছিল।

"মাতোয়ালা নন্দ লালা, মেরি চোর বালা
আরে-এ, জানসে কা পরোয়া মে—
যব্ তক্ তু রহো হামেরা-আ।
মেরি পিয়ারা, মেরি পিয়ারা॥
খানা দানা রেইশ করনা ছোড়ত্ মে না যানা।
তু হামেরি তু হর হামা রঙমে তু, তু মে গানা॥
মেরি চোর বালা, মেরি মাতোয়ালা
নন্দলালা, মেরি হামেলা-আ।"

"দো জাড়া যাওত চলি, লোটত আওত মে।
তব তক্ তুহ না রহত উ বাত মে জানে-এ॥"

উপরের গান দুইটিতে অপরাধীদের অন্তর্স্বভাব পরিষ্কার রূপে পরিস্ফুট হয়েছে। সত্যকার অপরাধীরা বোঝে শুধু খাওয়া দাওয়া এবং স্ফূর্তি করা। সুরা এবং নারী থাকে তাদের নিত্য সঙ্গী। প্রথম গীতটীতে আমরা "হামেলা" রূপ একটী শব্দ পাই। হামেলা শব্দটীর প্রকৃত অর্থ "হুল্লোড় বা অর্গিস বলেই মনে হয়। স্বভাব, মধ্যম এবং উৎকট অভ্যাস অপরাধীরাই হুল্লোড় ভালবাসে। এই কারণে তারা স্বভাব এবং মধ্যম বেশ্যাদেরই পছন্দ করে বেশী, কারণ এই ধরণের বেশ্যারাও হুল্লোড় পছন্দ করে, সহ্যও করে। এই ধরণের অপরাধীরা যে কোনও নারীর নিকট একনিষ্ঠতা আশা করে না তা দ্বিতীয় গীতটীতে সম্যক রূপে বুঝা যায়। গীতটীতে স্পষ্টই বলে দেওয়া হয়েছে—"দু জাড়া (দু শীত) অর্থাৎ দু বছরের জন্যে আমার জেল (মেয়াদ) হয়েছে। জেল থেকে দু' বছর পর ফিরে যে তোমার আমি দেখতে পাব না, তা আমি ভাল রূপেই জানি। স্বভাব মধ্যম এবং শেষের দিকে (উৎকট) অভ্যাস-অপরাধীদেরও মতবাদ

কতকটা এই ধরণেরই হয়ে থাকে। এই সকল বিশেষ মতবাদ সর্ব্বদেশের উৎকট অপরাধীদের মূল মতবাদ। আদিম মানুষগোষ্ঠীর মতবাদও অনেকটা এই ধরণের হ'ত। মনের দিক থেকে আদিম মানুষের সঙ্গে অপরাধীদের বহুল পরিমাণে মিল থাকে। কারণ আধুনিক অপরাধীরা তাদের পিতৃপুরুষ আদিম মানুষের মনের উত্তরাধিকারী। এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদগুলিতে আলোচিত হয়েছে—এস্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

উপরের গান দুইটীতে হিন্দির সহিত কিছু কিছু বাংলারও সংমিশ্রণ দেখা যায়। এর কারণ সম্বন্ধে এইরূপ বলা যেতে পারে। আরবি এবং হিন্দির সংমিশ্রণে যেমনউর্দ্দূ ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি কোলকাতার বস্তিগুলিতে হিন্দি এবং বাংলার সংমিশ্রণে একটী বিশেষ ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণতঃ বড় বড় সহরের অপরাধীরা এইরূপ ভাষায় কথোপকথন করে। নমুনা স্বরূপ এইরূপ কয়েকটী বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

(১) আরে রহেন রহেন। হাপনার সে তবিয়েৎ আচ্ছা আছে ত? (২) হাপনি একটু লিচে দাঁড়িয়ে থাকেন, হামি উপরে খোবর ভেজিয়ে দিচ্ছি। (৩) আরে রহো, হামি ভি কেতনা থানাদার দেখিয়েছি। তুহর জানতো হামি আগে লিব, হামি সে জানসে মারিয়ে দেব। (৪) বড়-বাজারে সে নরিনবাবু আইয়েছে, হামি সে খবর ভেজিয়ে দিচ্ছি। (৫) কেন নেহি বাবুর কথা শুনছে, বাবুর কথা নেহি শুনবে ত ধরিয়ে নিয়ে যাবে, এমন মার মারবে যে মরিয়ে যাবে। (৬) তু শা, হেনে এয়েছিস, যা শা তোর মির্জাপুরের মোড়ে। (৭) কহত কা, কা কুরু, না মিলি—।

কোলকাতায় মিশ্রভাষা যেমন বাঙলা এবং হিন্দির সংমিশ্রণে তৈরী হয়, বোম্বের মিশ্র ভাষা তেমনি তৈরী হয় মারাঠা এবং হিন্দির সংমিশ্রণে। শিক্ষিত অপরাধীরা নিখিল ভারত বা অন্তঃপ্রাদেশিক অপকার্য্যে পরস্পরের সহিত ভাষার আদানপ্রদান করে ইংরাজীর সাহায্যে, এবং অশিক্ষিত ও

অল্প শিক্ষিত অপরাধীরা অনুরূপ কার্য্যের জন্য সাহায্য নেয় হিন্দির। এ হতে আন্তঃপ্রাদেশিক ক্ষেত্রে হিন্দীর উপযোগীতা এবং দাবী প্রমাণিত হয় বলে আমি মনে করি।

উপরে দ্বিতীয় গীতটীতে যে মতবাদ প্রচারিত হয়েছে, তা অপরাধী মাত্রেরই মর্ম্মকথা, কারণ ইয়ুরোপীয় অপরাধীরাও তাদের সাহিত্যের মধ্যে অনুরূপ মতবাদ প্রকাশ করে। নিম্নের পদ্যানুবাদটী এ বিষয়ে প্রণিধান যোগ্য। মিঃ ডেভিড নিউগেটে একটি হস্তলিখিত পুস্তক পান। পুস্তকটীতে কোনও এক অপরাধী শ্লোকটী তার প্রিয়তমার উদ্দেশে লিখে রেখেছিল। শ্লোকটীর ভাবার্থ মাত্র নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

> "ওগো-ও প্রিতেম লুসিগ্রে আমার," সাত বছরের তরে আমি চলিলাম তোমায় ছেড়ে। আর সকল মেয়েরা যেমন হয়ে থাকে, তুমি যদি হও তাদের মতই একজন মেয়ে, তা হলে হয়ত, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই, তুমি আমার জন্যে ফেলবে দীর্ঘনিশ্বাস, আর সেই সঙ্গে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রুর কণাও —এবং তারপর আমার বন্ধুদের মধ্যে থেকেই তুমি খুঁজে নেবে, আমার মত আর একজন আলফ্রেড গ্রেকে, এবং তাকে তুমি আপন করে নেবে, যেমন তুমি নিয়েছিলে আমাকে, কয় বৎসর আগে।" ইতি—

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোনও এক ভারতীয় অপরাধীর বাক্স তল্লাস করে একটী নোটবুক্ পাই। নোটবুকটীতে উর্দ্দু ভাষায় একটী কবিতা লেখা ছিল। কবিতাটীর সহিত উপরের শ্লোকটীর তুলনা করা চলে। উর্দ্দু শ্লোকটীর হুবহু ভাবার্থ নিয়ে তুলে দিলাম।

> "হাঁ আমি ফিরব এবং তোমার জন্যেই ফিরব। তিনটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে,—কিন্তু ফিরে এসে আমি কি

তোমায় দেখতে পাবে? হয়ত পাব, ফিরে এসে তোমায় আমি দেখতে পাব, কিন্তু তোমার খুঁজে পাব না। বুঝব এ পার্ব্বতী সে পার্ব্বতী নয়। আমি জানব আমার পার্ব্বতী গত হয়েছে, তিন বছর আগে, যেদিন আমার জেল হয়েছিল। তোমার ঐ দ্বিতল কুঠি হতে আমি ফিরে এসে তোমায় খূঁজতে যাব। খুঁজতে যাব সেই বস্তিতে। যেখানে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিলো। ইতি তোমারই—

সারা পৃথিবীতে অপরাধীরা নারীদের সম্বন্ধে নানা প্রকার উক্তি করে থাকে। কোনও এক ইটালিয়ান অপরাধী নারী সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ একটী উক্তি করেছিল। হ্যাভলক এলিস সাহেবের "অপরাধী" নামক পুস্তকের ২১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

"নারীজাতির ভালবাসা এবং ইজ্জত জ্ঞানে যারা আস্থাবান সেই সব বেচারা, হতভাগ্য পুরুষদের মূর্খ ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে।"

এই সকল উক্তি হতে একটী বিশেষ সত্য প্রমাণিত হয়। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমি বলেছি, নারীরা সাধারণতঃ চোর হয় না। নারীজাতি সাধারণ ভাবে চোর হলে চোরেরা তাদের সমব্যবসায়ী রূপে শ্রদ্ধা করত, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি এইরূপ শ্লেষোক্তি তা হলে তারা কখনও করত না।

নারীরাও এই সব শ্লেষোক্তির যথোচিত উত্তর দিয়ে থাকে। কোনও এক ঠগী অপরাধীর রক্ষিতার লেখা একটী পত্রের এক জায়গায় এইরূপ লেখা ছিল—"পুরুষের একনিষ্ঠার অপর নাম অনন্যপায়িতা।"

অপরাধী-সমাজের মেয়েরা এবং বিশেষ করে স্বভাব এবং মধ্যম বেশ্যারা অপরাধী পুরুষদের উক্তরূপ মনোবৃত্তি সম্বন্ধে সবিশেষ সচেতন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের অন্তর্নিহিত নারীত্ব মাঝে মাঝে তাদের ভালবেসে

গোল বাধায়। অপরাধী পুরুষদের উক্তরূপ মনোবৃত্তি সম্বন্ধে কোনও এক অপরাধী নারী নিম্নোক্ত রূপ একটী লিপিকা রচনা করে। হ্যাভলক এলিস সাহেবের 'অপরাধী' পুস্তক দ্রষ্টব্য। লেখিকা একজন ইটালিয়ান। লিপিকার বাঙলা তর্জ্জমা নিম্নে প্রকাশিত হল।

"আমাদের এই পৃথিবী ঝটিকাপীড়িত সমুদ্রের ন্যায়ই বিপদসঙ্কুল স্থান। নয় কি? মরীচিকা এবং হতাশা তাদের সমুদয় নিষ্ঠুরতা নিয়ে এখানে মানুষকে নিয়ত কষ্ট দেয়। দৈবাৎ যদি আমি কখনও একবার কিছুক্ষণের জন্য সুখ বা শান্তি পাই, তা হলে পর মুহূর্ত্তেই এই সুখ ও শান্তির মূল্য দিতে হয়—মূল্য দিতে হয় তিক্ত চোখের জলে। পুরুষের ভালবাসায় যেন কেহ কখনও বিশ্বাস না করে। তাদের কাছে প্রেম মানে সুযোগের সদ্ব্যবহার মাত্র। তোমার সম্মান, ধর্ম্ম, পরিবার, সুখ শান্তি এবং যৌবন তাদের জন্যে নিঃশেষে উৎসর্গ করেও তুমি তাদের ধরে রাখতে পারবে না—পুরুষ এমনিই এক প্রকার জীব। তোমার এই সকল অমূল্য দ্রব্যের বিনিময়ে তারা তোমায় দেবে অবহেলা এবং অবজ্ঞা। শুধু তাই নয় তারা খুঁজতে বের হবে, তোমারই সমুখ দিয়ে তোমার মত অপর আর একজন মূর্খা নারীকে। তোমার প্রতি ফিরে দেখার প্রয়োজনও তার আর তখন হবে না।

স্থানাভাবে, অপরাধ-সাহিত্যের বেশী নমুনা বর্ত্তমান পুস্তকে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। মৎসংগৃহীত বিবিধ দেশী বিদেশী অপরাধ-সাহিত্য এবং শিল্প ও চিত্র-কলা অপরাধ-বিজ্ঞানের একটী পৃথক খণ্ডে সন্নিবেশিত হবে। এক্ষণে কেবলমাত্র মনস্তত্ত্ব বুঝাইবার প্রয়োজনে কোনও এক বিদেশী যুবক অপরাধীর রচনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে বর্ত্তমান পরিচ্ছেদ শেষ করব। রচনাটী প্রশ্নোত্তর দ্বারা লিখিত, উহার সারাংশ মাত্র নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল

"কয়েদী জীবন দাসত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়,"—এ কথা অতীব মিথ্যা। "জেল জীবনকে সকল অবস্থাতেই দাসত্ব বলা যায় না।" "অন্যায় কার্য্যের জন্য কারারুদ্ধ হওয়ার একমাত্র অর্থ হচ্ছে দাসত্ব জীবন" এইরূপ ধারণা ভুল। ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজনের পক্ষে অপর আর একজনের আজ্ঞাধীন হতে বাধ্য হওয়াকে দাসত্ব বলা হয়। কিন্তু অপরের ইচ্ছাধীন না হয়েও, নিজেরই কোনও ইচ্ছা বা বৃত্তি বিশেষের ইচ্ছাধীন হতে যে মানুষ বাধ্য হয় তাকে তুমি কি বলবে? যে স্পৃহা বা ইচ্ছার উপর মানুষের নিজের কোনও হাত নেই, এইরূপ কোনও এক শক্তি বা স্পৃহার দ্বারা যে মানুষের প্রতিটি কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হয় সেই মানুষকে যদি আমরা অপরাধী বলি তাহলে অপরাধী মাত্রেই ক্রীতদাস, অপরের না হোক নিজের। অপরাধীরা দ্রব্য অপহরণ করে, "যে সকল দ্রব্য তারা পেতে ইচ্ছা করে সেই সকল দ্রব্য" সহজে পাবার জন্যে। অপরাধীদের মধ্যে কতকগুলি দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা আছে; যথা অলসতা, দ্রব্য-স্পৃহা ইত্যাদি। এইসব স্পৃহা উপশমের জন্য তারা চুরি করে। অর্থাৎ কি'না অপরাধীরা এই সকল স্পৃহা বা বৃত্তির ক্রীতদাস মাত্র। এই কারণে যারা অপরাধীদিগকে তাদের উক্তরূপ বৃত্তি বা ইচ্ছার অধীনতা থেকে মুক্ত করে, অর্থাৎ কি'না যারা অপরাধীদের চৌর্য্যাদি কার্য্য হতে নিরস্ত করে, তারা অপরাধীদের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে না, বরং তাদের দুর্দ্দমনীয় বৃত্তি বা স্পৃহার অধীনতা থেকে তারা তাদের মুক্ত করে দেয়। এই কারণে জেলে আবদ্ধ অপরাধীদের ক্রীতদাস বলা যায় ন', বরং স্বাধীন মানুষ বলা যায়। আমার মতে মানুষের সূক্ষ্ম বা উত্তম বৃত্তি সমুদয়ের, তাদের অধম বা স্থুল বৃত্তিগুলির উপর জয়যুক্ত হওয়ার নামই প্রকৃত স্বাধীনতা। মানুষ যখন তার ধারণা অনুযায়ী সর্ব্বাপেক্ষা সৎ বা উত্তম বৃত্তি দ্বারা তার প্রতিটী কার্য্য সর্ব্ব অবস্থাতেই নিয়ন্ত্রিত করে থাকে

তখনই তাকে প্রকৃত স্বাধীন বা মানুষ বলা যায়। সত্যকার সৎব্যক্তি মাত্রেই, তা সে জেলের ভিতরেই থাকুক বা বাইরেই থাকুক, সে একজন স্বাধীন মানুষ। যে সকল মানুষ উচিত ও সৎকার্য্যের জন্য ধন সম্পত্তি বা জীবন দান করে, এবং যে সকল ব্যক্তির কার্য্যাদি ভয় অনুসূয়া এবং স্থূল বৃত্তি-আদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—এই উভয় শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে তুমি কাকে স্বাধীন মানুষ বলবে? মনে রেখ, হস্ত পদ বদ্ধ অবস্থায় কবরের মধ্যে থেকেও মানুষ থাকতে পারে স্বাধীন, অপর দিকে সেই একই মানুষ রাজবেশে ভূষিত হয়ে, রাজপ্রাসাদে বাস করেও, ক্রীতদাসের মতই জীবন যাপন করতে পারে।”

উপরি উক্ত প্রশ্নোত্তরগুলি কথিত অপরাধীটি তার “অপরাধ-বিরাম” অবস্থাতেই লিখেছে মনে হয়, কারণ এইগুলির মধ্যে আমরা কিছুটা অনুতাপ, এবং কিছুটা সৎ প্রেরণারও সন্ধান পাই, এ ছাড়া অপরাধীটি যে একজন অভ্যাস-অপরাধী এইসব প্রশ্নোত্তর হতে এও বুঝা যায়। তবে এইরূপ আত্ম-বিশ্লেষণ অপরাধীরা (অপরাধ-বিরাম অবস্থাতেও) কদাচিৎ করে থাকে, এইরূপ আত্মবিশ্লেষণ অধিক সংখ্যায় লিপিবদ্ধ হলে, অপরাধ-বিজ্ঞানের অনেক দুরূহ সমস্যার সমাধান হত।

প্রকৃত অপরাধীদের নামগুলিও অদ্ভুতরূপ হয়ে থাকে। ঐ নামের মধ্যে একটু শিশুসুলভ ভাবও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে; যথা, কিষণিয়া, মদনিয়া, রুক্মিনীয়া, হনুমানিয়া, ইত্যাদি।

অপরাধ-দর্শন

অপরাধীদের নিজস্ব দর্শনের নাম অপরাধ দর্শন। বাক্-প্রয়োগ বা উপদেশাদির দ্বারা তাদের এই দর্শন যে ভুল তা প্রমাণ না করলে অপরাধীদের নিরপরাধী করা অসম্ভব। এই কারণে অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্রদের অপরাধ-দর্শন সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত।

অপরাধ-দর্শনের মধ্যে আমরা অনুতাপ ও লজ্জার অভাব এবং নৈতিক অসাড়তার আধিক্য দেখে থাকি। অপরাধীদের বিভিন্ন উক্তি হতে অপরাধ-দর্শন সংগৃহীত হয়েছে। অপরাধীরা সাধারণতঃ অপরাধসমূহ অস্বীকার করে, কিংবা নানা যুক্তিতর্ক দ্বারা তাদের অপকর্ম্ম সমূহকে সমর্থন করে। অপরাধ তাদের কাছে থাকে একটা অধিকারের সামিল। প্রকৃত অপরাধীদের দর্শন এইরূপই হয়ে থাকে। অপরদিকে সমাজ বা রাষ্ট্র তাকে তার অপকর্ম্মের জন্য শাস্তি দিলেও সে দুঃখিত হয় না। তার মতে তার যেমন চুরি করবার অধিকার আছে গৃহস্থেরও তেমনি এই চুরির জন্য তাকে শাস্তি দিবার অধিকার আছে—অবশ্য যদি তাকে সে ধরে ফেলতে সক্ষম হয়। এ বিষয়ে তাদের মনোবৃত্তি যুদ্ধরত সৈনিকদের মতই হয়ে থাকে। উভয়পক্ষীয় সৈন্যরা, কেহ কাহারও উপর বিরাগ রাখে না, কিন্তু তবুও তারা জীবনপণ করে, কারণ যুদ্ধ যুদ্ধমাত্র। অপরাধীদের মতে নিজেদের দলের লোকের প্রতি কোনওরূপ অপরাধ করলে, মাত্র তা অপরাধের পর্য্যায় পড়ে, কিন্তু এই অপরাধ ধনী গৃহস্থদের বিরুদ্ধে করলে তা অপরাধ হয় না।

অপরাধীদের এই বিশেষ মনোবৃত্তির প্রমাণস্বরূপ নিম্নে অপরাধীদের বিবিধ উক্তি এবং লিখন সমূহ উদ্ধৃত করা হল।

"বুদ্ধিভ্রংশের জন্যেই আমরা ধরা পড়ি। অপর সকলের মত আমিও

একজন নির্ব্বোধ, তাই আমাকেও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতে হ'য়েছে।"—উক্তিটী কোনও এক ইয়ুরোপীয় অপরাধী কারাগৃহের গাত্রে লিখে রেখেছিল। "আমি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ হই, ঈশ্বরের যদি ইহা অভিপ্রেত হত, তা হলে তিনি আমাকে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষই করতেন।" গোদে সাহেবের এই উক্তির অনুরূপ উক্তি অপরাধ-দর্শনের মধ্যেও দেখা যায়। কোনও এক অপরাধী লম্ব্রোসো সাহেবকে বলেছিল, যে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে অপরাধ-স্পৃহা দিয়েছেন। সেই ঈশ্বরই আমাদের হাজতে পুরবার অধিকার গৃহস্থদের দিয়েছেন, এজন্য দুঃখ করবার কি আছে।" কোনও এক ফরাসী ডাকাত ফাঁসীমঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে এইরূপ উক্তি করে—"আমি একজন নির্দ্দোষ, কারণ আমি কখনও গরীবের দ্রব্য অপহরণ করিনি। আমি কেবল ধনীর বাড়তি সম্পদের ভাগ নিয়েছি মাত্র। ডাকাতের উপর ডাকাত এই ধনীদের দ্রব্য অপহরণের মধ্যে আমি কোনরূপ দোষ দেখিনি।" অপর আর এক অপরাধী ফাঁসীর সময় বলে উঠে, "আমরা গরীব অসহায় অপরাধী তাই আমাদের ফাঁসী হবে, কিন্তু যে সব নেতারা অন্য দিক দিয়ে আমাদের চেয়েও বড় অপরাধী তাদের ফাঁসী দেবে কে?" "আইন গরীবের জন্য ধনীর জন্য নয়" কোনও এক ইংরাজ অপরাধী পাঁচিলের গায়ে এই বাক্যটি লিখে রেখেছিল। নিম্নে অপরাধীদের আরও কয়েকটী লিখন ও উক্তি উদ্ধৃত করা হল। বলা বাহুল্য এদের সব কয়জন অপরাধীই ইয়ুরোপীয়। "আইনজীবী এবং ব্যবসায়ীরা যে রীতিতে গরীব মূর্খ ব্যক্তিদের অর্থাদি অপহরণ করে আমরা জনসাধারণের সর্ব্বনাশ সেই রীতিতে করি না, এইজন্যই কি আমরা অপরাধী?" জগতের ¾ অংশ পুণ্য কাজ প্রকারান্তরে ভীরুতা সূচক পাপকাজ ছাড়া আর কিছুই নয়।" "বাক্‌চাতুর্য্য সহকারে উপকারের ভাণ করে অপরের অপকার করা অপেক্ষা সোজাসুজি তাকে আঘাত

হানার মধ্যে ঢের বেশী পুণ্য আছে", "আমি আমার অপকার্যের জন্য গর্ব্ব অনুভব করি, কারণ আমি কখনও সামান্য অর্থের জন্য চুরি করি না।" পৃথিবীতে দুই প্রকারের সুবিচার আছে ; যথা, স্বভাব-সুবিচার এবং কৃত্রিম-সুবিচার। ধনীর অর্থ অপহরণ করে যদি কেউ দরিদ্র পড়শীদের খাদ্য সংস্থান করে দেয়, যেমন আমি করে থাকি, তাহলে তাকে বলা যায় স্বভাব-সুবিচার! অপরদিকে যে সুবিচার আইনদ্বারা ধনীর অর্থ এমন ভাবে রক্ষা করে যাতে কিনা তা দরিদ্রেরা না পেতে পারে, তাকে আমি বলি কৃত্রিম-সুবিচার। কোনও এক ইতালীয় কারাগার হতে লমব্রোসো সাহেব নিম্নোক্ত রূপ লিপিকাটী সংগ্রহ করেছিলেন।—"মাত্র অর্দ্ধ ডজন ডিম চুরির জন্যে আমার মেয়াদ হ'ল, অথচ দেশের মন্ত্রীরা প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অপহরণ করেও সাধু রইলেন, হায়রে দুর্ভাগা ইতালী।" কোনও এক ডাকাত সর্দ্দার বিচারকদের উদ্দেশ্যে এইরূপ একটী দম্ভোক্তি করে— "পৃথিবীতে আমাদেরও প্রয়োজন আছে। ঈশ্বর আমাদের পাঠিয়েছেন লোভী ধনীসম্প্রদায়কে শাস্তি দেবার জন্যে। আমরা ঈশ্বর প্রেরিত দূতমাত্র। এ ছাড়া, আমরা না থাকলে, জজ সাহেবরাই বা কিরূপে দিন গুজরান করতেন।" সারডিনিয়ার অপরাধী-সমাজে নিম্নোক্তরূপ একটী গীত গীত হয়ে থাকে। গীতটীর ভাবার্থমাত্র নিম্নে তুলে দিলাম। গীতটীতে রচয়িতা তার অন্তর্নিহিত কর্ম্মালসতাকে সমর্থন করে, সাফাই গেয়েছেন মাত্র!

"আমার যদি খাদ্য না থাকে তা হলে কি আমি অপরের খাদ্য হতে কিছুটা নিতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি। যদি তোমার খাদ্যের অভাব ঘটে, এবং তুমি যদি সেই খাদ্য আয়ত্তের মধ্যে পেয়েও অপহরণ না কর তা হলে তুমি একজন বোকা।" "প্রয়োজনের সময়, প্রত্যেক জিনিসই প্রত্যেকের"—এই বিশেষ সত্যটী অনুধাবন কর এবং সুখী হও। "ধর্ম্ম, আইন, দেশপ্রেম এবং দৈহিক রোগ সমূহই মানুষের একমাত্র শত্রু।

অপকর্ম্ম বা চুরি মানুষের শত্রু নয়, বরং সেটা একটী সম্মানজনক ব্যবসায়। ধর্ম্ম মানুষের স্বাধীন চিন্তা এবং স্বাধীন আত্মাকে অপহরণ করে এবং সামাজিক রীতিনীতি মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা বা স্পৃহাকে দমন করে মানুষকে অমানুষ করে তুলে। দেশপ্রেমকে আদর্শের ক্ষেত্রে পুতুল পূজা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না; এই দেশপ্রেমের নামে ভণ্ড ও স্বার্থসিদ্ধ রাষ্ট্রনায়কেরা পৃথিবীশুদ্ধ মানুষের সর্ব্বনাশ করে মাত্র, "অপকর্ম্ম বা চুরি দ্বারা মানুষ কখনও কি উক্তরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? কক্ষন হয়নি, বরং এই চুরি বা অপকর্ম্ম ধনসম্পদ বণ্টন করে সমাজের উপকারই করে থাকে।" "যে দেশে চোরের সংখ্যা কম থাকে, সেই দেশকে সুশাসিত দেশ বলা যেতে পারে। দেশের অভাব ও দারিদ্র্য যে পরিমাণে কমে যাবে, সেই পরিমাণে দেশে চোরের সংখ্যাও কমবে"—কোনও এক অভ্যাস-অপরাধী লমব্রোসের কাছে এইরূপ এক উক্তি করেছিল। অপর আর এক অপরাধী তাঁর কাছে এইরূপ আর একটী উক্তি করে। উক্তিটির মাত্র কিছুটা অংশ উদ্ধৃতি করা হল। "বিদ্যাবুদ্ধি এবং সাধুতা মানুষের উপকারে আসে না, উপকারে আসে মাত্র অসাধুতা, তা না হলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা কাজ করে, তারা এত কষ্ট পায় কেন?"

নিম্নে অপরাধীদের দ্বারা লিখিত আরও কয়েকটী উক্তি তুলে দেওয়া হল।

"আমাদের চৌর্য্য-ব্যবসায়ের জন্য আমরা কারো উপর নির্ভরশীল নই। আমাদের অভিজ্ঞতা ও শক্তি অনুযায়ী আমরা ফলভোগ করি মাত্র আমি জানি কালই এজন্য আমার জেল হতে পারে। প্যারীনগরীর ১৮,০০০ চোরেদের এক দশম অংশকেও তোমরা জেলে পাঠাতে পারনি। আমরা দশ বছরের মধ্যে মাত্র এক বছর জেল খাটি এবং নয় বছর বাইরে থেকে জীবন উপভোগ করি। শ্রমিকদের মত আমরা বেকার জীবন

অতিবাহিত কিংবা দ্রব্যাদি বন্ধক দিয়ে আহার সংগ্রহ করি না। আমরা একমাত্র পৃথিবীতে চিন্তাহীন দ্বিধাহীন মুক্ত এবং স্বাধীন মানুষ।"

"আমরা গ্রেপ্তারের সময় ভীত বা দুঃখিত হই না, বরং নিশ্চিন্ত হই। বাইরে থাকাকালীন যাদের দ্রব্যাদি আমরা অপহরণ করতাম, তাদের উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারাই জেলে থাকাকালীন আমাদের ভরণপোষণ সামাধিত হয়, যারা আমাদের জেলে পাঠায়, বাহিরে বা ভিতরে তারাই আমাদের ভরণপোষণ করে।" জেলে থাকাকালীন পরবর্ত্তীকালের জন্য অপকর্ম্মের নূতন নূতন পরিকল্পনা আমরা নিশ্চিত মনে উদ্ভাবন করতে পারি, এ ছাড়া পাকাপোক্ত অপরাধীদের সহিত মিশবার সুযোগও এইখানে আমরা পেয়ে থাকি, এদের কাছ হতে আমরা এই সময়ে অপকর্ম্মের নূতন নূতন কায়দা-কানুনও শিখে নিই। এই জন্য মাঝে মাঝে আমরা ইচ্ছা করেও জেলে এসে থাকি। অপরাধীদের কাছে জেল একটী বিরাট বিদ্যা-পীঠ বা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

"যে সকল নারী দেহ বিক্রয় করে অর্থসংগ্রহ করে, তাদের আমরা বেশ্যা বলি। কিন্তু যারা অর্থের জন্য মস্তিষ্ক, বাহু ও সামর্থ্য বিক্রয় করে তাদের আমরা কি বলব? এক দিক দিয়ে শ্রমিক, চাকুরে প্রভৃতির সহিত এই বেশ্যা নারীদের কোনও প্রভেদ নেই। আমরা এই বেশ্যাবৃত্তি পছন্দ করি না, তাই আমরা চাকুরীকে ঘৃণা করি। চুরিই একমাত্র সম্মানজনক পেশা। সম্মানজনক ভাবে অর্থোপার্জ্জন করার জন্যই আমরা অপকর্ম্ম করি। আমরা সাধারণতঃ ধনীর অর্থ অপহরণ করে থাকি, দৈবাৎ কখনও দরিদ্রের অর্থ অপহরণ করলে তার জন্যে আমরা গর্ব্ব অনুভব করি না—কারণ আমরাও গরীব, গরীবের দুঃখ আমরা বুঝি। আমরা জেলের ভয় করি না, কিন্তু "জীবন-কয়েদ"কে ভয় করি, জীবন-কয়েদের তুলনায় আমরা প্রাণদণ্ডই কামনা করে থাকি।

এইবার এদেশীয় অপরাধীদের কয়েকটী উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাক, উক্তি কয়টী পাগলা হত্যার মামলা শীর্ষক প্রবন্ধ হতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কলিকাতা পুলিশ জার্ণেল vol I. part I দ্রষ্টব্য।

"ঈশ্বরের কৃপায় বিনা রক্তপাতে দেওঘরের একটী রাস্তায় খাঁদাকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হই। হঠাৎ পুলিশের সঙ্গে তার রাস্তায় দেখা হয়ে যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই সময় উভয় পক্ষের কাছেই আগ্নেয় অস্ত্র ছিল না। খুন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে সব কিছুই প্রথমে অস্বীকার করে, কিন্তু পরে কথঞ্চিৎ শান্ত হয়ে উত্তর দেয়, বুঝতেই ত পারছেন সব। তবে কি জানেন আপনারা বাপের ব্যাটা কিংবা আমি বাপের ব্যাটা তা প্রমাণ হল না, এই যা। যাক্ যা হবার তা ত হয়ে গেছে, এখন একটা বিড়ি ত খাওয়ান।" আমরা খাঁদাকে তার অনুরোধ মত একটা সিগারেট দিই। এই সময় খাঁদাকে বেশ প্রফুল্ল চিত্ত দেখা যায়। তার কাছ থেকে, এই সুযোগে আমি কথা বার করবার চেষ্টা করি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, "হ্যাঁরে, একটা লোককে যে জল-জ্যান্ত তুই মেরে ফেললি তোর একটু ভয় বা মায়া হ'ল না। জানিস ওপরে একজন ঈশ্বর আছেন।"—"ঈশ্বরের কথা বলছেন, জানি না তিনি আছেন কি না। যদি থাকেন তাহলে আমার ঈশ্বর এবং আপনার ঈশ্বর আলাহিদা (আলাদা) ব্যক্তি। ঈশ্বর মানুষেরই গড়া একটি বস্তু বা ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই না। আপনি যখন একটা ইঁদুর মারেন তখন কি আপনি ঈশ্বরের কথা চিন্তা করেন? এই পাগলা আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছিল, সে আমার মনের শান্তি ত অপহরণ করেই ছিল, তা ছাড়া সে আমার মলিনাকেও সরাতে চেয়েছিল। এক পৃথিবীতে আমাদের উভয়ের স্থান হওয়া অসম্ভব দেখা যায়। তাকে হত্যা করার জন্যে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। অন্যথায়

সেও যদি আমাকে এজন্য হত্যা করত—বা হত্যা করতে পারত তাহলে এজন্যও আমি দুঃখিত হতাম না। কারণ বাঁচবার অধিকার কেবল-মাত্র শক্তিমানদেরই আছে, তা ছাড়া জীবনটা একটা মটোরকার মাত্র, পেট্রোল ফুরিয়ে গেলেই জীবন অচল হয়। মৃত্যু বা মরণ মেকানিকেল ষ্টপেজ অব্ হার্ট মাত্র, "এপারেও কিছু নেই ওপারেও না।" এর পর খাঁদা উচ্চহাস্য করে উঠে। অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করি, হাসছিস তুই, ভয় করছে না তোর, কালই যে তোর ফাঁসী হতে পারে।" উত্তরে খাঁদা বলে, "ভয়? মরতে? ভয় করবে কেন? আমি মরব আর সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সঙ্গে মিশিয়ে যাব, এতে ভয়ের কি আছে?" আমি পুনরায় প্রশ্ন করি, "বলিস কিরে, কি এমন পুণ্য করেছিস, যে তুই মরার সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরের সঙ্গে মিশিয়ে যাবি!" আমার প্রশ্নে খাঁদা বিব্রত বা বিচলিত হল না। বরং স্মিতহাস্যেই সে উত্তর দেয়, "দেখুন আমি আত্মাকে কখনও কষ্ট দিই নি, লাইফের ইঞ্চি বাই ইঞ্চি আমি ভোগ করেছি। মন যা চেয়েছে আমি তা তাকে দিইছি, তাই মরতে আজ আমার ভয় নেই, দুঃখও নেই। কিন্তু আপনারা যখন মরবেন, কষ্টের মধ্যেই মরবেন, মনে হবে, এটা হল না, ওটা করলাম না, অনেক অতৃপ্ত বাসনা নিয়েই আপনারা মরবেন, হয়ত এজন্য আবার আপনাদের জন্মাতে হবে।" এরপর হঠাৎ খাঁদার চোখ সজল হয়ে উঠে। একটু চুপ করে থেকে সে উত্তর দেয়, "দেখুন একটা আমি অন্যায় কাজ করে ফেলেছি, তার জন্যে যদি আবার আমায় জন্মাতে হয়। আমি চন্দন-নগরে একটা বিয়ে করে ফেলেছি, তবে শালীকে হাজার পঞ্চাশেক টাকা দিয়ে এসেছি—আর বলে এসেছি, দেখ শালী, আমি যখন মরব, তুই তখন ওই টাকা নিয়ে এন্তার ফুর্ত্তি করবি, আর মদ খাবি। সে শালী যদি আমার কথা মত কাজ করে তাহলে আমার আত্মা স্বর্গে

চলে যাবে, কিন্তু সে শালী যদি হিঁদুর বিধবার মত তুলসী পাতার রস দিয়ে ভাত খায় এবং নিরামিষ খেতে থাকে, কিংবা উপসী ছারপোকার মত একাদশী করে তাহলে আমার আত্মা শান্তি পাবে না।" খাঁদার এই পত্নী-প্রীতি আমাকে মুগ্ধ করে, এই প্রীতির মধ্যে পত্নীপরায়ণা বা একনিষ্ঠা নেই, কিন্তু পত্নী-প্রীতি আছে। অর্থাৎ ভক্তি নেই, কিন্তু প্রীতি আছে। এরপর আমি মলিনার কথা তুলি। উত্তরে খাঁদা বলে, "দেখুন চোরেরা মরে মেয়েদের ভালবেসে, আর মেয়েরা মরে চোরেদের বিশ্বাস করে। ওর আর দোষ কি, দোষ আমার। এরপর খাঁদার সহিত নানা বিষয়ে আমি আলোচনা করি। কথোপকথনের মধ্যে খাঁদা আমাকে এইরূপ উপদেশ দেয়—"দেখুন লোকে বেশী ছেলে-পুলে হলে ভয় পায়, কিন্তু কেন? আমি বুঝতে পারি না, এতে ভয়ের কি আছে। আমার মতে, মাত্র একটী ছেলেকে মানুষ করা উচিত, বাকীগুলোকে একখানা ছুরি আর চার আনা পয়সা হাতে দিয়ে, "যা লুটে খেগে যা," বলে অভিভাবকদের তাড়িয়ে দেওয়া উচিত, কিংবা তাদের গাঁয়ে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত লাঙ্গল চষবার জন্যে। বাঙ্গলাদেশে বামুন কায়েতদের মধ্যে লাঙ্গল ধরা চাষী নেই, তারা পরগাছার (প্যারাসাইটের) মত জীবন যাপন করে, এ বড় লজ্জার কথা। হোক না কেন দশটা বা বারোটা ছেলে-পুলে, তাদের মধ্যে একটা বা দু'টা লেখা পড়া করুক, বাকীগুলো ছেলেবেলা থেকে চাষীদের সঙ্গে বাস করে সৃষ্টি করুক বামুন, বৈদ্য ও কায়েত চাষী। একটার বেশী ছেলে যারা মানুষ করতে চায় তারা কোনটাকেই মানুষ করতে পারে না।" এই ধরণের অপরাধ-দর্শন অপরাধীদের অব্যবস্থা-চিত্ততার পরিচয় দেয়।

কোনও এক দুর্দান্ত ভারতীয় শোণিতাত্মক অপরাধীকে আমি নানারূপ জিজ্ঞাসাবাদ করি। অপরাধীটি শিক্ষিত থাকায় তার মধ্যে

আদর্শ মিশ্রিত নৈতিক অসাড়তা ছিল। নিম্নের উক্তিটী এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। অপরাধীটিকে তার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করায় সে অবিচলিতভাবে উত্তর দেয়, "আমার মা যাঁর নামও জানেন না তাঁকে আমি কোথায় পাব? কিন্তু এজন্য দুঃখিত নই। বরং এজন্য আমি গর্ব্ব অনুভব করি। আমি একজন ভারতীয় টমিই। দেশের টমিরাই দেশকে বড় করে সাম্রাজ্য গড়ে দেয়। আমাদের মত টমিরাই রাষ্ট্রের জন্য বেপরোয়াভাবে জীবন দিতে পারে, আপনাদের মত ভদ্র সন্তান ভাল অফিসার হ'তে পারেন কিন্তু আমাদের মত লড়াকু হতে পারেন না। আমার মতে, যারা এফোর্ড করতে পারেন তাঁদের উচিত একজন করে ডুপ্লিকেট রাখা, অরিজিনাল সাইডের ছেলেরা হবে অফিসার এবং ডুপ্লিকেট সাইডের ছেলেরা হবে প্রাইভেট—বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে, যেখানে জলবায়ু অনুকূল নয়। এদেশে আর্টিফিসিয়ালি সৈন্য তৈরী করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমার মত ঘর ছাড়া টমিদের মানুষ করা উচিত ষ্টেট্কে, সেনা-বাহিনীর জন্যে; এতদ্বারা দেশের প্রভূত উপকার হবে এবং চুরি ডাকাতিও বন্ধ হবে।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ অপর আর এক আদর্শ-মিশ্রিত নৈতিক অসাড়তার কথা বলা যাক। কোনও এক মোসলেম অপরাধী হিন্দুর নাম নিয়ে অপরাধ করে, ধরা পড়ার পর এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে সে এরূপ উত্তর দেয়, "আপনারা শিক্ষিত হয়ে এই সব প্রশ্ন তুলেন কেন? আমরা জাতিতে হিন্দুই, মাত্র ধর্ম্মে মুসলমান। সাতশ বছর পূর্ব্বে পাঠানরা যখন ভারত আক্রমণ করে তখন আমাদের উভয়েরই হিন্দু পূর্ব্বপুরুষ কি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেশ রক্ষা করে নি। আমি মোসলেম হওয়ার জন্যে গর্ব্ব অনুভব করি, কারণ মোসলেম ধর্ম্ম সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ করেছে। ঠিক যেমনি করে বৌদ্ধধর্ম্ম সমৃদ্ধ করেছে চীন দেশকে। এই ধর্ম্ম দ্বারা হিন্দু মোসলেম সমভাবেই লাভবান হয়েছেন।"

উপরের এই উক্তিটির মধ্যে আমরা লেশমাত্রও নৈতিক অসাড়তা পাই না, বরং পুরাপুরি আদর্শের সন্ধান পাই। অপরাধ-বিরামের সময়, অপরাধীরা উচ্চ ধরণের সাহিত্যের ন্যায় উচ্চাঙ্গের দর্শনও সৃষ্টি করে থাকে।

অযৌনজ অপরাধীদের ন্যায় যৌনজ অপরাধীদের উক্তির মধ্যেও নানা রূপ অপরাধ-দর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জনৈক নিক্রিয়-অযৌনজ অপরাধীর কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত হল। উক্তিগুলির মধ্যে আমরা নৈতিক অসাড়তার সন্ধান পাই।

সমাজে কতকগুলি বখা মেয়ে থাকলে, তাদের ধরে রাখবার জন্যে কতকগুলি বখা ছেলেরও প্রয়োজন আছে।" আমি যদি মেয়েটীর সহিত ভাব না করি তা হলেও কি সে সতী সাধ্বী থাকবে, কখ্খনও তা সে থাকবে না, সে তখন অপর আর একটী ছেলের সহিত ভাব করবে, নিজেকে বঞ্চিত করে অপর আর একটী ছেলের সুযোগ আমি করে দিই নি! এই জন্যেই কি আমি অপরাধী।"—"উপবাসী রেখ না দেহেরে, দেহকেতো উপবাসী রাখবেই না, এমন কি তার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তার প্রত্যেকটী কোষ অণুকোষও যা আহার চায় তাদের তাই দেওয়া উচিত, আমার অন্তরাত্মা আমাকে বার বার এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা জীবন ধর্ম্মী, যে মুহূর্ত্তটী তুমি উপভোগ করবে না সেই মুহূর্ত্তেই তা তোমার নিকট হারিয়ে যাবে। জীবনকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ না করে আমরা মরতে চাই নি, এই জন্যেই কি আমরা ঘৃণ্য—" "কি করব বলুন, আমি ত আমার মনটাকে গলা টিপে মেরে তথাকথিত ভাবে সৎ বা সাধু থাকতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তখন আমি জানতাম না, যে মনের তলায় অপর আর একটা মন আছে যাকে কিনা বলে অবচেতন মন, এবং উপরের মনকে দাবাতে পারলেও অবচেতন

মনকে দাবান অসম্ভব। শেষে নাচার হয়ে মন যা চায় আমি তাই তাকে দিতে থাকি।" "আজ যদি আমার জীবন-যৌবন চলে যায়, আপনি কি তা আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন? সে ক্ষমতা কি আপনার আছে? আপনার আজ যা গেছে তা কি আর ফিরবে?"

কোনও এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "তুমি যে তাকে এমনি করে ফাঁকি দিলে, এতে কি তোমার ভাল হবে?" উত্তরে ভদ্রলোক বলেন, "কেন? উভয়েই ত আমরা ঈশ্বরের জীব। সে না ভোগ করে, না হয় আমিই ভোগ করলাম।"

কোনও এক বিবাহিত কন্যা দুই বৎসর বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করে অবশেষে তার পূর্ব্ব প্রেমাস্পদের কাছে ফিরে আসে। এই অপকার্য্যের জন্য তাকে পাপীয়সী বলে সম্বোধন করায় সে এইরূপ উক্তি করে। ইহা অপরাধ-দর্শনের একটী চূড়ান্ত নিদর্শন।

"এত দিন আমি পাপ করে এসেছি, কারণ আমি দেহকে দিয়েছি একজনকে, কিন্তু মন দিয়েছি অপর জনকে। আজ আমি দেহ ও মন উভয়ই মাত্র একজনকে দিচ্ছি, তাই আমি আর পাপ করছি না। ভালবাসায় পাপ নেই, পুণ্য আছে এবং উহা জীবমাত্রেরই জন্মগত অধিকার।

প্রত্যেক কর্ম্মক্ষম পুরুষমাত্রেরই প্রতি দশ বৎসর অন্তর একটী করে পত্নী সংগ্রহ করা উচিত; তা না হলে তার দেহ ও মন সুস্থ থাকতে পারে না। আধুনিক সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থা একাধিক বিবাহের পক্ষপাতী নয়, এই কারণে অধুনাকালে অন্য উপায়ে আমরা আত্মাকে পরিতৃপ্ত করি। এর দ্বারা আমরা দেহ ও মনকে সুস্থ রাখি, এবং মেধাশক্তিও আমাদের এর দ্বারা অক্ষুণ্ণ থাকে—এই কারণে অপর দিক দিয়ে আমরা সমাজের ও দেশের বহুবিধ উপকার করতে সক্ষম হয়ে থাকি, যা কি'না মনের দিক থেকে উপবাসী ব্যক্তিরা কদাচ পারে না।"

বলাবাহুল্য এই ধরণের উক্তি সকল মানুষের বিকৃত মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। ভুল পথে চিন্তাধারা প্রবাহিত হওয়ার জন্যেই এরূপ হয়ে থাকে। এই সকল উক্তিগুলির মধ্যে সম্ভবতই কোনওরূপ বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত নেই।

অপস্পৃহা মানুষ মাত্রেরই মধ্যে বিদ্যমান—পুস্তকের প্রতিটি পরিচ্ছেদে ইহা বিশেষরূপে বুঝান হয়েছে। কিন্তু এই অপস্পৃহা হতে মানুষ কি কোনদিনই মুক্ত হতে পারবে না? প্রশ্নটী আমি এক সাধক বন্ধুর নিকট উত্থাপন করি। উত্তরে সাধক বন্ধুটী এইরূপ বলেন, "এক মাত্র প্রেম দ্বারাই এ সম্ভব।" তিনি বলেন, বিজ্ঞান যেখানে নিরুত্তর সেইখানে আরম্ভ হয় দর্শন। দর্শন যখন মানুষের প্রতিটী প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হয়, মানুষের মন তখন ছুটে চলে অনাদৃত ধর্ম্মের দিকে। ধর্ম্ম যেখানে নিরুত্তর হয়, সেইখানে আরম্ভ হয় প্রেম। কিন্তু এও অভ্যাস সাপেক্ষ। এজন্য বহু পুরুষের সাধনারও প্রয়োজন। প্রথমে ভালবাসতে হবে নিজেকে, তারপর ভালবাসতে হবে পরিজনবর্গ, দেশবাসী তথা বিশ্ববাসীকে। এরপর ভালবাসতে হবে জীবজন্তু, কীট পতঙ্গ ও বৃক্ষাদিকে এমন কি পাহাড় পর্ব্বত, চেয়ার টেবিলকেও"—কিন্তু এ'ও কি সম্ভব? পৃথিবীতে আমি দেখেছি অনাচার অবিচার, আমি দেখেছি উপকারী বন্ধুর লালসাদৃষ্টি, আমি দেখেছি পদস্থ ব্যক্তির যৌনজ ও অযৌনজ ব্যভিচার, আমি দেখেছি নৈতিক অসাড়তার নির্লজ্জ অভিব্যক্তি; কিন্তু আমি দেখিনি স্বার্থহীন কামনাহীন প্রেম। স্বার্থহীন কামনাহীন প্রেম? এ পৃথিবীতে কি তা আছে?

কিন্তু একটী বিষয় মনে রাখা উচিত, এ পৃথিবীতে হারায়নাক কিছু পৃথিবীতে অপরাধীদেরও প্রয়োজন আছে। তথাকথিত মহামানবেরা সমাজের কোনও ক্ষতিও করে না, উপকারও না। কিন্তু অপরাধীরা

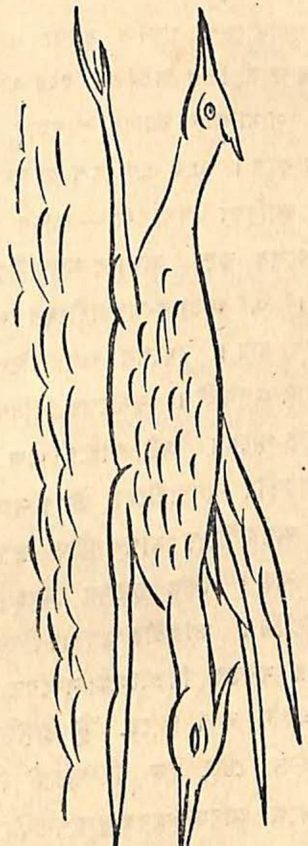
সমাজের অপকার করে। এই কারণে অপরাধীদের সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বদাই সচেতন থাকি। নিরাবিল শান্তি কখনও কাম্য হতে পারে না, কিছুটা বিঘ্ন বাধা না থাকলে মানুষ অলস প্রকৃতির হয়—এইদিক থেকে এরা শান্তিপ্রিয় পৃথিবীর উপকারই করে। মনস্তত্বের ছাত্র মাত্রেরই জানা আছে সামান্যরূপ বিঘ্ন না থাকলে মানুষ একাগ্রচিত্ত হতে পারে না। নিঃসাড় নিস্তব্ধতার (পিনড্রপ সাইলেন্স) মধ্যে একাগ্রচিত্ত হওয়া যায় না। এই দিক দিয়ে অপরাধীরা মানুষের উপকারই করে থাকে—বিশেষ করে শান্তির সময়ে। অন্তঃশত্রুরূপে এরা মানুষকে কর্ম্মঠ রেখে তাকে সভ্যতার পথে এগিয়ে দেয়। ঈশ্বর কাউকে নিরাবিল অপকারের জন্য সৃষ্টি করেন নি। বিষ থেকেই অমৃত তৈরী হয়, স্বল্প মাত্রায় ব্যবহার করলে বিষও হয়ে উঠে ঔষধ। তবে সমাজ তথা পৃথিবীর উপকারের জন্য এদের সংখ্যা আরও কমান দরকার।

তবে চিরকাল কেউ অপরাধী থাকে না। সৎপ্রেরণার ক্রমাবির্ভাবে সে পুনরায় নিরপরাধী হয় বা হতে পারে। অত্যাচারী দস্যুসর্দ্দার বাহুবলে যদি স্থান বিশেষে পূর্ণ অধিকার বিস্তার করতে পারে তাহলে প্রায়ই দেখা যায় যে সে সময় সময় তাঁবেদার ব্যক্তিদের উপর নিজে অত্যাচার করলেও অপর কোনও ব্যক্তিকে তাদের উপর অত্যাচার করতে দিতে নারাজ থাকে। কিন্তু পরে এইরূপ কাজের দ্বারা ধীরে ধীরে সে সৎ প্রেরণা লাভ করে এবং পরিশেষে সে নিজেও তাদের উপর আর অত্যাচার করে না—সে তখন হয়ে উঠে প্রজাপালক রাজা বা সৎ জমিদার। সৎপ্রেরণার ক্রমাবির্ভাবের এ একটী বড় প্রমাণ। ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

অপরাধ-শিল্প

অপরাধ-শিল্প এবং অপরাধ-চিত্র অপরাধ-বিজ্ঞানের একটী উল্লেখযোগ্য পরিচ্ছেদ। অপরাধীদের বুদ্ধি-প্রেরণা শীর্ষক পরিচ্ছেদে পকেটমাররা বোতল ভাঙ্গা কাঁচের সাহায্যে কিরূপ সুন্দরভাবে ছুরী বা খুর তৈয়ারী করে, সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, বস্তুতঃ হাউস-ব্রেকিঙ ইন্‌স্‌ট্রুমেণ্ট বা ভাঙন যন্ত্রপাতিগুলির নির্ম্মাণ কৌশলের মধ্যে এরা অত্যদ্ভুদরূপ শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দেয়। অপরাধীদের তালা বা সিন্ধুক ভাঙা যন্ত্রপাতিগুলি সম্বন্ধে পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষরূপে আলোচিত হবে। কোনও এক কর্ম্মকার অভ্যাসের দ্বারা অপরাধী হয়ে উঠে। অপরাধ-বিরামের সময় তার এ জন্য প্রায়ই অনুতাপ আসত। এই অবস্থায় গৃহস্থদের উপকারের জন্য সে এমন একটী তালা নির্ম্মাণ করে যা কি'না সুচতুর চোরেরাও ভাঙতে পারে না। এইরূপ তালা চাবির সে নাম দেয় "লক-গার্ড, কিন্তু অর্থের অভাবে তার এই কলকৌশলকে সে কাজে লাগাতে পারে নি। তার মতন একজন চোরের এই আবিষ্কার সম্বন্ধে কেউই আস্থা স্থাপন করে না, করলে হয়ত ভালই হ'ত। এই অপরাধ-শিল্প ছাড়া অপরাধ-চিত্রও দেখা যায়। এই সব চিত্র অপরাধীরা কয়লার বা ইটের টুকরা দিয়ে খেয়াল মত জেলের দেওয়ালে, হাজত বা লক-আপ-এর গায় প্রায়ই এঁকে রাখে। এইরূপ বহু অপরাধ-চিত্র আমি সংগ্রহ করেছি, টিস্যু পেপারের সাহায্যে। স্থানাভাবে সবগুলি উদ্ধৃত করা সম্ভব হল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী মাত্র চিত্র বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত হল। আমি ছবিটীর নাম দিয়েছি

গতিশীল পক্ষী বা "ডায়োনমিক্ বার্ড"। চিত্রটী অপরাধীদের অন্তর্নিহিত অব্যবস্থাচিত্ততার পরিচয় দেয়। নিম্নের ছবিটী দেখুন।



পরিশিষ্ট

সকল দেশে অপরাধীদের প্রকৃতি মূলতঃ এক প্রকারের হলেও কোনও কোনও বিষয়ে তারা ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। দেশ-বিশেষের সভ্যতার রীতিনীতি সামাজিক আচার ব্যবহার, এবং ধর্ম্ম বিশ্বাস এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করে। এক এক দেশ বা সমাজের মধ্যে এক এক প্রকারের অপরাধীর আধিক্য দেখা যায়—কারণ অনেক সময় সমাজই অপরাধী গড়ে। বিশেষ করে অভ্যাস-অপরাধীদের সম্বন্ধে এ কথা বিশেষরূপে প্রযোজ্য। এই অভ্যাস-অপরাধীদের সংখ্যাই সকল দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখা যায়। দেশের অপরাধীদের প্রায় ৳ অংশেরও অধিক থাকে এই অভ্যাস-অপরাধী। সমাজের বিধিব্যবস্থা এদের সংখ্যা বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারে। এই কারণে এক ইয়ুরোপীয় অপরাধ-বিজ্ঞান সব সময় ভারতীয় অপরাধীদের উপর সকল বিষয়েই প্রযোজ্য হয় না। ইয়ুরোপীয় অপরাধীদের মাপকাঠিতে ভারতীয় অপরাধীদের বিচার করা মূর্খতা মাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান এখনও গড়ে উঠেনি। ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান এদেশের পুলিশ বিভাগ ইউনিভারসিটির মনস্তত্ব বিভাগের সমবেত চেষ্টায় গড়ে উঠতে পারে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, "টু ষ্ট্যাডি বার্ডস ইন্ কেজ এণ্ড বার্ডস্ ইন্ ওয়াইল্ড ষ্টেট্, ইজ ডিফারেণ্ট থিঙ," কথাটি ধ্রুব সত্য। এই কারণে জেলে আবদ্ধ অবস্থায় অপরাধীদের উত্তমরূপে ষ্টাডি করা অসম্ভব। আমরা এ বিষয়ে ভারতীয় পুলিশ বিভাগকে অবহিত হতে বলি! অপরাধীদের প্রতিটি "ব্যবহারই" তাদের "ন্যাকামি বা বজ্জাতি",—প্রারম্ভেই এইরূপ মনে না করে, তাঁদের উচিত এদের এই

সব ব্যবহারের মধ্যে কোনওরূপ বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে কি'না তা অনুসন্ধান করা। কিরূপ প্রণালীতে এবং ধারায় এইরূপ অনুসন্ধান করা চলে, তা আমি এই পুস্তকটির বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিবৃত করেছি।

অপরাধ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান পদ্ধতি সম্বন্ধে এইখানে আরও কিছু বলা যাক। তিনটী বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা এই অনুসন্ধান কার্য্য সমাধিত হয়। উহাদের যথাক্রমে—(১) পরিদর্শন, (২) আগম এবং (৩) অনুমান বলা হয়। প্রথমে পরিদর্শন সম্বন্ধে বলা যাক। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে বিষয়বস্তু পরিজ্ঞাত হওয়ার অপর নাম পরিদর্শন। চোরেদের কেউ কেউ সর্ব্বাঙ্গ তৈলসিক্ত করে কালো হাফ্ প্যাণ্ট বা ল্যাঙ্গট পরে চুরি করতে বার হয়। তৈলসিক্তজনিত দেহের পিচ্ছিলতার কারণে কেউ তাদের ধরে রাখতে পারে না। কাল ল্যাঙ্গট বা হাফ্ প্যাণ্ট পরার উদ্দেশ্য অন্ধকারের সহিত বেমালুম মিশে যাওয়া। এক্ষণে কেউ যদি ঐরূপ অবস্থায় কোনও চোরকে প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন করে তাদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে ঐরূপ উক্তি করে; তাহলে ঐরূপ উক্তিকে বলা হবে "পরিদর্শন"। পরিদর্শন সম্বন্ধে বলা হল, এইবার "আগম" সম্বন্ধে বলা যাক। বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট হ'তে শুনা কাহিনীর উপর নির্ভর করে মানুষের জ্ঞান লাভ করার অপর নাম "আগম"। "দি ক্রিমিন্যাল" পুস্তকের এক জায়গায় লেখা আছে—"ডিভকো সহরের কাছে কোনও এক ইয়ুরোপীয় অপরাধী এইরূপ উক্তি করে—"হ্যাঁ মশাই, আমরা অলস প্রকৃতিরই বটে, আমরা জানি যে এ এক লজ্জাকর ব্যাপার কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা অলস জীবনই যাপন করি। এই অলসতা দূর করার জন্য আমরা মদ খাই, ইত্যাদি।" কিংবা কোন এক পুরান পাপীর কাছে শুনা গেল যে, তারা ছোট ছোট নুড়িতে চুণ মাখিয়ে সেগুলি গালের কষিতে পুরে, কষির মধ্যে ফুটা করে। চুণের দ্বারা গালের ভিতরকার

ল ক্রমান্বয়ে ক্ষয়িত হয়ে ছিদ্র তৈরী হয়। তারপর এই ছিদ্রের মধ্যে আরও বড় বড় ·নুড়ি পুরে ছিদ্রটি বড় হতে আরও বড় ক'রে তারা গহনা অর্থাদি অনায়াসে লুকিয়ে রাখে, সাধারণভাবে মনে হয় দ্রব্যগুলি তারা গিলে ফেল্‌ল, আসলে কিন্তু তা তারা গিলে না। এই সকল বিশ্বস্ত বিবৃতির উপর নির্ভর করে যদি কেউ অপরাধীদের অন্তর্নিহিত অলসতা বা বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করেন ত তাকে বলা হবে "আগম",। পরিদর্শন ও আগম সম্বন্ধে বলা হল এইবার অনুমান সম্বন্ধে বলা যাক। অদূরবর্ত্তী কোনও এক পর্ব্বত শিখর হ'তে ধূম নির্গত হচ্ছে, এইক্ষেত্রে নিশ্চিতরূপে অনুমান করা যায় যে অদূরবর্ত্তী পর্ব্বত-শিখরে আগুন আছে—কারণ আগুন হতেই ধূম নির্গত হয়। বিষয়বস্তুর দুইটী গুণাগুণ পরিদর্শন করার পর তার তৃতীয় গুণটি সম্বন্ধে নির্ভুল রূপ অনুমান করা যায়। এইরূপ রীতিতে অনুসন্ধান করার অপর নাম অনুমান। একটু বুঝিয়ে বলা যাক। "কোনও একটি পকেটমার সাহেবী পোষাক পরে পকেটমারার উদ্দেশ্যে ট্রামের একজন পকেটভারী ভদ্রলোকের পাশে হয় ত বসে আছে। হঠাৎ সে দেখতে পেল ময়লা গেঞ্জী ও লুঙ্গী-পরা শুধু পায়ে তার পূর্ব্ব-পরিচিত অপর এক পকেটমার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সাহেবী পোষাক পরা পকেটমারটি বন্ধুকে দেখামাত্র জ্ঞানহারা হয়ে ট্রাম হতে লাফিয়ে পড়ে গরীববেশী বন্ধুকে জড়িয়ে ধরল।" এইরূপ ক্ষেত্রে অনুমান করা যেতে পারে যে অপরাধী মাত্রই অদূরদর্শী হয়ে থাকে এবং সামান্য মাত্র উত্তেজনার কারণ ঘটলেও তারা আত্মহারা হয়ে পড়ে; শুধু তাই নয়, আশু পরিণাম সম্বন্ধেও তারা তখনও চিন্তা করতে অক্ষম হয়। এইরূপ পরিদর্শন, আগম ও অনুমানের মধ্যে অনেক ভুল বা ত্রুটি-বিচ্যুতিও থেকে যায়। এই ভুল বা ত্রুটিকে বলা হয় "বিকল্প"। অনুসন্ধানের সময় এইসব বিকল্প সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

বিকল্প দুই প্রকারের হয়, যথা—(১) বহির্বিকল্প এবং (২) অন্তর্বিকল্প। রজ্জু-সর্প, শুক্তি-মুক্তা, মায়া-মরীচিকা প্রভৃতি বহির্বিকল্পের দৃষ্টান্ত। এই বিশেষ ক্ষেত্রে বিকল্প চক্ষু হতে মস্তিষ্কের দিকে প্রবাহিত হয়। অপর দিকে অন্তর্বিকল্পে মধ্যে কোনও রূপ বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। অন্তর্বিকল্পের বিষয়বস্তুর চিন্তার দ্বারা মস্তিষ্কের মধ্যে জাত হয় এবং পরে তার ছবি মস্তিষ্ক হতে চক্ষুর দিকে প্রবাহিত হয়। এইরূপ অবস্থায় আমরা ভূত বিভীষিকা প্রভৃতি দেখে থাকি। অর্থাৎ কি'না প্রথমক্ষেত্রে রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রজ্জু বা সর্প কোনটিরও অস্তিত্ব থাকে না, অথচ মানুষ সর্প বা রজ্জু দেখে, মস্তিষ্ক বিকারের কারণেই এইরূপ ঘটে, এই ধরণের ভুল পরিদর্শনকেই আমরা অন্তর্বিকল্প বলি। ঠগী অপরাধীরা মানুষের এইসব স্বভাবগত বিকল্প সম্বন্ধে অবহিত থাকে এবং তারা প্রায়ই কখনও বাক্-প্রয়োগ দ্বারা কখনও বা হাত-সাফাই বা ম্যাজিকের সাহায্যে দুর্ব্বল চিত্ত মানুষের মধ্যে বিকল্পের সৃষ্টি করে নানারূপে তাদের ঠকিয়ে থাকে। অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রেরই মনোবিজ্ঞানের এই বিশেষ দিকটি সম্বন্ধে অবহিত থাকা উচিত।

অপরাধ-বিজ্ঞান অনুসন্ধানের রীতি বা পন্থাগুলি সম্বন্ধে বলা হল, এইবার এই অপরাধ-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রগুলি আমরা কিরূপে বেছে নিতে পারি সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। আমরা প্রত্যহ বহু কিছু দেখি, পড়ি বা শুনি এবং তার ফলে আমাদের মনে নানারূপ প্রশ্ন জাগে—বিশেষ করে একটি প্রশ্ন, "কেন?" কিন্তু এই "কেন?" প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা আমরা প্রায়ই করি না—কিন্তু আমরা যদি তা করি তাহলে আপনা আপনিই এদেশে অপরাধ-বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ বলা যেতে পারে।

স্মাগলারেরা যুমুনা বললে অফিম্ এবং গঙ্গা বললে মদ দেয় কেন? অনুসন্ধান করলে জানা যাবে, যুমুনার জল কাল এবং গঙ্গার জল সাদা, এই জন্যে। সাইবেরিয়ার কোনও এক স্থানে নির্ব্বাসিত খুনেদের একটী প্রদেশ আছে, কিন্তু এই বিশেষ প্রদেশটিতেই ধনপ্রাণ সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ, কিন্তু কেন? তাহলে ক্রোধ বা প্যাশনের কারণে সঙ্ঘটিত অপরাধসমূহ কি প্রকৃত অপরাধ নয়? অষ্ট্রেলিয়ার কোনোও একস্থানে পৃথিবীর মধ্যে অপরাধ এবং অপরাধীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু কেন? এই প্রশ্ন যদি আমাদের মধ্যে জাগে তাহলে আমরা অনুসন্ধানের দ্বারা জানতে পারি যে ওই প্রদেশটিতে ইংলণ্ডের অপরাধীদের পূর্ব্বে নির্ব্বাসিত করা হত। অপরাধীদের বংশানুক্রমের ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোনও কোনও ভারতীয় অপরাধী ছোট ছোট কাজ বা অপরাধে* লিপ্ত হতে লজ্জা বোধ করে, তারা মনে করে এরদ্বারা তাদের গুরুর অবমাননা হবে। অপ-কর্ম্মের মধ্যেও এই ধরণের আভিজাত্য বোধ দেখা যায় কেন? কলিকাতার পুরান চোরদের প্রায়ই একটি করে ছোকরা পুষতে দেখা যায়, এই সব ছোকরাদের দখল নিয়ে তারা মারপিঠও করে থাকে, অথচ সকল ক্ষেত্রে এই সব ছোকরারা † অপকর্ম্মের জন্য নিয়োজিত হয় না, এর কারণ

* কোনও এক ডাকাত আমাকে বলেছিল, "না মশাই, ও-সব ছোট কাজে আমি হাত দিই না। শেষে ধরা পড়ে যাব আর লোকে মনে করবে আমি বুঝি সেখানে ঘটি বাটি চুরী করতে গিয়েছিলাম।"

† স্ত্রী-বেশ্যার ন্যায় কলিকাতায় পুরুষ-বেশ্যাও দেখা যায়। এই ধরণের পুরুষ-বেশ্যা এদেশে মাত্র বেশ্যাপল্লীতেই দেখা যায়। এ ছাড়া কলিকাতায় আমরা বালক-বেশ্যাও (?) দেখে থাকি। সাধারণতঃ এরা ১২ হতে ১৮ বৎসরের গৃহহীন বালক মাত্র। বাবরি-কাটা চুলওয়ালা লম্বা চুড়িদার পাঞ্জাবী পরা এই সব বালক ঠোঁটে রং মেখে, কালি দিয়ে ভ্রূ এঁকে কলিকাতার ময়দান এবং অপরাপর নির্জ্জন স্থানে ঘুরা-ফিরা করে। এরা প্রায়ই পুরান চোরদের দ্বারা প্রতিপালিত হয়—এক শ্রেণীর পুরান চোরদের সহিত এদের

কি? এই "কেন?" উত্তরের জন্য যদি অনুসন্ধান করা যায় তা হলে দেখা যাবে যে এই সব ছোকরাদের সহিত এই শ্রেণীর পুরান চোরদের অবৈধ সম্বন্ধ আছে। কলিকাতা শহরের বহু অপরাধী একাধারে হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্টান নামে আত্ম পরিচয় দেয়, যথা—(১) সেখ করিম ওরফে হরিচরণ দাস ওরফে জে ডেভিড ওরফে সাধন চাটুয্যে ওরফে সেখ নবী ইত্যাদি। বাপের নামও যথাক্রমে অনুরূপ ভাবে তারা পাল্‌টিয়ে দেয়। সব সময় কি এরা আত্মরক্ষা বা আত্মগোপনের জন্য এইরূপ করে? প্রকৃত অপরাধীরাই সাধারণতঃ এইভাবে নাম পাল্‌টিয়ে থাকে, না প্রাথমিক অপরাধীরাও এইরূপ করে থাকে? ইহা কি প্রকৃত অপরাধীদের এক জাতিত্বের পরিচায়ক? কেউ কেউ যুক্ত নামে—যথা, আমীন ভট্‌চায, সুধাময় সেখ্ ইত্যাদি নাম বলে, কিন্তু কেন? এইরূপ প্রতিটী প্রশ্ন মনের মধ্যে জাগ্রত হওয়া মাত্র যদি আমরা "পরিদর্শন, আগম এবং অনুমানের সাহায্যে অনুসন্ধান সুরু করি তাহলে এদেশেও অপরাধীদের রীতি-নীতি সমাজ-ব্যবস্থা ও চরিত্রাদি সম্বন্ধে বহুবিধ তথ্য জানা যায়। এদেশের শান্তিরক্ষক, আইনজীবী এবং বৈজ্ঞানিকরা যদি এইভাবে অনুসন্ধান চালান, তবেই ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে, ভারতীয় অপরাধীদের সংখ্যা কমাতে হলে ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, এইরূপ আমি মনে করি। ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞানের সহিত পাশ্চাত্য অপরাধ-বিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা অপরাধ-বিজ্ঞানের অপর আর একটী দিক্, কি ভাবে এইরূপ তুলনা করা যেতে পারে সেই সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্। দৃষ্টান্ত স্বরূপ

অবৈধ-সম্বন্ধ থাকে। এদের কেউ কেউ নির্জ্জন স্থানে ভদ্রব্যক্তিদের পেলে চীৎকার করে মিথ্যে বদনাম দেবার ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়েরও চেষ্টা করেছে।

অপরাধী বিশেষের (১) হৃদয়ের প্রসারতা ও (২) হৃদয়ের উদারতার কথা বলা যেতে পারে। দেশ-বিশেষের সমাজে ব্যবস্থা এবং ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রকৃত অপরাধীদের সামান্যমাত্রায় প্রভাবান্বিত করে, কিন্তু তারা প্রাথমিক অপরাধীদের উপর অত্যধিক রূপে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কোনও কোনও অপরাধীদের মধ্যে সময় সময় কমবেশী সৎ-প্রেরণা † বর্ত্তিয়ে থাকে। বস্তুতান্ত্রিক ইয়ুরোপে আংশিক সৎ-প্রেরণা অপরাধীদের মধ্যে হৃদয়ের প্রসারতা আনে এবং ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষের অপরাধীদের মধ্যে এই আংশিক সৎ-প্রেরণা সৃষ্টি করে হৃদয়ের উদারতা। এই প্রসারতা এবং উদারতার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে একটু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে। কোনও এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের রোম নগরে পকেট কাটা যায়। অপহৃত ব্যাগটীর মধ্যে ৩০০৲ টাকার নোট্, জাহাজের একখানি টিকিট ও পাশপোর্ট ছিল, এবং সেই সঙ্গে খানকতক ঠিকানা লেখা কার্ডও। কয়েকদিন পরে ভদ্রলোক তার লণ্ডনের ঠিকানায় একটী রেজিষ্টার্ড লেফাপা পান, লেফাপাটীর মধ্যে পাশপোর্ট ও জাহাজের টিকিটখানি ন্যস্ত ছিল। ইহা একটী হৃদয়ের প্রসারতার দৃষ্টান্ত। ভারতীয় অপরাধীরা এইরূপ ক্ষেত্রে দ্রব্যগুলি নষ্ট করে ফেলত। কিন্তু এই ভারতীয় অপরাধীরা হৃদয়ের প্রসারতা না দেখালেও তারা সময় সময় হৃদয়ের উদারতা দেখিয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ বলা যেতে পারে। বাঙ্গলার কোনও এক স্থানে জনৈক গৃহস্থ একদল ডাকাত দ্বারা আক্রান্ত হল। এই অবস্থায় গৃহস্বামী তাঁকে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত না করার জন্যে অনুরোধ জানান।

† অপস্পৃহার সহিত কম বেশী সৎপ্রেরণাও কোনও কোনও অপরাধীদের মধ্যে দেখা যায়। এই সৎপ্রেরণা মাত্রা অনুযায়ী অপরাধের মধ্যেও তারা ভালো মন্দের জাত বিচার করে থাকে।

ডাকাত দলের সর্দ্দার এইরূপ অবস্থায় কিছু অর্থ গৃহস্বামীকে ফেরৎ দেয়। এইরূপ দয়া কোনও ইয়ুরোপীয় ডাকাত দেখায় কি'না সন্দেহ আছে। এইরূপ উদারতা ভারতীয় অপরাধীদের দ্বারাই সম্ভব। সৎ-প্রেরণা বিকৃত এবং আংশিক রূপে অপরাধীদের মধ্যে দেখা গেলে, তাদের ব্যবহারাদিও অত্যদ্ভুদ হয়ে থাকে। সৎ-প্রেরণার স্বল্পতার কারণে তারা একেবারে অপরাধ-বিমুখ না হলেও এই ধরণের প্রসারতা বা উদারতা এদের অপকর্ম্মের মধ্যেও এরা দেখিয়ে থাকে। কোনও কোনও প্রাথমিক অপরাধীদের সম্বন্ধে ইহা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য।

এইরূপ তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা অপরাধ-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করা যায়। এ ছাড়া অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্রদের অপরাধীদের প্রতি বিশেষ দরদ বা সহানুভূতি থাকা উচিত, তা না হলে নিরপেক্ষভাবে তাদের কার্য্যকলাপ বিচার করা অসম্ভব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোনও এক বাহ্যতঃ যৌনজ অপরাধীর কথা বলা যাক্, ধরুন বিশ্বস্তভাবে জানা গেল বা শুনা গেল, কোনও এক গৃহস্থ-কন্যা একজন ধনী যুবকের সঙ্গে অবৈধভাবে প্রেম বিনিময় করছে। বিষয়টী জ্ঞাত হওয়া মাত্র কন্যাটীর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ঘৃণায় নাক সিঁটকালাম। অথচ কিরূপ অবস্থায় কন্যাটী এইরূপ পন্থা অবলম্বন করেছে তা জানবার একবার চেষ্টাও করলাম না। ইহা অত্যন্ত রূপ অন্যায়। নিম্নের বিবৃতিটী পড়লে বিষয়টী উত্তমরূপে বুঝা যাবে।

"প্রৌঢ় বয়সে আমার পিতা কর্ম্মচ্যুত হন। এ বয়সে চাকুরি পাওয়া যায় না। সাত আটটী পুত্রকন্যা নিয়ে পিতা আমার ভীষণ দুরবস্থায় পড়েন। পাওনাদার ও বাড়ীওয়ালার তাগাদায় আমরা অস্থির হয়ে উঠি। ঠিক এই সময় দেবুদার সঙ্গে আমার বাবার আলাপ হয়। তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়ী আসতেন, এবং আমাদের কিছু কিছু অর্থ-সাহায্যও

করতেন। দেবুদার কিন্তু লক্ষ্য ছিল আমার উপর। বাবা সবই বুঝতেন, কতবার আমাকে সাবধানও করে দিয়েছেন, কিন্তু মুখে তিনি কোনও কিছু বলতে সাহস করেন নি। একদিন ঘরে বসে গল্প করতে করতে দেবুদা আমাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। প্রতিবারের ন্যায় এবারও আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আমার কানে এল বাড়ীওয়ালার বীভৎস চীৎকার। জন চার পাঁচ দেশওয়ালী গুণ্ডা নিয়ে বাড়ীওয়ালা জোর করে বাড়ী দখল করতে চায়। কিছুক্ষণ বাকবিতণ্ডার পর, পিতাঠাকুর নাচার হয়ে ঘরে ঢুকলেন। তখনও আমি দেবুদার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করছি। বাবা এ অবস্থায় আমাদের দেখেছিলেন কিনা জানিনা। তিনি ঘরে ঢুকে দেবুদাকে বললেন, "বাবা দেবু গোটা ৫০৲ টাকা দিতে পার? তাড়াতাড়ি সরে বসে দেবুদা উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই পারি। এতক্ষণ বলেন নি কেন? কারা ওরা? ৫০টী টাকা দেবুদা আমার হাতে গুঁজে দেয়। আমি ক্ষুণ্ণ মনে নোট কটা ধীরে ধীরে তক্তপোষের উপর নামিয়ে রাখি। পিতাঠাকুর ছোঁ মেরে টাকাক'টা তুলে নিয়ে বেরিয়ে যান। ততক্ষণে আমিও উঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেবুদা পথ আগলে বলে উঠেন—"পালাচ্ছ যে, ইয়ারকি নাকি। দাঁড়াও, কাকীমাকে বলে দিচ্ছি, পুঁটী আমার কথা শুনছে না। যাও বসো ওখানে।" বাপ-মার দুঃখ দুর্দ্দশা বোঝবার আমার বয়স হয়েছে, তাই চোখের জল মুছে আমি দেবুদার পাশে গিয়ে বসি। আমি বাধাও দিই না, নিজেকে এলিয়েও দিই না, আমার নিস্পন্দ দেহটা নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে দেবুদা বেরিয়ে যান। ঘর হতে শুনতে পাই মা বলছেন—"আবার আসবে ত বাবা! বিছানায় শুয়ে আমি কাঁদতে থাকি, হঠাৎ শুনতে পাই মা শুধাচ্ছেন—"কাঁদছিস্ নাকি তুই?" উত্তরে আমি বলি—"না মা কাঁদিনি ত!"

এই ধরণের পরিবারের কলিকাতায় অভাব নেই। আমি এমন পরিবারেরও খবর রাখি যেখানে মাতা লজ্জার খাতিরে কুমারী কন্যার গর্ভজাত কন্যাকে নিজ কন্যা বলে পরিচয় দিয়ে লজ্জা ঢেকেছেন। ক্ষুধার জ্বালার ন্যায় আর জ্বালা নেই। নিজে অনাহারে মরলেও, কেহ পুত্র-কন্যাকে অনাহারে মরতে দিতে রাজী হয় না। এই অবস্থায় স্ত্রী কন্যাকে বিক্রয় না করে কেউ যদি আহার সংস্থানের জন্য অপরাধ করে তা'হলে আমরা তাকে স্ত্রী কন্যা বিক্রয়কারকদের অপেক্ষা কি কম ঘৃণা করি না?

আবার আমি এমন কন্যাকেও জানি, যে কি'না অতি সংগোপনে যৌনজ বৃত্তির দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে বৃদ্ধ পিতামাতাকে ভরণপোষণ করেছে, শুধু তাই নয় ছোট ভগ্নীদের বিবাহ দিয়েছে এবং একমাত্র ভাইটীকে বি-এ পাশ করিয়ে, পরে একজন ভাল ছেলেকে নিজে বিবাহ করে সুখী হয়েছে—এবং বিবাহের পর সে একনিষ্ঠভাবেই জীবনযাপন করেছে। তার বিগত দিনের অপকার্য্যের জন্য সে সারা জীবনই অনুতপ্ত ছিল।

এই ধরণের অপরাধীদের শ্রেণী বিভাগ কিরূপ প্রণালীতে করা উচিত তাহা বিবেচ্য। সাধারণ ভাবে এদের দৈব-অপরাধী বলা উচিত কি'না তাহাও বিবেচ্য। নিম্নে এই ধরণের একজন অযৌনজ অপরাধীর বিবৃতি উদ্ধৃত করা হল। বিবৃতিটী প্রণিধান যোগ্য।

"সামান্য মাইনের এক খাজাঞ্চির চাকরী করি। কিন্তু পোষ্যবর্গের অভাব নেই। ভাইয়ের সংসার, বোনের সংসার সবই আমার ঘাড়ে। বন্ধুবান্ধবদের কাছে টাকা ধার করি, ভিক্ষাও। প্রতিদানে উপকারী বন্ধুরা আমার বয়স্থা কন্যা এবং সুন্দরী স্ত্রীর উপর সুবিধা নিতে চায়। আমি এক দিনেই শুভকাঙ্ক্ষিদের বিদায় দিয়ে অর্থের সন্ধানে বার হই। শেষে নাচার হয়ে আফিসের ক্যাস থেকে কিছু টাকা না বলে আমানত

নিই, কিন্তু শোধ দিতে পারি না, বরং ক্ষেপে ক্ষেপে আরও বহু টাকা নিয়ে ফেলি। অডিট্ হবার মাত্র এক দিন বাকি। আগের দিন সন্ধ্যার পরও একা ক্যাস ঘরে বসে ভাবতে থাকি। সকল কর্ম্মচারীরাই বাটী চলে যায়, কিন্তু আমি যাই না। হঠাৎ আমার মাথায় এক বুদ্ধি আসে। আমি চোর চোর বলে চেঁচিয়ে উঠি। লোকজন জড় হলে আমি জানাই—হঠাৎ পিস্তল হাতে একটা লোক আসে। লোকটা কুড়ি হাজার টাকা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ঐদিকে পালিয়ে গেল।”

এই সব অপরাধ ছাড়া, কুসংস্কার, কুপ্রথা এবং দাম্ভিকতা প্রসূত অপরাধ সম্বন্ধেও অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্রদের বিবেচনা করা উচিত। প্রভুর আদেশে প্রভুভক্ত ভৃত্যের দ্বারা কৃত অপরাধকে আমরা কিরূপ শ্রেণীর অপরাধ বলব ? পিতার আদেশে মাতৃহত্যা, সাগর বক্ষে কন্যা নিক্ষেপ, বংশের সুনাম রক্ষার্থে ভ্রূণ হত্যা প্রভৃতিও এই শ্রেণীর অপরাধ, কারণ এই সকল অপরাধ ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত হয় না। এ ছাড়া ভয় বা লজ্জা এড়াবার জন্য অনেকে অপরাধ করে। পাঞ্জাবের কোনও পরিবারে, জন্মিবামাত্র কন্যাগণকে হত্যা করা হত, কারণ কন্যাগণকে বিবাহ করে বাটীর কর্ত্তাকে কেহ “শ্বশুরা” সম্বোধন করে তা ঐ সব পরিবারের কর্ত্তা ব্যক্তিরা পছন্দ করত না। আমি এখন এক উচ্চ বংশোদ্ভব ভদ্র ডাকাত সর্দ্দারের কথা শুনেছি, যে কি'না, একটা উত্তেজনা উপভোগ করবার জন্যে বা রোম্যান্সের কারণে ডাকাতি করত। অপহৃত অর্থাদি সে নিজে গ্রহণ না করে না'কি সেগুলি সে প্রায়ই গরীবদের বিলিয়ে দিত। এ ছাড়া অপহৃত দ্রব্যাদির ½ অংশ অকুস্থলেই না'কি গৃহস্থদের সে ফিরিয়েও দিয়েছে। এ সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে এইরূপ উক্তি করত—“মনে করুন কোনও এক গভীর রাত্রে—

হা-রে-রে-রে করে সদলে পাঁচিল টপকে কোনও এক ধনী জমিদারের বাটী আক্রমণ করলাম। তার পর আরম্ভ হল আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ ও আর্ত্তনাদ এবং গৃহস্থ বধূদের আকুল মিনতি। আমি বিজয়ী বীরের মত তাদের অভয় দিচ্ছি—এর চেয়ে বড় রোম্যান্স কি আপনারা কল্পনা করতে পারেন” ইত্যাদি। এই ধরণের অপরাধ-রোগীদের আমরা অপরাধী-রোগী বলব কি'না তাও বিবেচ্য।

এই সব যৌনজ এবং অযৌনজ অপরাধীদের অপরাধী রূপে ধরা উচিত কিনা তা বিবেচ্য—কারণ ওরা ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপরাধী হয়েছে। অনুরূপ অপর আর একপ্রকার অপরাধী আছে যাদের কিনা অপরাধী বলা যায় না। এই সব অপরাধীদের বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা অপরাধী করা হয়। অন্যের দ্বারা অন্যায় ভাবে প্ররোচিত না হলে সুস্থ অবস্থায় এদের অপস্পৃহা জাগ্রত হয় না। নিম্নের বিবৃতিটী হতে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাবে।

“মেয়ে কয়টীকে আমি বোনের মতই দেখে এসেছি। হঠাৎ একদিন আমার এক বন্ধুকে বলতে শুনি, মেয়ে কয়টী নাকি দুষ্টা প্রকৃতির। বন্ধুটী বলে, যে সে মেয়েটিকে প্রায়ই আদর করে, শুধু সে নয়, তার অপরাপর বন্ধুরাও তাদের আদর করেছে। সাক্ষ্যস্বরূপ তার ঐ সব বন্ধুদেরও আমার কাছে সে হাজির করে দেয়। বন্ধুবর সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য আমাকে অনেক উপদেশ দেয়। ধীরে ধীরে আমার মধ্যে যৌনস্পৃহা জাগ্রত হয়। বন্ধুবর আমাকে বুঝায় দুষ্ট মেয়েদের সহিত দুষ্টামী করলে দোষ নেই। তখনও আমি জানতাম যে এদের সকল কাহিনীই কল্পিত এবং তারা আমাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে মিথ্যে গল্প ফেঁদেছে। বলা-বাহুল্য আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে অপদস্থ ও প্রহৃত হই। আমার সমস্ত সুনাম নষ্ট হয়।

এই ধরণের এজেণ্ট প্রোপোগেটার বা প্রলুব্ধকারী * চরদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে যারা অপরাধ করে তাদের অপরাধী বলা উচিত কিনা তাহাও বিবেচ্য। আমার মতে মানুষের স্বাভাবিক অপরাধ স্পৃহা যারা জাগ্রত করে তারাই আসল অপরাধী।

অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্রদের প্রথমে উচিত, যারা আসল অপরাধী নয় বা অপরাধ-রোগী তাদের চিনে নেওয়া। এরপর তাদের উচিত প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে যারা দৈব-অপরাধী তাদের পৃথক করা। এরপর তাদের উচিত প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত অপরাধীদের কোন গুলি প্রাথমিক এবং কোন গুলি বা প্রকৃত অপরাধী তা ঠিক করা এবং তাদের "অভ্যাস, স্বভাব, মধ্যম প্রভৃতি শ্রেণীতে এবং শোণিতাত্মক, সাম্পত্তিক, প্রভৃতি উপশ্রেণীতে" বিভক্ত করা—পরিদর্শন, আগম অনুমান এবং সংগৃহীত বিবৃতি আদি দ্বারা আমরা তা করে থাকি। গ্রন্থটির মধ্যে প্রমাণস্বরূপ বহু বিবৃতি সন্নিবেশিত হয়েছে। এইসব বিবৃতি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলে আমি পুস্তকের বর্ত্তমান খণ্ড শেষ করব।

এই পুস্তকে যে সকল বিবৃতি সমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলির ভাষাগুলি সংশোধন করে সাহিত্যের উপযোগী করেছি. এই কারণে প্রত্যেকটি বিবৃতি একই ভাষায় লেখা দেখা যায়। বহু লিডিং কোশ্চেন্স্ এবং তার উত্তরও এইসব বিবৃতির মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিবৃতিগুলি সংক্ষিপ্ত করে লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হয়েছে।

মানুষ কি করে অপরাধী হয়, এবং অপরাধী হ'তে মানুষ পুনরায় কি করে নিরপরাধী হ'তে পারে তা আমি এই পুস্তকে বলেছি, কিন্তু তা

---

* ভারতীয়রা এইসব প্রলুব্ধকারী চরদের আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে এবং এদের সাহায্য তারা কখনও নেয় না। ভারতীয় পুলিশ মাত্র সংবাদবাহী চরদের সাহায্য নিয়ে থাকে, কিন্তু তাও তারা বিশেষ যাচাই করে তবে গ্রহণ করে।

তারা কেন হয়, তা আমি বলতে পারি নি। মানুষ মরে কেন, পাগল হয় কেন, অপরাধী হয় কেন?—অনাদি কাল হতে মানুষের মনে এ প্রশ্ন জেগেছে, কিন্তু বিজ্ঞান আজও এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নি। বিজ্ঞান বলে দিয়েছে এক এবং একে দুই হয়, দুই পরিমাণ হাইড্রোজেন এবং এক পরিমাণ অক্সিজেন মিলে জল হয়, অর্থাৎ কি'না কি করে বা কেমন করে এরূপ হয় বিজ্ঞান তা বলে দিয়েছে, কিন্তু কেন তা হয় বিজ্ঞান তা বলতে পারে নি। তাই এই কেন-র উত্তর আমিও দিতে পারি নি—অঙ্ক শাস্ত্রের সাহায্যে যদি কেউ মানুষের মন মাপতে চান তাহলে তিনি ভুলই করবেন। তবে কি করে বা কি উপায়ে অপরাধীরা অপরাধী হয় তা আমি বলেছি; যেটুকু বলেছি বা বলতে পেরেছি তা থেকে সমাজ কতটুকু উপকৃত হবে তা পাঠকবর্গের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়ে, নিম্নের বিবৃতির মধ্যে আমার শেষ নিবেদন জানিয়ে এখন আমি আপনাদের নিকট হ'তে এইবারকার মত বিদায় গ্রহণ করবো।

"দেশের বরেণ্য-মণীষীরা যাঁরা অনাগত কালে, আইনজীবি, জেল কর্তৃপক্ষ, পুলিশ অফিসার, ডাক্তার ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের একত্র করে গঠন করবেন একটী "কমিটী" যে "কমিটী" অপরাধ ও অপরাধীদের সম্বন্ধে চিন্তা করবেন প্রভূত সহানুভূতির সঙ্গে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে, নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে যাঁরা প্রচলন করবেন নূতন বিধিব্যবস্থা, যাঁরা জেল সমূহকে রূপান্তরিত করবেন শোধনাগারে, ও চিকিৎসাগারে, তাঁদেরই স্মরণ করে পুস্তকের এই প্রথম খণ্ডটি শেষ করলাম।"

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রিণ্টার—শ্রীকমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য,
কালী-গঙ্গা প্রেস,
৪৬।১, বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

OPINION

SRI P. N. BANERJEE, VICE-CHANCELLOR,

Calcutta University.

"I read three volumes of "Aparadh Bijnan" by my friend and pupil, Mr. Panchanan Ghosal, M. Sc., of the West Bengal police Service with deep interest. He has attempted to give us the psychology, the history of crimes and criminals who are dealt with by the custodians of law and order in these provinces. Mr. Ghosal's approach to the subject is, so far as I know, absolutely new. I am told, his experience and his views will be embodied in the other volumes as well. If he succeeds in his great task, he will be constructing a new science of penology based upon solid personal experience. His researches in the subject can justly be regarded as very important contributions to the advancement of learning —the motto of the University of Calcutta. It is just as well that Mr. Ghosal has written his books in the Bengali language. The problem of crime and the problem of punishment are the two great problems which have attracted the attention of every social reformer, political statesman, legislator and magistrate throughout these countries. Mr. Ghosal holds the view that a criminal who commits crime is capable of redemption, and it is one of the fundamental tenets of practically all the major religions of the world. Whether such a

criminal can also be redeemed by agencies other than religious or by State organisations, is a problem which Mr. Ghosal has discussed in the course of his extensive researches. I wish Mr. Ghosal all success in his venture. I am confident his name will go down to posterity. Our people do not always realize that there are scholars amongst police officers."

DR. S. C. MITRA, M. A., D. PHIL. (LEIPZIG), F. N. I. Head of the department, Experimental Psychology, Calcutta University.

"I have just now gone through the 3rd volume of (Aparadh Vignan), a treatie on crimes especially concerned with women. I am very glad to state that it fully maintains the high standard of the first two volumes are not only interesting but highly instructive, Students of Psychology interested in the psychology of crime as also social workers will find the volumes to be of invaluable help to them.

There are two features which should be specially noticed and which really enhance the value of the volumes. One is that they are written by one—a high Police Officer—who has considerable practical experience of all that have been described in these volumes, and the second is that they are probably first volumes on criminology written in the Bengali language. In the interests and the welfare of the society it is highly to be desired that more such authoritative books be written in our language."